সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাদশ বর্ষ

শ্রাবণ ১৩৫৯ - আষাঢ় ১৩৬০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৯ - আষাঢ় ১৩৬০

রচনাসূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণ কপোলতলে
রাতের বিদায়-চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

২

'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, 'যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।'

৩

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

৪

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।

৫

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ—
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

৬

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

৭

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।

লেখন গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই লেখনগুলির সুরু হয়েছিল চীনে ও জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুক্‌রো লেখাগুলি জমে উঠল।' ১৩৩৪ কার্তিকে কবির হস্তলিপির প্রতিলিপিরূপে লেখন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'স্ফুলিঙ্গ' নামে অনুরূপ কবিতাবলীর আর-একটি সংকলন প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫২ সালে।

স্বাক্ষর দেওয়ার উপলক্ষ্যে লেখা কবিতার সংকলন ঐ দুখানি গ্রন্থেই শেষ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কবির এই শ্রেণীর অপ্রকাশিত নূতন কবিতার সন্ধান কেহ যদি দিতে পারেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কৃতজ্ঞ হইবেন ও ঋণস্বীকারপূর্বক যথাকালে তাহা গ্রন্থে সংকলন করিবেন।

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত কবিতাগুলি প্রধানতঃ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে ; সংকলন-কর্তা শ্রীঅমিয়কুমার সেন। ১, ৪, ৫, ৭ -সংখ্যক কবিতার ইংরেজি-মাত্র লেখন গ্রন্থে আছে। ৩ -সংখ্যক কবিতার একটি পাঠান্তর লেখনে আছে—

চাহিয়া প্রভাত-রবির নয়নে গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে' বলিয়া পড়িল টুটে।

রেখার রীতি ও প্রকৃতি

শ্রীনন্দলাল বসু

ছবিতে বস্তুরূপের কতকগুলি গুণ ধরা পড়ে। গড়ন, গতি, আয়তন, ওজন ও স্পৃশ্য গুণ (texture)। এগুলি ছবিতে ফলাতে গিয়ে রেখার ঘের (outline), গড়নের ছক (block) ও ছায়াতপ (shade-light) ব্যবহার করতে হয়। রঙ ছবিতে ভাবাবেগের ব্যঞ্জনা দেয় শুধু।

শুধু রঙ দিয়ে কোনো বস্তু দেখানো যায় না। বরং রেখার ঘের দিয়ে গড়ন ও গুণের কথা অনেক বলা যায়। রেখা ও ছায়াতপ দিয়ে আঁকার পর, রঙ দিলে, বস্তু আরও স্পষ্ট ও নয়নরঞ্জক হয়।

পূর্বেই বলেছি, ছবিতে একটা বস্তুর গড়ন, গতি, ওজন, দৃশ্য ও স্পৃশ্য নানা গুণ নানা কৌশলে বোঝানো যায়। কিন্তু, রেখা দিয়ে ঐ গুণগুলির ব্যঞ্জনা সবচেয়ে ভালো হয়।

ছবি আঁকার কাজে নানা ধরনের রেখার ব্যবহার আছে। তার মধ্যে লিখনের রেখা ও গড়নের রেখা এই দুটি মুখ্যভাগ করা চলে।

[একপ্রকার মিশ্র রেখাও আছে। তার উদ্দেশ্য যে-কোনো উপায়ে বস্তুর স্পৃশ্য গুণ প্রকাশ করা। ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, এমনকি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, স্পৃশ্যতার ভেদ বোঝাবার জন্যে যেখানে যেমনটি প্রয়োজন তেমনি হয় রেখার ধরন। কাপড়ের ভাঁজে আর ধাতুর অলংকারে আর মনুষ্যদেহে রেখার কায়দার বদল হয়ে চলে।]

পারস্যে ও চীনে কলম দিয়ে, তুলি দিয়ে, কথা লেখার যে কায়দা আছে তাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি (calligraphy)। বাংলায় লেখাঙ্কন বলা যেতে পারে।

লেখাঙ্কনের গুণাগুণ কিছু জানা চাই। অক্ষর লেখার বিশেষ কৌশল বহু দিন ধ'রে বহু আয়াস ক'রে শিখতে হয়। পারসিক ও চীনা লেখাঙ্কনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, প্রায় সব ভাষাতেই ভালো লেখার বেলা একই রূপ কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ প্রমাণ (proportion) ও টান লেখায় ব্যবহার হবে তা নির্দিষ্ট আছে, তা সর্বত্র একই রকম হওয়া চাই। অক্ষরগুলি স্পষ্ট, সুসমঞ্জস ও মালার মতো শ্রেণীবদ্ধ হবে। পঙ্‌ক্তিগুলি ঋজু ও সমান্তর হবে। কাগজ বা পাটার নির্দিষ্ট সীমানার ভিতর লেখার বিষয়টির ঠিক-ঠিক সংকুলান হওয়া চাই। লেখাটি কাগজের নির্দিষ্ট স্থলে মানানসই ভাবে সাজানো হবে। লেখা এবং লেখার অবকাশ বা ফাঁক যথোপযুক্ত ও সুন্দর হওয়া যাই। অক্ষরগুলি পুষ্ট, দৃঢ় ও নির্ভীক হবে ; তাড়াহুড়ার ভাব থাকবে না, অথচ সাবলীল স্বচ্ছন্দ হবে। লেখকের নিজস্ব ধরন থাকবে ; অর্থাৎ লেখকের চরিত্রের ছাপ প'ড়ে লেখায় একটি চারিত্র ফুটে উঠবে।

পাকা লেখা বলতে যা বোঝায় তা ব্যাখ্যা ক'রে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

লেখাঙ্কনের রেখা করণ (instrument) -ভেদে দুরকম : কলমে লেখা ও তুলিতে লেখা। কলমে লেখা রেখায় কালী সব জায়গায় সমান গাঢ় থাকে এবং রেখার সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা আগাগোড়া একরূপ হয়, তারের পাতের মতো দেখায়। এই রেখার সমান চওড়া হবার দিকেই ঝোঁক থাকে ; কেবল কলমের খতের জন্য, আর লেখার সময় হাত ঘুরিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে টানার জন্য, কোথাও সরু, কোথাও বা মোটা হয়। তারের পাতের মতো ভাব, ধাতব গুণ (metallic quality) —এই হল এই রেখার বিশেষত্ব।

তুলিতে-লেখা রেখায়, কালী ঘন থাকলে সব জায়গায় সমান গাঢ় হয়। কিন্তু, রেখাটি আগাগোড়া সমান চওড়া না হয়ে সরু-মোটা হবার দিকে ঝোঁক থাকে, খানিকটা ঘাসের পাতার মতো। কালী পাৎলা থাকলে রেখা টানবার মুখে কোথাও গাঢ়, কোথাও ফিকে হয়। আবার কম কালী তুলিতে নিলে রেখাতে শুক্‌নো বা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাব দেখানো যায়।

মিশর, পারস্য, চীন, ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, এসব জায়গায় লেখবার করণ (instrument) ও উপকরণ (material) -ভেদে লিখনপদ্ধতিতে নানা বৈচিত্র্য, নানা গুণের নানারূপ তারতম্য, লক্ষ্য করা যায়। মিশরীয়, পারসিক ও ভারতীয় লেখকেরা অনেক সময় তুলির পরিবর্তে খাঁকের বা ইস্পাতের কলমে লিখতেন এবং ছবিও আঁকতেন। চীনারা লেখা ও আঁকা দু'ই কাজই তুলি দিয়ে ক'রে থাকেন।

খাঁকের কলমে, লোহার কলমে[১] রেখা আগাগোড়া সমান চওড়া হয়, কালী ঘন থাকে, রেখার দুটি ধার চোখা (sharp) হয়, একটি ধাতব ভাব থাকে। কলমে খত কাটার দরুন সরু-মোটা করা সম্ভব হলেও, রেখার দুটি ধার চোখা থাকেই।

চীনা লেখা তুলি দিয়ে টানা বলে রেখা সরু, মোটা, গাঢ়, হাল্কা, চেপ্টা, ধ্যাব্ড়া নানা রকম হয়। তুলি নমনীয় লোমের তৈরি ব'লে লেখবার সময় হাতের চাপে ইতরবিশেষ ক'রে ঐসব বৈচিত্র্য দেখাবার সুবিধা হয়। আর-এক কথা, তুলির রেখার দু ধার স্বভাবতঃ চোখা হয় না; মোলায়েমই হয়ে থাকে। সমান চওড়া রেখা টানবার জন্য তুলি খাড়া ক'রে ধরতে হয়, সমান চাপ দিতে হয়। কাত ক'রে তুলি টানলে এক দিক চোখা, অন্য দিক মোলায়েম করা যায়; যে দিকে তুলির ডগা থাকে সে দিকটা চোখা আর যে দিকে তুলির পেট থাকে সে দিকটা মোলায়েম হয়। আবার তুলি জল বা ফিকে কালীতে ডুবিয়ে, ডগায় ঘন কালী নিয়ে রেখা টানলে, তার কতকটা গাঢ় কতকটা হাল্কা হওয়ায় shaded line-এর মতো দেখতে হয়: গড়নের রেখার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

মোট কথা, তুলি দিয়ে নানা প্রকারের রেখা টানা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভঙ্গী ও স্পৃশ্যগুণ দেখাবার জন্যে চীনা শিল্পীরা তুলির বহু প্রকার টান আবিষ্কার ক'রে গেছেন। যেমন— ১। তারের মতো দেখতে ২। তাঁতের মতো দেখতে ৩। ঘাসের পাতার মতো দেখতে ৪। রেশমি সুতোর মতো দেখতে ৫। মাকড়সার সুতোর মতো টান (মাকড়সা যেমন চলার সঙ্গে সঙ্গে সুতো ছাড়ে তুলি টানার সময় তুলির মুখ দিয়েও তেমনি রেখা বেরোবে) ৬। মেঘের গতির মতো টান ৭। জলের লহরের মতো টান ৮। কেঁচোর মতো দেখতে ৯। জঙ-ধরা পেরেকের মতো দেখতে ১০। গিঁটওআলা দড়ির মতো দেখতে ১১। শুকনো কাঠের মতো দেখতে ১২। কাঠে উইয়ে-খাওয়ার দাগের মতো দেখতে ১৪। সাপের গতির মতো টান ১৫। মাথাওআলা গজালের মতো দেখতে ১৬। ছেঁড়া চটের মতো দেখতে ১৭। ভাঙা শরপাতার মতো দেখতে ১৮। চুলের মতো দেখতে (কেবল সরু নয়, রেখার টানটা আগাগোড়া সমান চওড়া এবং কালীর ঘনতা একরূপ হওয়া চাই)।

পারসিকেরা খত-কাটা খাঁকের কলম ব্যবহার ক'রে, রেখা টানার কৌশলে, ধাতুর পাত গুটিয়ে গেলে ও পাতের শেষটা কাটা থাকলে যেমন দেখায় সেই ভাবটা আনেন। আর, কলমে খত থাকে ব'লে রেখার শেষটা কখনো চুলের মতো, কখনো বা পাত-কাটার মতো দেখানো যায়।

---

১ জৈন পুঁথি খত-কাটা ও চেরা লোহার কলমেও লেখা হয়।
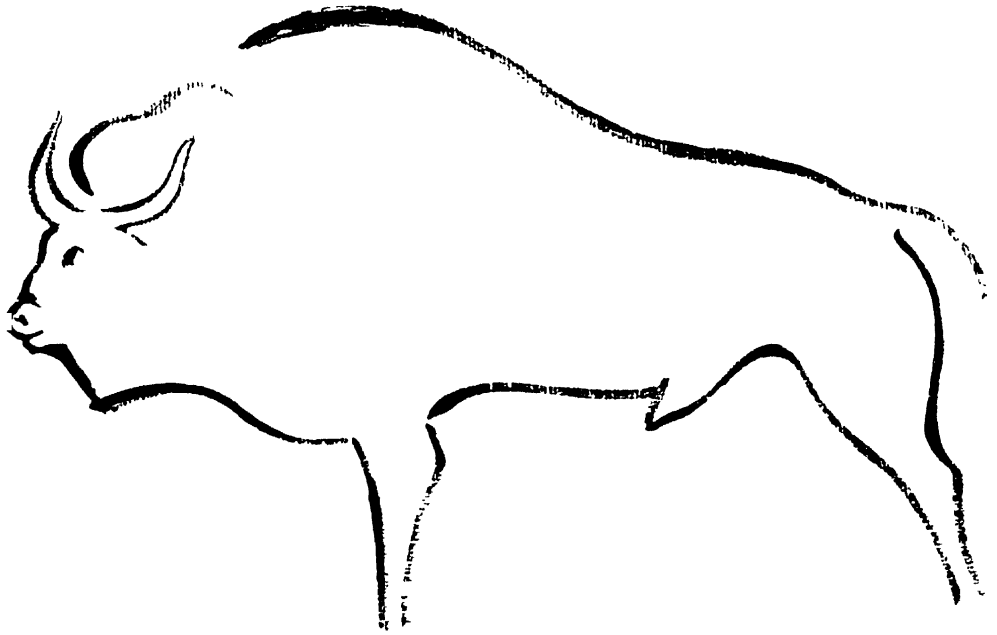
প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র । বল্লাহরিণ ও বাইসন
প্রাণবন্ত গড়নের রেখা । পনেরো কুড়ি হাজার বৎসরের পুরানো ছবি

মিশ্র। গড়নের রেখা— অজন্তা গুহার চিত্র (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) এবং মোগল চিত্র 'বাহাদুর শাহ্' (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক)

ঘের-দেওয়া রেখা— জৈন পুঁথিচিত্র (পঞ্চদশ শতক)   লেখাঙ্কনের রেখা— পারসিক (সপ্তদশ শতক)

কলমে লেখা ছবি ॥ শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত

বিলাতে পালখের কলম দিয়ে আর লোহার নিব দিয়ে কখনো কখনো লেখা ও ছবি আঁকা হয়েছে। পালখের কলম দিয়ে লেখা, সরু তারের পাত অল্প মুচড়ে নিলে যেমন দেখায় সেইরূপ। কিন্তু খাঁকের কলমে রেখার শেষটা যতটা চওড়া দেখানো যায় এ ক্ষেত্রে ততটা নয়; কারণ, পালখের কলমের ডগা একটু সরু ক'রেই কাটা থাকে।

ছুঁচোলো লোহার নিবে কেবল ছুঁচের আঁচড়ের মতো রেখা টানা হয়; খুব ধাতব ভাব থাকে।

তুলি দিয়ে সব রকম রেখাই টানা যায়; তবে তুলির রেখার একটা বিশেষত্ব থাকবেই।

ছবিতে পারসিক ও চীনারাই ঠিক-ঠিক লেখাঙ্কনের রেখা ব্যবহার করেছেন। অপরাপর প্রাচ্যদেশীয় ছবিতে রেখাগুলি প্রায়ই বিষয়বস্তুর ঘের হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। লেখাঙ্কনরীতির রেখাও ছবির ঘেরের কাজ করে বটে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব নির্বস্তুক (abstract) ধরন আছেই— শুধু রেখার খেলাটাই একটা স্বতন্ত্র উপভোগের বস্তু।
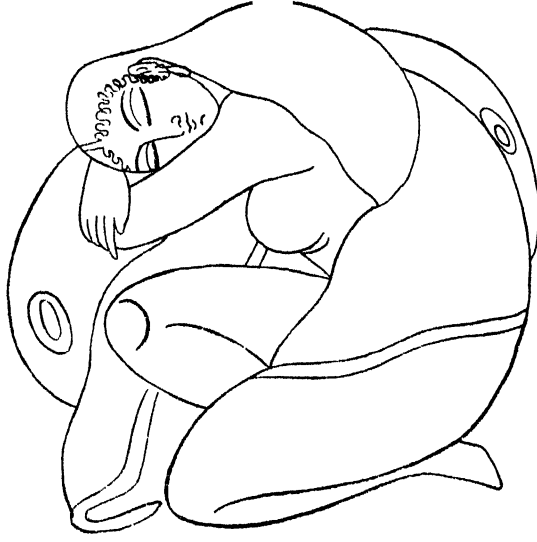
কালীঘাটের পট ॥ রেখানিবদ্ধ খসড়া

শ্রী অজিত ঘোষের চিত্রসংগ্রহ

যখন রূপের ভঙ্গী ও ভাব সম্পর্কে শিল্পীর দরদ ক'মে আসে, তা প্রকাশ করবার বিষয়ে তেমন মনোযোগ থাকে না, তখনই রূপের ছলে কেবল অলংকরণ করার দিকে শিল্পীর অভিনিবেশ বা ঝোঁক আসে। চিত্রে লেখাঙ্কনরীতির প্রয়োগ হয় তখনই। পুঁথিচিত্রণে ও ঘর সাজাবার কাজে বহু শতাব্দ ধ'রে এর বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। এটা মনে রাখতে হবে, কেবল সুইপ দিয়ে টানা অথবা অনায়াস ক্ষীপ্রতার সঙ্গে টানা হলেই হয় না, লেখার বা রেখার কায়দা ও দক্ষতা দেখাবার উদ্দেশ্যে যে রেখা বা লেখা তাকেই লেখাঙ্কন বলা হয়।

রেখার বিলম্বিত টানে বহুক্ষণস্থায়ী সংযমের দরকার, রেখার দ্রুত টানে অল্পক্ষণস্থায়ী সংযমের প্রয়োজন। কিন্তু উভয় রেখার টানেই দৃঢ়তা, অব্যর্থতা এবং তৈলধারাবৎ মনঃসংযোগ বা অভিনিবেশ থাকা চাই। বিলম্বিত লয়ের রেখা বিলম্বিত মিড়ের মতো। দ্রুতপ্রসৃত রেখা সুরের দ্রুত গমকের মতো। যখন ভাবকেই অনুসরণ করে মন, মনের একাগ্রতায়, তুলির টানে দৃঢ়তা ও অব্যর্থতা ফুটে ওঠে।

কোনো রূপের গড়ন বা ভঙ্গী বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে, প্রকট ক'রে তোলবার আগ্রহে, যে রেখার ব্যবহার তা অন্যরূপ। প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীদের চিত্রে, লোকচিত্রে, নিগূঢ়ভাবব্যঞ্জক ছবিতে, নানা দেশে আর নানা যুগেই তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া, এ কথা সকলেই জানেন।

আমাদের মনে হয়, চিত্রিত বস্তুর গড়নে, গুণে, আর রেখা টানার ধরনে সামঞ্জস্য রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুর, তাল, লয় ও ভাব মিলে যেমন গান সম্পূর্ণ হয়। অথবা বুদ্ধদেব লিচ্ছবিবাসীদের অভিনয় দেখে যেমন বলেছিলেন : তোমাদের নৃত্যগীত মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

প্রাণস্পন্দনের বিচারে চিত্রের রেখাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে— নির্জীব, নিপুণ, প্রাণস্পন্দিত বা জীবন্ত। জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর হকুসাই বলেছিলেন শোনা যায়, আমার এই আশি বৎসর বয়সে ছবি আঁকার রীতি-পদ্ধতির মর্মে খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে : আরও দীর্ঘ আয়ু যদি পাইতা

枯柴描

又謂柴筆描以銳筆横卧

為麄大減筆

লেখাঙ্কনরীতির চীনা ছবি। শুক্‌নো ডালের মতো রেখা। ছুঁচোলো লম্বা তুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি টান।

রেখা শুরুতে পেরেকের মাথা আর শেষে ইঁদুরের লেজের মতো। খাড়া তুলির আগাটি পুবাপুরি ছুঁইয়ে, পবে দ্রুত টানে শেষ করা হয়েছে।

পারসিক লেখাঙ্কন : লেখক আকা আব্দুর রশিদ

牡丹一本同榦二花其紅深
淺不同名品實兩種也一曰
疊羅紅一曰勝雲紅艷麗尊
榮皆冠一時之妙造化密移
如此褒賞之餘因成口占
異品殊葩共翠柯嫩紅拂拂
醉金荷春羅幾疊敷丹陛雲
縷重縈浴絳河玉鑑和鳴鸞
對舞寶枝連理錦成窠東
君造化勝前歲吟繞清香故
琢磨

চীনা । সম্রাট হুই ৎসুঙ'এর লেখা কবিতা । ১১০০-১১২৫ খৃঃ অ.
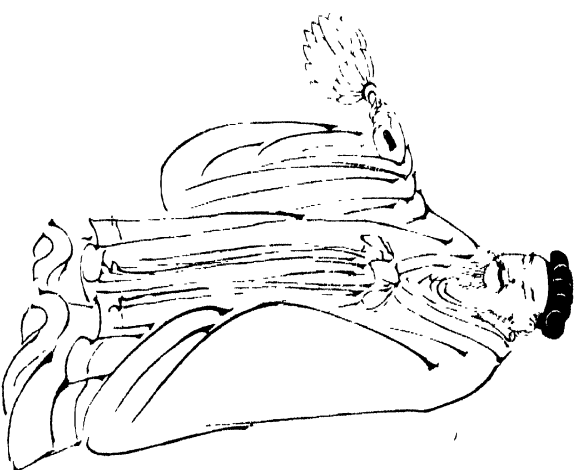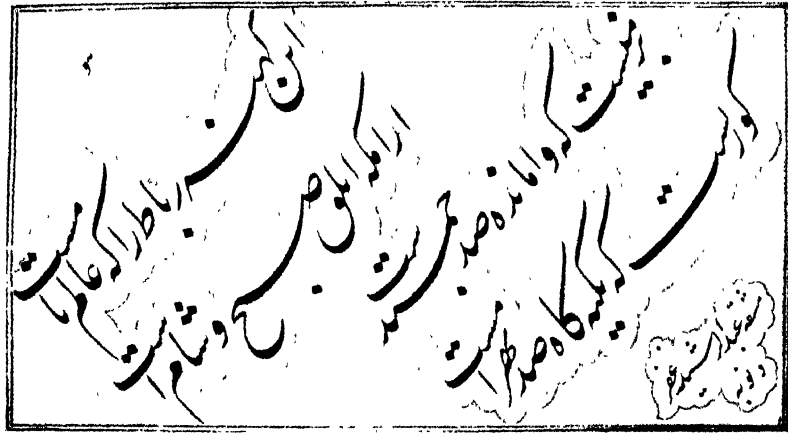
হলে ছবির মতো ছবি আঁকতে পারব আশা হয়; তখন চিত্রপটে যে ফোঁটাটি ফেলব, যে রেখাটি টানব, সবই কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ চিত্রকর এমন রেখা টানতে পারেন যাতে বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সংশয়, ভয়, অনভিজ্ঞতা আর অস্থিরতা ফুটে উঠেছে; রেখার দৃঢ়তা, সাবলীল ছন্দ, অব্যাহত গতি ও যথোপযুক্ততা পদে পদে নষ্ট হয়েছে। আর, এমন রেখাও টানতে পারেন যাতে কোনোরকম অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা বা প্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় না; যা পরিণত মন, অভিজ্ঞ দৃষ্টি (পর্যবেক্ষণ) ও অতিশয় দক্ষ হাতের স্বাক্ষর-করা। কিন্তু, আঙ্গিক-সাধনার শেষ সিদ্ধি এখানেও নয়। কারণ, শুধু আঙ্গিকের সাধনায় আঙ্গিকও চরমোৎকর্ষে পৌঁছুতে পারে না। যিনি একাগ্র ও নিরলস ভাবে আঙ্গিকের সাধনাও করেছেন আর শিল্পী হিসাবে যথার্থ রসপ্রেরণারও অধিকারী হয়েছেন, তাঁর তুলির টান কেবল নিপুণ নয়, জীবন্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? ফলতঃ এরূপ রেখা তুলিকে অনুসরণ করছে বলা চলে না; বরং আন্তরিক উপলব্ধির দিকে তাকিয়ে বলতে হয়, **রেখাকে তুলি অনুসরণ করছে।** বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতা থেকে, একান্ত তন্ময়তা থেকে, এপ্রকার প্রাণস্পন্দিত জীবন্ত রেখা সম্ভব হয়। আঁকার আগেই এরূপ রেখা শিল্পীর হৃদয়ে জন্ম নেয়। যেটা আগে থাকতে আছে তাকেই গোচর করা।

নিপুণ রেখা আর জীবন্ত রেখা দু'য়ের প্রভেদ ব'লে বোঝানো যায় না, বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় না।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'ধ্বনি'র প্রসঙ্গ আছে। 'ধ্বনি' বলতে ব্যঞ্জনা। সাদাসিধা ভাষায় প্রাণস্পন্দন বললেও আমাদের কাজ চলবে। কারণ, প্রাণ থাকলেই ব্যঞ্জনা আছে; প্রাণ নেই তো ব্যঞ্জনাও নেই। এখন, আলংকারিকেরা বলেন 'ধ্বনি' অনেক রকমের হয়। অলংকারধ্বনি, অর্থধ্বনি, রসধ্বনি— রসধ্বনিতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ। ছবিতেও তেমনি রেখা, রঙ, রূপ, প্রত্যেকটির 'ধ্বনি' থাকতে পারে। আর, সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড 'ধ্বনি' বা প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, রসের রূপ হতে পারে— তা রসিকের দৃষ্টিতে ও প্রতীতিতেই ধরা পড়বে। রেখা যেখানে জীবন্ত সেখানে রেখা 'ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্য ছবির প্রাণ হল রেখা। রেনেসাঁ ও তারই ধারাবাহী পাশ্চাত্য ছবিতে রেখা বলতে কিছু নেই; আলোছায়াই তার প্রাণ।

উচ্চারণ: ফ্যাং য়ু। অর্থ: নৃত্যপর ফীনিক্স্। দ্রুত রীতিতে লেখা চীনা লেখাঙ্কন। অধ্যাপক থান য়ুন্-শান'এর সৌজন্যে

স্বরাজসাধনা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ তার আদিম জৈব জীবনকে পিছনে ফেলে যত দূরে এগিয়ে আসে ততই সমাজ গড়বার সঙ্গেসঙ্গে সে নানাবিধ দৃশ্য ও অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে। তা না হলে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। দুজন লোক একত্র থাকতে গেলেও উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়, পরস্পরকে বুঝে চলতে হয়। সমাজের বেলায় এ রকম লিখিত ও অলিখিত নিয়মের বাঁধন আরও বেশি, রাষ্ট্রের বেলায় তো আরও বেশি। কারণ, সমাজে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য, রাষ্ট্রে লিখিত নিয়মের। সমাজের নিয়ম-কানুন পারস্পরিক সম্মতির উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভর করে, রাষ্ট্রের বেলায় পলিটিক্‌সের শাস্ত্রতত্ত্বে সম্মতির কথা যতই বলি না কেন কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার অনুশাসন শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অল্পবিস্তর পরিমাণে শক্তিপ্রয়োগের উপর। কিন্তু এসব নিয়ম সম্মতি বা শক্তি যারই উপর নির্ভরশীল হোক না কেন, এগুলি হল সভ্যতার বিকাশের অনিবার্য উপকরণ। জৈবধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যত এগিয়েছে তার জীবনধারা ততই এইসব বিধিনিষেধের খাত বয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসে একথাও দেখা যায় যে, এই নিয়মের বাঁধন না গড়ে উঠলে যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং সভ্যতার অগ্রগতিও হয় না তেমনই যখন সমাজের চলবার পথে ঐসব নিয়ম-কানুন অর্থহীন বাঁধন হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বাঁধনকে ভাঙবার চেষ্টায়, অন্ততঃ সে বাঁধনকে মেজে ঘষে নেবার চেষ্টায়, যে শক্তির জন্ম হয় সেই শক্তিই অগ্রগতির কারণ ও বাহন হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে অবস্থার তারতম্যে এই শক্তির রূপ বিভিন্ন। টয়েনবী দেখিয়েছেন যে, এথেন্সের রাষ্ট্রনায়কেরা সমাজে বিপ্লব বাঁচিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে। আবার এ যুগে মোটামুটি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত শিল্পশক্তি ও জাতীয়তাবাদ একযোগে চলে বড় বড় শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তার পর শিল্পশক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল, অথচ জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংস্থার মধ্যে এমন চেতনা জাগিয়ে তুলল যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অখণ্ড সত্তাই উঠল বিপন্ন হয়ে। যে দুটি শক্তি এককালে একদিকে কাজ করেছিল কালক্রমে তারা বিভিন্ন ও বিপরীত দিকে কাজ করতে লাগল। যে যুগে এইসব বিভিন্ন শক্তি পারস্পরিক অভিঘাতেই নিঃশেষ না হয়ে একযোগে কাজ করে সে যুগে ঐ নিয়ম সৃষ্টির সহায় হয়। কিন্তু যখন সে পরিবেশের বদল হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে নতুন শক্তি সঞ্জাত হতে থাকে অথচ বাইরের নিয়মটা খোলসমাত্র হয়ে থাকে, তখন বাইরের ঠাটটা বজায় থাকলেও প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য তখন তার চতুঃসীমার মধ্যে সৃজনধর্মিতা আর বজায় থাকে না, ভিতরে ভাঙনের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে।

যখনই সমাজে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক জীবনে এ রকম দুর্লক্ষণ দেখা দেয় তখনই প্রায় জৈবিক নিয়মেই সেই দুর্লক্ষণ প্রতিরোধ বা অপসারণের শক্তি জন্মাতে থাকে। হয়তো এই সংঘর্ষে এক এক সময় ভাঙনটাই খুব বড় হয়ে ওঠে, চারদিকে অবিশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে। যেমন একালের সাহিত্যে বইছে,

অনেক সময় সমাজেও। কিন্তু ইতিহাসের বিস্তৃতকাল আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙাচোরা ক্ষয়ক্ষতি লোকসানের মধ্য দিয়ে আর-একটা নতুন ভূসংস্থান জেগে ওঠে। একথা যদি সত্য না হত তাহলে মানবসমাজ এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন অবিশ্বাসী কবিদের ব্যঙ্গ ও বৈহাসিকতার পর রোমান্টিক কবিরা উদ্দীপন আশার সঞ্জীবনমন্ত্র আগুনের ফুল্‌কির মত ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ; বা এদেশে সমাজের বন্ধনজর্জরতার শেষ সীমায় রবীন্দ্রনাথ অবুদ্ধির উৎপীড়ন হতে মুক্ত চিত্তের স্বারাজ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের নতুন ধারায় দেশকে প্লাবিত করতে পেরেছিলেন। যুগে যুগে এ রকম ঘটছে— সময় সময় নতুন-জেগে-ওঠা শক্তি খুব বৃহৎ এবং গভীর হয়, তার চিহ্ন মহাকালের খাতায় স্থায়ী হয়, আবার সময় সময় সে শক্তি কেবল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রাচীন যুগের তুলনায় কিন্তু এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সেকথা আলোচনা করতে গিয়ে টয়েনবী বলেছেন, আগের যুগে বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা নিজের জগতের মধ্যেই মশগুল হয়ে থাকত, বাইরের দিকে বড় একটা তাকাত না। কিন্তু এ যুগের বিশেষত্ব হচ্ছে শুধু যে বস্তুজগতেই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ঘনসংশ্লিষ্ট তাই নয়, মনোজগতেও তারা ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।[১] শুধু দূরদূরান্তরে সহজে যাতায়াত ও লেনদেন ব্যাবসাবাণিজ্যের ফলেই এটা ঘটে নি ; মানসিক হাওয়াবদলও ঘটেছে, চেতনা নতুন পথে সঞ্চারিত হচ্ছে। পশ্চিম দেশে যখন লিবরলিজ্‌মের স্রোত শুরু হয়, মানবিক অধিকারের প্রসার চেষ্টার আরম্ভ, তখন তা য়ুরোপের লোকদের চিন্তা করেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ প্রাচ্যভূখণ্ড, হতে রস আহরণ করে তাঁদের সমৃদ্ধি, এবং মানবিক অধিকারের দাবী সেই কারণে যে তাদেরই সর্বাগ্রে— একথা তাঁদের কারও স্মরণ হয় নি। কবির ভাষায়, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। এই কথাটা য়ুরোপ মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে প্রাচ্য ভূখণ্ডকে অনুভব করিয়েছে। আজ সেজন্যই অবস্থা বদলেছে। একালের বিধ্বস্ত সমাজে পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব ওদেশে রচনা করতে হলেও খালি য়ুরোপের কথা ভাবলে চলে না, গোটা জগতের কথা ভাবতে হয়। এসব দেশকে বাদ দিয়ে কোনো তত্ত্বকথাই ভাবা চলে না। আগে যা স্থানীয় শক্তি হলে চলত এখন তা বিশ্বশক্তি, অন্ততঃ ব্যাপক শক্তি হবার প্রয়োজন ঘটেছে।

এই রকম পরিবর্তনের আসল কারণ হল, সারা বিশ্ব এখন মনোজগতে বা বস্তুজগতে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত যে কোনও জায়গায় সংকট দেখা দিলে সে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বসংকটে পরিণত হয়। অবশ্য, মৌলিক সংকট হলে। আর, একথা তো সকলেই অনুভব করেন যে আমরা বর্তমানে এ রকম একটি গভীর মৌলিক সংকটে এসে পৌঁছেছি। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, গত দু শো বছর ধরে সমাজ যে মানসিক ও

---

১ "In the new age, the dominant note in the corporate consciousness of communities is a sense of being parts of some larger universe, whereas, in the age which is now over, the dominant note in their consciousness was an aspiration to be universes in themselves. This change indicates an unmistakable turn in a tide, which, when it reached high-water mark about the year 1875, had been flowing steadily in one direction for four centuries."—Toynbee, *Study of History* vol I. p 15.

অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পড়োপড়ো হয়েও কোনো রকমে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল আজ সে ভিত্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস—নতুন করে ভিত্তিরচনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগতের অন্যান্য দেশেও এ রকম অবস্থা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় নতুন শক্তি কি রূপ নেবে ?

২

উপরি-উক্ত প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাবই সম্ভব নয়, কেননা তা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে গত শতাব্দীর নিরাকার চিন্তাধারা এই শতাব্দীতে সাকার সাম্যবাদে পরিণত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সে জিনিসটা জগতের মনকে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তার কর্মপদ্ধতি বা ক্রিয়াকৌশল সব জায়গায় সমান নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি রুশিয়ায় যে ভূমিব্যবস্থা করা হয়েছে চীনে তা থেকে কিছু পৃথক ভূমিব্যবস্থা করা হচ্ছে। পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এ রকম কিছু কিছু তফাত আছে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির কথা বলছি না। এই রকম ছোটোখাটো পার্থক্য ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে, তাঁদের কতকগুলি মূল কথা আছে যা সর্বত্রই এক। একথাও অস্বীকার করতে পারি নে যে ইতিহাসের গতি নির্ণয়ে তাঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অর্থনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বাস্তব ও সুনিপুণ, দশ বছরের পথ এক বছরে হাঁটতে তাঁরা সক্ষম। শুধু যে নিজেরাই সক্ষম তাই নয় ; এই আদর্শের নামে কিছু লোকের মধ্যে প্রায় ধর্মোন্মাদের মত উৎসাহ সৃষ্টি করে, আর কিছু লোকের উপর অসংকোচে বলপ্রয়োগ করে তাঁরা দেশটাকেও অনেকখানি দ্রুত হাঁটাতে সক্ষম। এ ছাড়া আরও নানা তর্কের বিষয় আছে, যা এখানে অবান্তর। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হল, মানুষ নয়, রাষ্ট্র। সেইজন্য সাম্যবাদীর কর্মকাণ্ডের প্রথম লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করা ; শুধু দখল করা নয়, শোষকদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সবলে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার চিহ্নমাত্র না রেখে একেবারে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপনা করা। স্টালিন একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রচলিত অর্থে ডিমোক্রেসি নয়, সেখানে সত্যকারের মেজরিটি রাজত্ব করবে মাইনরিটির উপর। মাইনরিটি হল শোষক সমাজ, তাদের বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেই হবে। পারী কমিউনের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন, তার প্রধানতম কারণ হল সেখানে কর্তারা পুরোপুরি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে কিছু কিছু পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র রেখে তার সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের খানিকটা ভেজাল দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য এই তত্ত্ব অনুসারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে একেবারে সর্বগ্রাসী, তার বাঁধা ছকে সারা দেশটার সকল মানুষের জীবন বাঁধা। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে রাষ্ট্রকে দৃঢ় ও পুষ্ট করবার চেষ্টায় মানুষকে ছককাটা পথে পরিচালিত করা। এ পথে হয়তো শোষক শ্রেণী আর থাকবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়তো হতে থাকবে, কিন্তু সেসবই হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকায়। ব্যক্তিমানুষ তাতে পিষ্ট। সেই চাকা চালানোতেই তার একমাত্র সার্থকতা, তার বাইরে তার প্রয়োজন নেই। উৎকর্ষের মানদণ্ড হল সেই চাকা কে কত ভালো ভাবে চালাতে পারছে। রাষ্ট্রনায়কদের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগ্রহ এত বেশি যে দেশের প্রত্যেকটি লোক সেটি বোঝা ও সে সম্বন্ধে উৎসাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর যাঁরা তাতে সায় দেবেন না তাঁদের উচ্ছেদই হল সেই স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার সিধে পথ। ও বলিদান পাপ তো নয়ই, বরং ধর্ম। যাঁরা ও বলিদানে ভীত তাঁরা এই শক্তিপূজার তন্ত্রধারক হবার অযোগ্য।

এ পথ ভালো কি মন্দ সেসব তর্ক এখানে অবান্তর। একথা সত্য যে, এখন এ পথ জগতে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বাস্তবিকই, যে সময় মানুষের দুঃখকষ্ট সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সে সময় সে ক্রূর কঠোর ভয়াল হয়ে ওঠে। তখন এই রকম রুক্ষ অবিমিশ্র কেজো কথাই তার মন সম্পূর্ণ দখল করে নেওয়া স্বাভাবিক। হিতবচনের চেয়ে কর্মোদ্যমই তার প্রিয়। আর যদি সহজে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় তাহলে তার অনিবার্য উপায়স্বরূপে সে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাট্ চাকার মধ্যে স্বেচ্ছায় অঙ্গীভূত হতে আপত্তি করে না, বরং বিশ্বাস করে এই পথেই তার আদর্শসিদ্ধি, এমন কি উৎসাহেরও অভাব বোধ করে না।

৩

আজকের দিনে আমাদের দেশে স্বরাজসাধনার উপায় স্বরূপে এই পথ ভালো কি মন্দ সে কথা আলোচনা না করলেও মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আমরা একটা নতুন পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেছি। তার প্রবর্তক হলেন গান্ধীজি। সাধারণ পলিটিশ্যনদের লক্ষ্য গোটা মানুষ নয়। মানুষের জীবনের যেটুকু রাজনীতির আওতায় পড়ে সেইটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার। যে লোকটা তাঁদের ভোট দিয়ে গেল সে লোকটার জীবনাদর্শ কি, ব্যক্তিগত চালচলন কেমন, এসব অবান্তর কথা নিয়ে তাঁদের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ স্বরাজসাধনা আর জীবনসাধনা এঁদের তত্ত্বে সমীকৃত হবার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত, তার বাইরে যাবার দরকার তাঁরা অনুভব করেন না। সাম্যবাদ বোধ হয় তার প্রথম ব্যতিক্রম, কেননা তারা শুধু ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সারা জীবনটাকে একটা যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে দেবার চেষ্টাও করে। কিন্তু গান্ধীজি হলেন এ দুয়েরই ব্যতিক্রম। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল মানুষ। রাজনীতির আপাত লাভক্ষতি তিনি এই মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছেন। স্বরাজ-লাভের চেয়েও স্বরাজলাভের উপযুক্ত মানুষ তাঁর চোখে বড়। চৌরীচৌরার পর আন্দোলন বন্ধ করা হতে এই ধরনের বহু সিদ্ধান্তের মূল এইখানে। তিনি জানতেন এ দেশের মানুষকে স্বরাজলাভের উপযুক্ত করে তুলতে পারলেই আপনা-আপনি শৃঙ্খল খসে যেতে বাধ্য। আর তা না হলে যদি কেউ এসে একবার তার শৃঙ্খল খুলেও দেন, পরক্ষণেই সে আবার কারও কাছে শৃঙ্খল পরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। আর যে দেশে অগণিত মানুষ এ রকম শক্ত বুনিয়াদে নিজেদের গড়ে তুলেছে সে দেশে স্বরাজের ভিত হবে পাকা। মুক্তধারার ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের সে লজ্জা রাখবার স্থান ছিল না। সে বলেছিল "আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাহলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।" একজন লোক যদি মহা শৌর্যে-বীর্যে সারা দেশের জন্য স্বরাজ এনে দেয় তাহলে তার কৃতিত্ব অপরিসীম হল বটে, কিন্তু সে স্বরাজ দেশের লোকের জন্য হল না, সে হয়ে রইল একজনের উপর নির্ভরশীল, পঙ্গু। এতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একজন মানুষ, তিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, দেশকে চিরকাল কখনও রক্ষা করতে পারেন না। আর পারলেও সে অবস্থায় দেশের লোকের কোনো স্বরাজই হল না, তারা ইংরেজের বদলে আর-একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল, চিন্তায় কর্মে মনে। সেই জন্য গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল মানুষ, যে মানুষের জীবনে স্বরাজসাধনা ও জীবনসাধনার সমীকরণ হবে। ধর্মযাজকেরা যুগে যুগে এ রকম চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা সমাজ বা রাজনীতির ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করে। গান্ধীজিই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি গুহাহিত তপস্যার জন্য নয়,

দৈনন্দিন রাজনীতির সক্রিয় উপায় হিসাবেই এই মানুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাজনীতির চাতুরিভরা ছলনাময় রঙ্গমঞ্চে এ রকম অদ্ভুত চেষ্টা এর আগে হয় নি। এইখানে তিনি সাধারণ পলিটিশ্যনের ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে তিনি কেজো লোক হলেও মুক্তিসাধনার শর্টকাট হিসেবে মানুষকে যান্ত্রিক চেষ্টার অঙ্গীকৃত হতে দিতে চান নি। যেখানে মানুষকে সজ্ঞান কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মিলিত করতে পারা যায় না সেখানেই তাকে অজ্ঞান বাধ্যতায় জোর করে জুড়তে হয়। মানবচরিত্রের ওরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়, অথবা ওরকম পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যে সময় ও যে চেষ্টা প্রয়োজন তাতে মজুরি পোষানো সম্ভব নয়— এ বিশ্বাস থাকলে কর্তৃপক্ষ অজ্ঞান বাধ্যতার পথই বেছে নিতে বাধ্য। কিন্তু তা হতে প্রমাণিত হয় না যে যদি সজ্ঞান কর্মচেষ্টার সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হত তা হলে তাতে আরও ভালো ফল ফলত না। মুক্তধারার যন্ত্ররাজ বলেছিল, তাঁর বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আল্‌গা করতে পারে এমন পথ খোলা নেই। উত্তরে দূত বলেছিল, ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না, তাঁর জন্য যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না। সুবৃহৎ যন্ত্রের বিপদই এই ; একবার ফাটল ধরলে তাকে আর ঠেকানো যায় না। সেইজন্য সন্দেহ বা অবিশ্বাসের এতটুকু চিহ্ন দেখা গেলেই তাকে তখনই সবলে অপসারণ করতে হয়। তাছাড়া সমাজ মুক্তির স্বর্গরাজ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছে একথা বিশ্বাস করলে সেখানেই সমাজের গতি রুদ্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ, সামাজিক জৈবধর্মে যে নতুন নতুন শক্তির সৃষ্টি হতে থাকে সে শক্তির উৎসমুখ যদি খোলা থাকে তাহলে সমাজের ফের বদল ঘটবেই। কিন্তু সমাজ তার বিকাশের চরমতায় পৌঁছেছে যদি একথা বিশ্বাস করা হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সেখানেই তাকে আটকে রাখে তাহলে আবার নতুন শক্তির জন্ম বা নতুন পরিবর্তনের সূচনা অনভিপ্রেত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক যে সমাজে আর নতুন শক্তি যেন না জন্মায়। সমাজে নতুন শক্তি না জন্মালে রাষ্ট্রেরও আর কোনো বদল ঘটতে পারে না, সেইজন্য সে অবস্থায় রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তরই নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে একজায়গায় এনে সেখানেই চিরকালের মত স্তব্ধ করে রাখবার চেষ্টা বোধ হয় সম্ভব নয়— সম্ভব হলেও, স্বাভাবিক নয়। অথচ যদি যান্ত্রিক ভিত্তির বদলে সচেতন সজ্ঞান খাঁটি মানুষের জোড় মেলাতে পারা যায় তাহলে সে বুনিয়াদে শুধু যে ফাটল ধরবার আশঙ্কাই কম তাই নয়, তাতে ফল আরও ব্যাপক আরও গভীর এবং আরও স্থায়ী হবে। গান্ধীজি জানতেন যে, এভাবে মানুষকে গড়ে তোলা সহজ নয়। কিন্তু অন্য সহজ পন্থা ত্যাগ করে তিনি এই মহাযানের পথিক হতে দ্বিধা করেন নি, কারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্মর। এইখানে তিনি সাম্যবাদের চলিত পন্থারও দারুণ ব্যতিক্রম। আর তাঁর শেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এসব কথা অবাস্তব ধর্মোপদেশ হিসেবে বলেন নি, কাজের পদ্ধতি হিসেবেই বলেছিলেন এবং সে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফললাভও করেছেন।

৪

আজ যখন স্বরাজসাধনা আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু হয়ে উঠেছে তখন ভাবতে হবে এই স্বরাজসাধনার সফলতার জন্য কি রূপ দরকার। স্বরাজলাভের সাধনার সময় আমাদের পারস্পরিক বন্ধন ছিল প্রধানতঃ পরবশতার হাত হতে মুক্তির চেষ্টা। সারা ভারতবর্ষ ক্রমশঃ এই সূত্রে বাঁধা হয়েছিল। এক হিসেবে

মুক্তিপ্রচেষ্টার এই রূপও ইংরেজ সাম্রাজ্যের ফল। ভারতবর্ষে বহু সাম্রাজ্য হয়েছে এবং গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড সত্তার ধারা চলে এসেছে। কারণ, এইসব সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে পোলিটিক্যাল সংহতির মধ্যেই সংহত করতে চায় নি, করতে চাইলেও পারে নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে মিল ছিল পোলিটিক্যাল্ সূত্রে নয়, সমাজের স্তরে। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে বলেছিলেন। আমাদের যেখানে যেখানে মিল ছিল সে মিল পোলিটিক্যাল বন্ধনের ফলে সৃষ্টি হয় নি। সমাজের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল বলেই সে মিল এইসব সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের মধ্যেও টিকে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যই একসময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত, কবিরই ভাষায়, এক বিচিত্র ব্যাপার। একহিসেবে অনন্যও। শুধু যে তারা আমাদের চিত্তের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এনেছিল তাই নয়, সঙ্গেসঙ্গে আমাদের সমাজের ধারাটিও দিল বদলিয়ে। এতদিন ধরে আমাদের সমাজ যে সূত্রটি ক্ষীণভাবে ধরে রেখেছিল সে সূত্রটি এই নতুনতর সভ্যতার সংঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্য একদিকে যেমন সাম্রাজ্যিক কাঠামোর চাপে আমাদের দেশে এবং সমাজে মোটের উপর দেখা দিল ভাঙন, তেমনই অন্যদিকে আমাদের চিন্তাভাবনা সমাজের স্তর হতে চলে গেল পলিটিক্সের প্রস্থানভূমিতে। একথা সত্য যে, ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকশনে যেমন সাহায্য করেছে তেমনি কোনো কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাজসংস্থানেও জাগিয়েছে নতুন শক্তি। এইরকম শক্তির ফলেই বাংলায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলে গত দু শো বছরের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভাঙনের ধারাই মোটের উপর ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই ধারার প্রসার নিবারণ করে সমাজের শক্তিকে নতুন রূপে জাগরিত করবার কোনো চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না। ইংরেজ রাজত্ব আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনে বেঁধেছিল, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেষ্টাতেও আমরা তেমনই প্যোলিটিক্যাল মঞ্চেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এ বাঁধন যে কত ঠুন্‌কো তা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আমলেও হিন্দুমুসলমানের মনকষাকষি উপলক্ষ্যে বার বার বলেছিলেন। শুধু হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেই একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলে এসেছেন। "কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সাড়া যখন পাই না তখন রাগ হয়। মনে হয় এই যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্য মাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।"[২] কিন্তু এই দুর্বলতা পরের যুগেও সংশোধিত হয় নি। উপরন্তু এই মূলগত দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা না করে আমরা সেটা চাপা দিতে চেয়েছি প্রলোভন দেখিয়ে। তাতে নিজেদেরও হিত হয় নি, অপর পক্ষেরও নয়। বরং আসল ব্যবধান আরও দুস্তর হয়েছে। খিলাফৎ-প্রসঙ্গে এইজন্যই কবি লিখেছিলেন, "অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা

২ সমূহ।

সত্যতঃ মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্য দল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না।" কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এদিকে কেউ নজর দেন নি। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসও এ কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নি। কারণ, গান্ধীজির পক্ষে মানুষের সাধনা ছিল নীতি, কংগ্রেসের পক্ষে তা কৌশলমাত্র। সেইজন্য আমাদের স্বরাজলাভের সাধনার ধারা গড়িয়ে চলেছিল কেবলমাত্র পলিটিক্‌সের পথ ধরে। অসফলও হয় নি, তার কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাঁধনটাও ছিল পোলিটিক্যাল সূত্র ধরেই।

স্বরাজলাভের সাধনা স্বরাজসাধনায় পরিবর্তিত হবার সঙ্গেসঙ্গে মূল প্রশ্নটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র পলিটিক্‌সের পথ ধরে আমরা স্বরাজসাধনার পথে অগ্রসর হতে পারব কি না। বিশেষতঃ এই চার-পাঁচ বছরেই আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজবিতাড়নের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনের জোড় আলগা হয়ে পড়ছে। ভাষাগত বিরোধ, প্রদেশগত বিরোধ— এসব তো আছেই। সেইসঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে যে অনৈক্যের মূল পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল তা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অনৈক্যের প্রধানতম অবশ্য অর্থনৈতিক অনৈক্য। আর্থিক প্রসারের যুগে এটা তত পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু এযুগের মত আর্থিক সংকোচনের সময় তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে, ক্ষীয়মাণ রসধারার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হতে থাকে। তবুও ঐ অনৈক্য একেবারে পুরোপুরি অর্থনৈতিক নয়। এই কাঞ্চনকৌলীন্যের যুগেও অন্য ধরনের অনৈক্য একেবারে মরে নি; বিশেষতঃ যেসব দেশে অবুদ্ধি অবিদ্যা অনেকদিন ধরে রাজত্ব করে এসেছে সে দেশে তার জড় মরে সম্পূর্ণ কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হতে সময় লাগে। সমাজ এবং ধর্মের নাম দিয়ে দুঃখ এবং অপমানের বেদনা অর্থনৈতিক বেদনার চেয়ে আমাদের দেশে আজও কম দুঃসহ নয়। এই ধরনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনৈক্যের মূল রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে। এই বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়ে কেবল পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে মিলন ঘটাতে গেলে সে মিলন সত্যও হতে পারে না, স্থায়ীও নয়। বিশেষতঃ য়ুরোপের মত এদেশে অন্য চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পলিটিক্‌সের স্তরে চিন্তা করার অভ্যাস আমাদের বেশি দিনের নয়। য়ুরোপ বহুদিন থেকে অন্য সবরকম সংস্কারকে ভাঙতে ভাঙতে আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে সমস্ত কুসংস্কার ভাঙবার অজুহাতে তারা সকল সংস্কার ভেঙে আস্তিক্যবুদ্ধিরই বিলোপ ঘটিয়ে বসেছে, আজ তারা বরং আস্তিক্যবুদ্ধির সন্ধানেই ব্যতিব্যস্ত। আমাদের দেশে ভালো হোক মন্দ হোক নানা রকম সংস্কার বা সংস্কারের অপভ্রংশ আজও জীবন্ত সত্য। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সমাজের অসমতা। এ অবস্থায় কেবলমাত্র পোলিটিক্যাল স্তরে দেশটাকে বেঁধে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাস্তববুদ্ধির বা কর্মকৌশলের পরিচয় নয়।

তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাববার আছে। য়ুরোপের দেশগুলির মত ভারতবর্ষ ছোট দেশ নয়। সেখানে কেন্দ্রস্থ শাসনব্যবস্থার উৎসমুখ থেকে যে ধারা উৎসারিত হয় তা সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সহজেই। আমাদের দেশের পক্ষে সে কথা সত্য নয়। এই বিরাট দেশে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে

যে ধারা বইয়ে দেওয়া হয় তা পরিধি পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে প্রায়ই শুকিয়ে যায়, সীমানায় শেষ পর্যন্ত তার আর কোনও চিহ্নও বহুসময়ে থাকে না। এ রকম বৃহৎ দেশ যান্ত্রিক ছন্দে বাঁধা থাকলে কেন্দ্র হতে পরিধি পর্যন্ত ধারাস্রোতের যাত্রাপথে নানা জায়গায় পাম্প বসিয়ে তাকে জোর করে চালাবার চেষ্টা বরং সম্ভব। কিন্তু সে যান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে নির্ভর করতেই হবে মানুষের উপরে। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় উপযুক্ত খাত কেটে সেই ভাগীরথীর ধারাকে বইয়ে নিয়ে যায় তাহলে যন্ত্রের অভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। বরং আরো ভালো ফল হয়।

আজ স্বরাজসাধনার মূল প্রশ্ন এইখানেই। আমরা প্রথমতঃ দেশটাকে যতই পলিটিক্‌সের বজ্র-বাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছি, সর্বত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র স্থাপনার চেষ্টা করছি, আমাদের সেই সৎ ও মহৎ প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফল লাভ তো করছেই না, বরং দিন দিন নানারকম অনৈক্য জোর হয়ে উঠছে। আসল গলদ ঐখানে; সেগুলিকে না সরিয়ে জোড়াতালি দিয়ে শুধু পোলিটিক্যাল ঐক্যের বন্ধন এ অবস্থায় কখনোই সফল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতালাভের পর থেকে নানা জনহিতকর প্রচেষ্টাও আশানুরূপ ফললাভ করছে না, তারও কারণ কেন্দ্র থেকে পরিধিতে পৌছতে পৌছতেই সে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— মাটি উর্বর করতে পারছে না, ফসলও ফলাতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় মাত্র দুটি। প্রথমতঃ, সারা দেশটাকে অনড় কঠিন যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে এ হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হতে পারে; যে যন্ত্র আমাদের নানারকম অনৈক্য স্টীম-রোলারের মত গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে সবলে এক নতুন বাঁধনে আমাদের দেশকে বেঁধে রেখে সজোরে সামনের দিকে চালাবার চেষ্টা করবে এবং সেইসঙ্গে কেন্দ্র হতে উৎসারিত ধারাকে যান্ত্রিক শক্তিতে সীমানা অবধি পৌছে দেবে। কিন্তু আমরা যদি সেই পদ্ধতি লাভক্ষতির বিচারে শ্রেষ্ঠতম, অর্থাৎ পরিণামে সব চেয়ে লাভজনক, বলে মনে না করি তা হলে মানুষের দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

গান্ধীজি আগে থেকেই এই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কেবল মানুষের কথাটাই বড় করে বলতে চেয়েছেন। হাতেকলমে স্বরাজসাধনা করবার আগে আমাদের কাছে এই সমস্যাটা স্পষ্ট হয় নি, সেইজন্য গান্ধীজির কথাও অনেক সময় আমাদের কাছে অবাস্তব ঠেকেছে। কিন্তু হাতেকলমে স্বরাজসাধনা করতে গিয়ে আমরা ক্রমেই এই সমস্যার গভীর গহনে প্রবেশ করছি। তথাকথিত গান্ধীবাদীরা গান্ধীজির কথাবার্তাকে একেবারে অনড় শাস্ত্র বানিয়ে তার সূত্র ভাষ্য নিয়ে নৈয়ায়িকদের মত যেসব তর্ক করেন সেসব তর্ক একেবারেই অবান্তর। এমনকি বিশেষ কোনো অবস্থায় গান্ধীজি যেসব পথ নির্দেশ করেছেন সেসব পথই যে চিরকাল পরিবর্তনহীন ভাবে চালাতে হবে, এমন চিন্তাও বাস্তব নয়। যেমন চরখার কথা, খাদির কথা। কিন্তু এইসব তর্কে আসল কথাটা ভুললে চলবে না। উপায় নিয়ে যতই তর্ক হোক উদ্দেশ্যটা মনে রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যটা হল, আজ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যদি সজীব প্রাণবান এবং শোষণবর্জিত সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে তার সমবায়ে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, শুধু কেন্দ্রীভূত বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যান্ত্রিক রাষ্ট্র উপর থেকে বলপ্রয়োগ করে তেমন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রটা গড়ে তুলতে হবে পিরামিডের মত তলা থেকে উপর পর্যন্ত। উল্‌টো পিরামিডের মত উপর থেকে শুরু করে তলা পর্যন্ত নয়, কারণ তাহলে সেটা আসলে উর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ বৃক্ষের মতই ঝুলতে থাকবে, বাইরে তার শক্তির আড়ম্বর ও মত্ততা যতই থাক্ না কেন।

আমাদের স্বরাজসাধনার এই সমস্যাটি ভালো করে উপলব্ধি করলে চিন্তা করতে হবে, সেই নতুন সমাজ কি ভাবে গড়ে তোলা যায়, কি-ই বা তার আদর্শ। এবিষয়ে গান্ধীজি তাঁর গঠনকর্মপদ্ধতিতে এবং অন্যান্য রচনায় বহু নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন মানুষ গড়বার আগ্রহ তাঁর সর্বত্র, সেই মানুষের ভিত্তিতেই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। আর, সে সমাজ হবে বিকেন্দ্রীকৃত, কারণ কেন্দ্রীকরণ হলেই তার জীবনছন্দ বিচিত্র মিলে মিলিত না হয়ে যান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এই হল তাঁর মূল কথাটা, তাঁর সূত্রকারেরা হিংসা-অহিংসা শিল্প-কুটিরশিল্প প্রভৃতি নিয়ে যতই তর্ক করুন না কেন। এবং আজকের দিনে এবিষয়ে চিন্তা করতে হলে আমাদের সেই মূল কথাটাই ভাবতে হবে, সূত্রভাষ্যটীকার গহন অরণ্যে হারিয়ে গেলে চলবে না।

সেইজন্য এই কথাটা ভাবতে গেলে আরও একটা কথা না ভেবে উপায় নেই। টীকাকার-ভাষ্যকারেরা তাঁদের কলহ-কোলাহলে আসল কথাটাকে ঘুলিয়ে তুলুন বা নাই তুলুন, গান্ধীজি মানুষের নবজন্ম চেয়েছিলেন বটে, ভাস্বর শুদ্ধাচারে তার জীবনসাধনা ও স্বরূপসাধনা সমীকৃত করতে চেয়েছিলেন একথাও সত্য, তবু তাঁর কল্পনার মানুষও মানুষের মহত্তম বিকশনের আদর্শ স্বীকার করে নি। তার সত্তাও বহু জায়গায় খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত। সেকথা সবচেয়ে ভালো করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যের আহ্বান' এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রবন্ধে। আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষ চাই তাহলে তার পূর্ণ বিকাশ চাই। সে অবস্থায় তার মন যদি ইংরেজের শিকলে বাঁধা না পড়ে চরকার শিকলে বাঁধা পড়ে, সে যদি মনে করে যে যন্ত্রের মত চরকা ঘুরিয়ে গেলেই একদিন আপনা-আপনি স্বরাজ এসে উপস্থিত হবে তাহলে বুঝতে হবে তার মনটা তেমনই অনড় আছে, কেবল তার বশ্যতা একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে বদল হয়েছে মাত্র। কবির ভাষায় এ ঢেঁকির মনিব-বদল মাত্র, যেই তাকে চালাক না কেন, সে পাড় দিতেই থাকবে। আসলে তার ঢেঁকিজন্ম থেকে মুক্তি চাই। সুতরাং আজ যখন মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের ধর্ম তখন সে মানুষ শুধু উজ্জ্বল ভাস্বর ক্লেদলেশহীন হলেই হবে না; শুধু জীবনটিকে সে তপস্যার মত ধারণ করে জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনাকে একীকৃত করলেই হবে না; তার সঙ্গে দেখতে হবে তার আদর্শে কোনো খাদ নেই, তার মন হতে জড়তা দূরীভূত। অন্ধ বাধ্যতা কারও কাছেই ভালো নয়— ইংরেজ মহিমার কাছেও নয়, এদেশের অতীতযুগের বিচারহীন গুণগানেও নয়, কোনো স্বদেশী ফরমুলার কাছেও নয়, কারণ ও হল যান্ত্রিকতারই বিভিন্ন রূপ। যে মানুষ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরের সঙ্গে নতুন সমাজরচনার চেষ্টায় সাগ্রহে মিলিত হয় সেই সজ্ঞান ও সাগ্রহ মিলন ও কর্মচেষ্টার চেয়ে ফলবান আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, "দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে।· ·দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকে ছোটো করা হবে।· ·স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। স্বাস্থ্যের সঙ্গে,

বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই।"[৩] কি উপায়ে সেই রূপটির প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন, আমাদের অবিদ্যা অবুদ্ধি দূর করে চিত্তের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে— যে চিত্ত পাঁজি মনসা ওলাবিবির কাছে বিক্রীত নয়, যে চিত্ত মুসলমানকে শুধু রাজনীতির বেলা ভাই বলে আহ্বান করে মানবিক অধিকারের বেলা দূরে ঠেলে রাখে না, রাজনৈতিক সভায় চাষীদের জন্য বক্তৃতা দিয়ে ঘরে এসে তাদের 'চাষা বেটা' বলে না। সেই সঙ্গে আমাদের সাধনা করতে হবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাধনা— যা মানবসত্তাকে খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত আদর্শের দিকে টেনে না গিয়ে পরিপূর্ণ ভালোর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আর, সেই সঙ্গে আরও চেষ্টা করতে হবে, "জীবিকার ভিতের উপর একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার"। "জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে— মরণের ডাকের মতই এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়— যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারব। তা ছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাব অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।" এইভাবে চলতে পারলে একদিন-না-একদিন ব্যক্তিমানুষের এই ধর্ম রাষ্ট্রেও প্রতিফলিত হবে। কারণ, "ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকেরা বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনিই চলছে। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন, কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যেসকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে।"[৪] এইজন্যই জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনার সমীকরণ চাই, ব্যক্তিক জীবনেও, রাষ্ট্রের জীবনেও। তারই পূর্ণতম আদর্শের মহত্তম সাধনাই স্বরাজসাধনা। এই পথেই আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তা না হলে সত্যের আবির্ভাবের যে অন্য পথ তা কুটিল, ভয়াল এবং রক্তপিচ্ছিল।

---

৩ কালান্তর: স্বরাজসাধনা।

৪ কালান্তর: চরকা।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঋষি, রবীন্দ্রনাথ আচার্য। মহর্ষির পুত্র তিনি; আজন্ম ধর্মের আবহাওয়াতেই তাঁর জীবন পরিবর্ধিত। রামমোহন রায়ের সময় থেকে ধর্মের যে নবজাগরণ দেশে দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার মূল গভীরভাবে নিহিত ধর্মের মধ্যে। সে ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে ঠিকভাবে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু যে ধর্মের তিনি সাধক ও উদ্‌গাতা, যে ধর্মের ভিত্তির উপরে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, সে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তো একেবারেই অসম্ভব। এ স্থলে আমরা রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মের বিশেষ একটি দিকের একটুখানি পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হব।

১

সব মানুষেরই একটি জন্মগত ধর্ম থাকে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস স্বাধীন বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী নয়, জন্মলব্ধ ধর্মেরই অনুযায়ী। সে ধর্ম আবার গোষ্ঠী- বা সম্প্রদায়- গত। তাই দেখি পৃথিবীর সব মানুষই বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ইসলাম, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি কোনো-না-কোনো সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ ধর্ম ব্রাহ্মধর্ম; আদি-ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। দীর্ঘকাল তিনি উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের গুণকীর্তন এবং পক্ষসমর্থন করেছেন; আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কর্তব্যভারও বহন করেছেন অনেক কাল। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকবার মতো মন নিয়ে তিনি জন্মান নি। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই (১৮৯৭) যিনি বলেছিলেন—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর,
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?"

তাঁর মুক্তিকামী চিত্ত যে দীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সীমায় বন্দী থাকতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০)। এই গ্রন্থের মূলকথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার একেবারে শেষ অধ্যায়ে গোরার দু-একটি উক্তিতে—

"আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।··আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,··যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।"

—'গোরা'। অধ্যায় ৭৬

দেখা যাচ্ছে 'গোরা' রচনার কালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মবোধকে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।—

"রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্মও আজ তেমনি নিরর্থক।··গণ্ডিমাত্রই তাঁর কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী। গণ্ডি— যতই মোহন নামে মানুষের কাছে আসুক, দেশের নামে, ধর্মের নামে— কবির মনে তাহা সায় পায় না। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে বাস করিয়া এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন খাঁচা যতই সুন্দর হোক, আকাশ সুন্দরতর।··রবীন্দ্রনাথ গোরা, সুচরিতা ও পরেশবাবুকে যেখানে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা মানুষের ধর্মের উদার ক্ষেত্র— সেখানে তাহারা হিন্দুও নহে, ব্রাহ্মও নহে, খ্রীস্টানও নহে— তাহারা মানুষ।" —'রবীন্দ্রজীবনী'। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১৮

'গোরা' প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই 'গীতাঞ্জলি'র বিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতাটি রচিত হয় (১৯১০ জুলাই ২)। এই রচনাটিতেও স্বভাবতই অসাম্প্রদায়িক সবজনীন ধর্মের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাতে ভারতবর্ষকে কোনো বিশেষ জাতি ও বিশেষ ধর্মের লীলাভূমিরূপে দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে সর্বমানবের মিলনতীর্থরূপে। সে মিলন আজও পূর্ণ হয় নি, সর্বমানবের সমবেত স্পর্শে সে মিলনের পবিত্রতা আজও সার্থক হয়ে ওঠে নি। তাই তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন ওই বিশ্বজনীন উদারতার অভিমুখে।—

"এস হে আর্য, এস অনার্য,
হিন্দু-মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীস্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥"

এই সর্বসাম্প্রদায়িক উদারতার আদর্শই দেখা যায় তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতটিতেও (রচনাকাল ১৯১১ সালের শেষাংশ)। তাতে তিনি সেই ভারতবিধাতারই জয়গান করেছেন, যাঁর আহ্বান শুনে হিন্দু বৌদ্ধ

শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়েরই জনগণ এক উদার ঐক্যভূমিতে মিলিত হয়েছে। সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ঐক্যের এই যে আদর্শ, সে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনো-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। গীতাঞ্জলি (১৯১০) রচনার সময় থেকেই সে আদর্শের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে কথা একটু পরেই দৃষ্টান্তযোগে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করব। তার আগে উক্ত আদর্শের স্বরূপটিই একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি রচনার কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন (১৯১২ মে ২৪)। সঙ্গে নিয়ে যান ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি। বিলাতে যেসব মনস্বী ওই পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালেই 'বিলাতের চিঠি' নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (প্রবাসী, ১৩১৯ কার্তিক)। তার থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি।—

"তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খ্রীস্টান ধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্‌, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের মন যখনই আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এদেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে [গীতাঞ্জলির] কোনো ধর্মের কোনো creedএর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি'।" —স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক। 'পথের সঞ্চয়'

গীতাঞ্জলির এই যে creed বা বীজমন্ত্রের লেশমাত্রহীন ধর্মের আদর্শ, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা। আধুনিক কালে শিক্ষিত মনেরই এটা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত মনের প্রবর্তনাই তাঁকে স্বভাবত এই পথে চালিত করেছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যে অচিরকালের মধ্যেই সচেতনতা লাভ করেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। 'বিলাতের চিঠি' প্রবন্ধ প্রকাশের পরের বৎসরই (১৯১৩) দেখি 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি বীজমন্ত্রের গণ্ডিভাঙা অসাম্প্রদায়িক ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন সাতই পৌষের (১৩২০) উৎসব উপলক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে আবার তাঁর মনে উদিত হয়েছে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তি। সেই উক্তিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করে তিনি যা বলেছেন তা বিশেষরূপে স্মরণীয়।—

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা [গীতাঞ্জলির] জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খ্রীস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয়, তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না।· ·

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন; বললেন, 'তোমরা খুব বেঁচে গেছ'। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, সে বড়ো বিপদ্‌। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশ-কালের ছাপ নেই— তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম দেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

"পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য খ্রীস্টান অত্যন্ত খ্রীস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সব রকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে উপভোগ করবে এইটি হয়ে উঠেছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, সেইসব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিম দেশের যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকও একজন। খ্রীস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি।"

—অগ্রসর হওয়ার আহ্বান। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথও নিজের সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পেয়েছেন এবং সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ সার্বভৌমিক মূর্তিতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম যেখানে সংকীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাকে মানেন নি। তিনি অনুভব করেছিলেন, "ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে"। রামমোহন রায়ের সময়ে বাংলা দেশে যে ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের সূত্রপাত হয় তার পূর্ণ পরিণতি ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এইখানে। আমার মনে হয় বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষেরই ধর্মচিন্তার ইতিহাসে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

২

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-আদর্শের দুই দিক। এক দিকে সর্বপ্রকার সংস্কার-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্ররোষ, সেখানে বিনাশের শক্তিমন্ত্রই তাঁর বাণী। আর-এক দিকে উদার বিশ্বজনীনতার দিকে তাঁর প্রসন্ন চিত্তের আকর্ষণ, এখানে সৃষ্টির আনন্দবাণীই তাঁর আশ্রয়।

দেশ- কাল- ও-সম্প্রদায় -গত সংস্কার ও সংকীর্ণতাকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন ও তার বিলয় কিভাবে কামনা করতেন তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করি।—

"আমাদের ধর্মকে যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে।· ·

"একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি— অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।· ·

"যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মানুষকে চাপিয়া ধরে, মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া দিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়।"

—ধর্মের নবযুগ (১৯১২)। 'সঞ্চয়'

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় (ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন), তখনও রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন নি, স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গেও দেখা হয় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধর্মের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা তখনই কেমন কঠোর হয়ে উঠেছিল। এই যে সংস্কারগত সংকীর্ণতা, তার প্রতিকারের বাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন নির্মমচিত্তেই।

"মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে তুলেছে।· ·ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

"এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন ঝড় হয়। তবে মুক্তি।"

—অমৃতের পুত্র (১৯১৫)। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

এই যে সংস্কারের প্রাচীরের উপরে ঈশ্বরের বজ্রাঘাতের কথা, ধর্মগত মোহের সংকীর্ণতার উপরে ভগবানের অভিসম্পাতের কথা, তা রবীন্দ্রনাথের বাণীতে বারবারই দেখা দিয়েছে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। সম্প্রদায়গত ধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি বলেছেন ধর্মমোহ। এই ধর্মমোহ মানুষের যত ক্ষতি

করেছে এবং করছে এমন আর কিছুই নয়। যত সত্বর এই মোহের বিনাশ ঘটে ততই কল্যাণ। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই।—

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে;
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে.
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে;
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি'
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

—ধর্মমোহ (১৯২৬)। 'পরিশেষ'

যে পানীয় মানুষের জীবনকে রক্ষা করে সে যখন বিষাক্ত হয় তখন তার চেয়ে ভয়ানক আর কিছু নেই। যে ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, সমাজকে রক্ষা করে, সে যখন সংকীর্ণ হয় বিকৃত হয় তখন তার মতো কারাগার তার মতো বন্ধন আর হয় না। এইজন্যই সংকীর্ণ ধর্ম, বিকৃত ধর্ম তথা মোহগ্রস্ত ধর্মাদর্শের উপরে রবীন্দ্রনাথ এমন খড়্গহস্ত। তার চেয়ে নাস্তিকতাও ভালো। কেননা, নাস্তিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জ্বলই করে, আচ্ছন্ন করে না, মানুষের কল্যাণবোধকেই জাগ্রত করে, বিরোধকে উদ্যত করে না। সংকীর্ণ ধর্মের চেয়ে যে নাস্তিকতাও ভালো, তা তিনি একবার রোমাঁ রোলাঁকেও বলেছিলেন কথাপ্রসঙ্গে।—

"So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept facts of life.·· It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible.

As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of *a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion.* Even a vogue of atheism may do good to India today. It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people."

—*Rolland and Tagore* (1945), পৃ ১০০-১০১

নিষ্প্রাণ নিষ্ক্রিয় অপধর্মের প্রতি সজীব সৃষ্টিশীল ধর্মের যে কল্যাণকর অসহিষ্ণুতার কথাগুলি আমরা বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম, তার স্পষ্ট পরিচয়ই পেয়েছি পূর্বোদ্ধৃত কয়েকটি অভিমতের মধ্যে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অপধর্ম বা ধর্মগত সংকীর্ণতার প্রতি একটা তীব্র অসহিষ্ণুতা পাবকশিখার মতোই নিত্য দীপ্যমান ছিল, তার উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ কোনোটাই কম ছিল না। সেই উত্তপ্ত অসহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে। শ্যামলী গৃহে কথায় কথায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠল। সে আলোচনার পূর্ণপরিচয় দেওয়া এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। উভয় সম্প্রদায়েরই গোঁড়ামি ও অন্ধতার কথা বলতে বলতে তাঁর মুখে চোখে যে উত্তেজনার আভা ফুটে উঠল তা আজও ভুলতে পারি নি। উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, আমার ইচ্ছা হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত নাস্তিকতার একটা প্রচণ্ড বন্যা বয়ে যাক, ধর্মের যত কুসংস্কার যত আবর্জনা সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক, বন্যার শেষে পলিমাটির উর্বরতায় দেশ আবার ফলে-শস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তা না হলে দেশে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার আর কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি। তখনও *Rolland and Tagore* গ্রন্থ তথা রোলাঁ-ঠাকুর-সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। পরে দেখলাম, আমাকে যা বলেছিলেন তাতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। যা হোক, এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যাবে ধর্মসংকীর্ণতার প্রতি তাঁর মনোভাব কত কঠোর ছিল এবং কতখানি আন্তরিকতা নিয়ে তিনি তাঁর ঐকান্তিক বিলয় কামনা করতেন। এই বিলয়ের কামনা থেকেই তিনি বারবার বিধাতার নির্দয়তা, তাঁর রুদ্ররোষ, তাঁর বজ্রাঘাতকেও প্রার্থনা করেছেন। ওই আঘাত ও বিনাশের পরেই আসবে নবতর মহত্তর সৃষ্টির সুযোগ।

৩

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।" —'নৈবেদ্য', ৭২

এই বাণীর মধ্যে এক দিকে আছে ভাঙার কথা, অপর দিকে আছে গড়ার কথা। ভাঙার দিকটা, যার মূলে আছে তাঁর মহৎ অসহিষ্ণুতার প্রেরণা, সে দিকটার কথা বিশদভাবেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবার গড়ার দিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন; উদ্ধৃত অংশটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ ধর্ম তাই যা বিচারহীন আচারের ঊষরতার দিকে জীবনকে চালনা করে না, পৌরুষকে খণ্ডিত করে না, যা নিত্যই কর্ম চিন্তা ও আনন্দের দিকে প্রেরণা দান করে। পূর্বে দেখেছি সে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদ স্বীকার করে না, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যে প্রাচীরের ব্যবধান তাকে সে নিঃশেষে ভেঙে ফেলতে উদ্যত। কাজেই এই যে নবধর্ম-বোধ, চিরাগত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। এখানেও আছে মহৎ অসহিষ্ণুতার প্রেরণা।—

"আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন-একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।" —ধর্মের নবযুগ (১৯১২)। 'সঞ্চয়'

এখানেই রবীন্দ্রনাথের নবধর্মের স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। সে ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট কাল বা সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নয়, তা সর্বকালের এবং সর্বমানবের সম্পদ্; তা কোনো শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত নয়; মানুষের স্বাধীন বিচার ও মুক্ত জ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ থাকবে না, জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলার শক্তি তার থাকবে; চিন্তা কর্ম ও হৃদয়বোধ জীবনের সর্ববিভাগের মধ্যেই সে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। এই সামঞ্জস্যরক্ষাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের প্রধান কথা। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য। ধর্ম হবে জ্ঞান- ও সত্য- নিষ্ঠ; যথার্থ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে ধর্মজীবনকে সত্যপথের নির্দেশ দিতে পারে না। কিন্তু নিছক জ্ঞানের মধ্যে প্রেমের বা কর্মের প্রেরণা থাকে না। প্রেমই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রেরণা দান করে। কিন্তু জ্ঞান- ও কর্ম- হীন প্রেম নিষ্ফল ভাববিলাসিতায় পর্যবসিত হয়। আর প্রেমহীন কর্ম মানুষকে চালনা করে হিংস্রতার পথে এবং জ্ঞানহীন কর্ম তাকে নামায় পশুত্বের স্তরে। আমাদের চিরাগত ধর্মসমূহ এই সামঞ্জস্যের অভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নানা সংস্কারের বিকার তো ঘটেছেই, তা ছাড়া যথানুপাতিক সামঞ্জস্যের অভাবেও প্রেরণাশক্তি হারিয়েছে। উপনিষদের ধর্মে জ্ঞান ও সত্যের উজ্জ্বলতা আজও জগতের বিস্ময়স্থল; অবশ্য তাকেও আধুনিক জ্ঞানের উপযোগী করে নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাতে প্রেমের প্রেরণা ও কর্মের নির্দেশ খুবই দুর্বল। তাই তা নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের স্থান উচ্চে, তাতে মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও দুর্বল নয়। তারই ফলে বৌদ্ধধর্ম একদা বিশ্ববিজয়ে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তার জ্ঞানের দিক অবাস্তবতার পথে অগ্রসর হয়ে ওই ধর্মকেই নিষ্ফলতার মধ্যে ঠেলে দিল। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের স্থান উচ্চে, জ্ঞানের প্রেরণা দুর্বল। তাই ভাববিলাস ও রসবিকারের মধ্যেই তার অবসান। খ্রীস্টান ধর্মে মৈত্রী করুণা প্রভৃতি হৃদয়বোধের উৎকর্ষ ঘটেছিল খুবই; তাতে এককালে বহু মানুষকেই এক করেছিল। কিন্তু তাতে জ্ঞানের প্রভাব বড়ই ক্ষীণ। তাই আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে স্বীকৃতি পায় না; ফলে খ্রীস্টান ধর্মের মহত্ত্বের দিকটাও আজ অবজ্ঞাত। তাই খ্রীস্টান

সম্প্রদায়ের লোকেরাই আজ বিশ্বজগৎকে টানছে বিনাশের দিকে। প্রাচীন ধর্মগুলির এই অপূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষ ভাবেই পীড়া দিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার স্থান নেই এ প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী করুণা, এবং বৈষ্ণব ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের উপাসিত ধর্মও এসবের পরম বিরোধী। কেননা এগুলির দ্বারাই মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ সৃষ্টি হয়। শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক নামগুলিও ওই ভেদসৃষ্টির পরম সহায়ক। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, গড আল্লা বিষ্ণু শিব এবং ব্রহ্মা কখনো এক নন; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ সৃষ্টির মূলে রয়েছে সম্প্রদায়ের ট্রেড-মার্ক-দেওয়া এই নামগুলি। বিভিন্ন ধর্মের ক্রীড, কলমা বা বীজ-মন্ত্রগুলির প্রভাবও কম নয় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদসৃষ্টির পক্ষে। এ প্রসঙ্গে উপাসনা-গৃহের অর্থাৎ গির্জা মসজিদ এবং মন্দিরের পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মে এসবেরও কোনো স্থান নেই। ক্রীড বা বীজমন্ত্র হীনতার কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। ঈশ্বরের বিশেষ নামহীনতাও উক্ত ধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আর, বিশেষ ধরনের উপাসনাগৃহ যে এ ধর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় এ কথাও সকলেরই জানা। ফলে সব সম্প্রদায়ের লোকই এই ধর্মের আশ্রয়ে অনায়াসেই এক হয়ে মিলতে পারে। যেমন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে"

"অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে"

"আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ
সংসার-কাজে"

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করতে পারি জয়"

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো"

ইত্যাদি প্রার্থনা-সংগীতগুলি কোন্ সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে অগেয় বা অশ্রাব্য? তাতে কোনো সম্প্রদায়ের চিহ্নমারা দেবতার নামও নেই। কোথাও শুধু তুমি, কোথাও অন্তরতর, অন্তর্যামী, নাথ, প্রভু, জীবনস্বামী ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক বা সর্বসাম্প্রদায়িক সম্বোধন মাত্র আছে। এই প্রার্থনার জন্য কোনো বিশেষ উপাসনাগৃহও নিষ্প্রয়োজন; ধর্মের এই উদারক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের লোকই অনায়াসে মিলতে পারে। সর্বপ্রকার

বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট ক্রীড, নাম বা উপাসনাগৃহের ব্যবধান এক্ষেত্রে একেবারেই নেই। সর্বধর্মের এমন উদার মিলনক্ষেত্র আর কোথায় আছে জানি না। অথচ এ ধর্ম আধুনিক কালের জ্ঞান এবং শিক্ষারও বিরোধী নয়; ভাব ও রসের অথবা প্রেমভক্তির অপ্রতুলও নেই; আর কল্যাণকর্মের প্রেরণা তো রয়েছে প্রচুর পরিমাণেই। কোনো মন্ত্রতন্ত্র বা আচার-অনুষ্ঠানও এর পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। সংস্কারহীন দৃষ্টিতে দেখলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈদিক ঋক্‌মন্ত্র বা সাম-সংগীত কিংবা খ্রীস্টানি psalm বা hymn কোনো কিছুই ভাবের গভীরতা, রসের উৎকর্ষ বা প্রেরণার মহত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। বস্তুত মন্ত্রের গাম্ভীর্য বা পবিত্রতার বিচারেও এই গানগুলি অতুলনীয়। সর্বপ্রকার মন্ত্রাদি বর্জন করে একমাত্র এই গানগুলির সাহায্যেই সব রকম মঙ্গলকার্যই অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাতে ওসব কার্যের পবিত্রতা বেড়ে যাবে বলেই মনে করি। এই গানগুলির আশ্রয় নিলে সর্ববিধ ধর্মকার্যেই সাম্প্রদায়িক মন্ত্রতন্ত্র ও বিশেষ অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে নির্বিশেষ মানুষের উদার মিলনক্ষেত্র রচিত হতে পারে।

৪

এ অভিমত যে একা আমারই তা নয়। আধুনিক যুগের উদার শিক্ষা ও উন্নত মনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকারী বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অভিমত উদ্‌ধৃত করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম উৎকর্ষ পাওয়া যায় কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে বিনয়কুমার সরকার বলছেন (১৯৪২ সালে)—

"··সে হচ্ছে ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কল্পনা। মানুষের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ রবীন্দ্রসাহিত্যে যারপরনাই ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে কল্পিত হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, যে-কোনো দলের লোক এইরূপ ভগবান্ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান্ সমঝিতে সমর্থ। রাবীন্দ্রিক ভগবৎ-সাহিত্যের মুদ্দাটা দেখবি? 'প্রতিদিন আমি, হে জীবন-স্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে'—এই গানটা শুনেছিস বোধ হয়। রাবীন্দ্রিক ভগবান্ আগাগোড়া এই সুরে গড়া।

"··সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্রচিত্তে ঠাঁই পেয়েছে। তবুও বলছি, উপনিষদের মন্তরগুলায় যে ভগবান্ পাওয়া যায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিক ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই রৈবিক ভগবান্ সরস, আত্মীয় ও মানুষময় বেশী। অপর দিকে বৈষ্ণব ভক্তি-সাহিত্যের ভগবান্ রাবীন্দ্রিক ভগবানের মতনই বস্তুপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বময়। কিন্তু বৈষ্ণব ভগবান্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভগবানের সমান সর্বজনীন ও সনাতন নন।

"দুনিয়ার নানা দেশের সংস্কারগুলা, রীতিনীতিগুলা আর লোকাচারগুলা ভুলে যা। দেখবি, রবীন্দ্রসৃষ্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কার্যোপযোগী, মানুষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্ আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। প্রথম ভাগ, পৃ ৫৮

এই শেষের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুনিয়ার নানা দেশের ও সম্প্রদায়ের সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি তথা তাদের ভগবৎ-নাম, ধর্মের ক্রীড, ডগমা প্রভৃতি বাদ দিয়ে যে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় তিনি তো সর্বসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক বা অতি-সাম্প্রদায়িক; তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন;

তাঁর উপাসনায় সব ধর্মের লোকই অসংকোচে একত্র মিলিত হতে পারে বিশ্বজনীনতার উদার ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে সংঘ ও সংহতির সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সধর্মীর সঙ্গে মিলনের প্রয়োজনে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে হয়। রবীন্দ্রস্বীকৃত ভগবানের উপাসনায় ধর্মের ক্ষেত্রে সবাই একত্র মিলতে পারে, অথচ সকলেরই ব্যক্তিত্ব শুধু অক্ষুণ্ণ থাকে না, বরং উজ্জ্বলতর হয়েই ওঠে। যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে যে বিশ্বজনীনতা নিহিত থাকে তারই চিরন্তন ভিত্তির উপরেই রবীন্দ্রধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই এখানেই রচিত হয়েছে বিশ্বধর্মের মিলনভূমি। রবীন্দ্রনাথের মতো এই বিশ্বজনীন মিলনের প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা। ওই প্রেরণাই চিরকাল ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, তাকে নিত্যবিবর্তনের দিকে চালনা করেছে। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের আন্তরিক মিলনের মধ্যেই সে প্রেরণার চরম সার্থকতা। রবীন্দ্রধর্ম সে উদ্দেশ্যসাধনের সেই চরম সার্থকতারই আদর্শস্থল। এ বিষয়েও বিনয়কুমার সরকারের অভিমত (১৯৪২) শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণীয়।—

"উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন—বিশেষভাবে আত্মিক সমঝৌতা—অনিবার্য।··যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে।··হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবশ্যম্ভাবী।··আমার বিশ্বাস, আমাদের এখনকার আবহাওয়াতেই হিন্দু-মুসলমানের সমবেত বা যৌথ ধর্মের কাঠাম কাজ করছে। সমসাময়িক বঙ্গসংস্কৃতি আর বঙ্গসমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চলছে।··আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়। এসব হচ্ছে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র। এসবকে আমি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভগবদ্‌গীতা সমঝে থাকি। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্মোপদেশসমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এইসবের ভেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবান্‌রূপে পূজা করবে।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। প্রথম ভাগ, পৃ ৪৪৩-৪৫

৫

রবীন্দ্রনাথ সর্বসম্প্রদায়ের 'যৌথ ভগবদ্‌গীতা' রচনা করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর মধ্যে ছিল সর্বসম্প্রদায়ের 'যৌথধর্মের' প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই প্রেরণা ভারতবর্ষেরই চিরন্তন প্রেরণা। এই প্রেরণার ক্রিয়া দেখি প্রাচীন কালের ভগভদ্‌গীতায় এবং মধ্যযুগের কবীর নানক প্রভৃতি সাধকদের ভজনগুলিতে। গীতায় আছে ভারতীয় শাখা-ধর্মগুলির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা, আর ওই ভজনগুলিতে দেখা যায় ভারতীয় এবং অভারতীয়, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় প্রয়াসটি কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস এবং সে প্রয়াস মধ্যযুগে পুরোপুরিভাবে সফল হয় নি; যদিও তৎকালীন সাধকদের প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে সার্থকতা লাভের পথনির্দেশ। তাই আজও আমরা সেই পরীক্ষারই সম্মুখীন রয়েছি। বর্তমান কালে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই সাধনার পথে

আমাদের চালনা করেছেন রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের এই ধর্মসাধনার কথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। মধ্যযুগের সেই মিলনসাধনা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ এই।—

"ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্য সাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

"মুসলমান-ধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

"এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমান-অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমান-ধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

"সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ্ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

"ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান-ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন-একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই-জন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।"

—ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা (১৯১১)। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

নানক কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকদের সমন্বয়-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কত গভীর তা সুবিদিত। তিনি তাঁদের রচনা নিয়ে নানা স্থানে নানা উপলক্ষ্যে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করব।—

"দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যূষের অতন্দ্রিত পাখি, পেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। সেই

মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ।· ·তিনি বলেছেন,

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব,· ·এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ঁ, গুরু সূঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু-মুসলমান মিলে যায়।

"এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।· · ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তাহলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খ্রীস্টান—

সাধন মাহিঁ জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তাহলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে।"

—ভারতপথিক রামমোহন (১৯৩২)। 'চারিত্রপূজা'

কবীর-দাদূ-রজ্জব-রামমোহনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভারতপথেরই পথিক। ওই পথের তিনিই শেষ পথিক এবং শ্রেষ্ঠ পথিক। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলকে এক অসাম্প্রদায়িক বা অতিসাম্প্রদায়িক ধর্মভূমিতে মিলিত করাই ছিল তাঁর ভারতপথ-সাধনার চরম লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামমোহনের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, "রামমোহন রায় ভারতপথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক— যেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে, "আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন" সেই রামমোহনের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই তিনি 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে' ইত্যাদি বিখ্যাত 'ভারতপথের গান'টি রচনা করেছিলেন।

এ কথা সুবিদিত যে, রামমোহনের মধ্যে যে বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার উদ্‌বোধন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই পরিণতি ও পরিসমাপ্তি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামমোহনের জীবন-সাধনার তাৎপর্য অনুধাবন করলে তাঁরই জীবন সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চরম উক্তি এই।—

"তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"

—ভারতপথিক রামমোহন (১৯৩২)। 'চারিত্রপূজা'

এই উক্তি রামমোহন সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য, তার চেয়ে অধিকতর প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন সম্বন্ধে। তিনি সংস্কৃতি- ও ধর্ম- সাধনার যে প্রশস্ত পথ রচনা করেছেন, অনতিদূর ভবিষ্যতে সে পথে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-নির্বিশেষে সব মানুষই অবিরোধে চলতে শুরু করবে, এই মর্মে বিনয়কুমার সরকারের উক্তি পূর্বেই উদ্‌ধৃত হয়েছে।

৬

অতঃপর ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মসমন্বয়-সাধনার নীতি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ-নিরসনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের প্রয়াস এক ধরনের নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এঁদের প্রয়াস প্রধানত দুই পর্যায়ভুক্ত। এক পর্যায়ে আছে ধর্মনীতি, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বাহ্য সংঘটনের প্রয়াস; ইংরেজিতে যাকে বলে eclecticism, এ প্রয়াস মূলত তাই। এ প্রসঙ্গে আকবর (দীন-ইলাহি), রামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে মনে পড়ে। এ মতের প্রধান কথা— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১), 'যত মত তত পথ' (রামকৃষ্ণ)—যে যেভাবেই সাধনা করুক তাতেই তার মুক্তি। এ হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা সহিষ্ণুতার দ্বারা সকলের একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা। এ মতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম · ·
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম;
সবকো সন্মতি দে ভগবান্।

ভগবদ্‌দত্ত 'সন্মতি' অর্থাৎ সর্বমত-সহিষ্ণুতার উপরেই এর ভরসা। এ মিলন বাহ্যমিলন; পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুকেও নির্বিরোধে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর আদর্শ। নানা ধর্মের নানা শাস্ত্র (গীতা-কোরান-বাইবেল), ও আচার, ভগবানের বিভিন্ন নাম (গড-আল্লা) প্রভৃতি সবকিছুকে মেনে নেওয়ার উপরই এর আশ্রয়। এর মূলে কোনো নিত্যসত্যের দৃঢ় ভূমি নেই। সুতরাং এ মিলনের স্থায়িত্বও সুনিশ্চিত নয়।

দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য বাহ্য সমাবেশ বা অবিরোধমাত্র নয়, অন্তরের মিলন। এই পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক। অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পরে মধ্যযুগে কবীর নানক দাদূ প্রভৃতি এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক যুগের আরম্ভে রামমোহন এবং অন্তে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবকেই এই পথের আহ্বান জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য এক দিকে বিশ্ববোধ এবং অপর দিকে চিরন্তনতা-বোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন ও খণ্ডদেশিক তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা চিরজাগ্রত। 'নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি'র প্রতি তাঁরা সদা খড়্গহস্ত। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণে তাঁরা অক্লান্ত। বিশ্বমানবের অন্তরে যে অখণ্ড নিত্যসত্যের বোধ নিহিত আছে, একমাত্র তাকেই তাঁরা সত্যধর্মের আশ্রয় বলে স্বীকার করেন। যেসমস্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি এই নিত্যসত্যকে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন করে, তাঁরা সেগুলির অপসারণেই বদ্ধপরিকর।

বলেছি ধর্মসমন্বয়ের এই আদর্শের মূলে আছে বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধ সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে অতীত কালে অশোকের মধ্যে এবং আধুনিক কালে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এই ঐতিহাসিক সত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধর্মের আচারাদি বাহ্যলক্ষণের প্রতি এঁদের বিরূপতা কতখানি তাও জানা কথা। অশোকের নবম গিরিলিপি থেকে জানা যায়, তিনি স্ত্রী-আচার লোকাচার প্রভৃতি অসংখ্য নিরর্থক অনুষ্ঠানের প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন। পুত্র-কন্যার বিবাহ, শিশুর জন্ম, রোগাক্রমণ, প্রবাসযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে বহুবিধ নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান ('মঙ্গলম্') তৎকালে প্রচলিত ছিল, অশোকের কণ্ঠে তার প্রতিবাদ কঠোর ভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে মূর্তিপূজা সতীদাহ প্রভৃতি বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রতিবাদের কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। মধ্যযুগের সাধকদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।

মন্দিরে মসজিদেই ভগবানের সত্য পথ আচ্ছন্ন হয়েছে। তাঁরা সেকালেও সাহস করে বলতে পেরেছিলেন— ভগবান্ মন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই, কাবাতেও নেই, কৈলাসেও নেই; ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনাতেও তাঁকে পাওয়া যায় না; কোরান-পুরাণও কথার সমষ্টি মাত্র; ভগবান্ আছেন প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তস্তলে।

এই বাহ্যবিমুখতা ও অন্তর্মুখীনতা এই ভারতপথিকদের চালনা করেছে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত সারসত্যের প্রতি। দ্বাদশ গিরিলিপিতে অশোক তাঁর ধর্মনীতি অতি স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, সব সম্প্রদায়কেই তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এই শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন না; তাঁর মতে সর্বধর্মের 'সারবৃদ্ধি'সাধনের ন্যায় আর কিছুই নয়। সর্বধর্মের অন্তরে যে নিত্যবস্তু বা শাশ্বত সত্য ('পোরানা পকিতি') রয়েছে তাকেই তিনি বলেছেন ধর্মের সার, এবং সারধর্মের পোষণ ও প্রসারকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সত্যনিষ্ঠা, অন্তরের শুচিতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি সর্বধর্মস্বীকৃত চিরকালের ধর্মকেই তিনি 'সার' বলে অভিহিত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অশোক-স্বীকৃত ধর্মে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই নেই। মানুষ এবং সর্বজীবের কল্যাণ-সাধনই সে ধর্মের লক্ষ্য। মধ্যযুগের রামানন্দ থেকে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতপথিকদের ধর্মে ভগবানের স্থান উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, অন্তরের শুচিতা এবং সব মানুষের ঐক্যবোধ ও কল্যাণচেষ্টাই ওই ধর্মের মূল কথা, এই ঐক্যবোধ ও কল্যাণব্রতের অবলম্বন হিসাবেই ভগবানের সাধনা। আরও লক্ষণীয় এই যে, রামানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যতই আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আসা যায় ততই দেখা যায় তাঁদের ধর্মে মানুষের গৌরব ক্রমেই বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি সে ধর্ম 'মানুষের ধর্ম' নামেই অভিহিত হয়েছে; মানুষের মধ্যে ভগবানের যে প্রকাশ তার সাধনাতেই এ ধর্মের সার্থকতা। মানুষের জীবন- ও কল্যাণ- নিরপেক্ষ ভগবানের আরাধনা এ ধর্মে অস্বীকৃত। একটু বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে—বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, সংস্কৃত স্তোত্র-গান প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান এ ধর্মের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অনেক সময় তার অন্তরায়ও বটে। এই যে ক্রীড-হীন, শাস্ত্রহীন, আচার-অনুষ্ঠান-হীন, ভগবানের নামরূপ হীন, ব্রাত্যধর্ম যার পরিচয় 'মানুষের ধর্ম' ব'লে, যার লীলা

ও প্রকাশ সর্ব মানবের জীবনে, এই ধর্মই হবে আমাদের ভাবীকালের সার্বভৌমিক ধর্ম। সে ধর্মের মর্ম ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে।—

১

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না-যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥

২

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
অন্ধকারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস,
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে।
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন 'পরে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

ওড়িয়া কবি রাধানাথ ও মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি রাধানাথ রায় তাঁহার কাব্যরচনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচিত মহাযাত্রা বিশেষ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ওড়িয়া সাহিত্যসেবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মহাযাত্রা ভারতের মহাপ্রস্থানপ্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া ভারতের দুর্গতি ও উড়িষ্যার বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় সার্থক হইয়াছে, রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেদারগৌরী, চন্দ্রভাগা, নন্দিকেশ্বরী, উষা ও পার্বতী, এবং কাব্য পঞ্চক ইতিহাস বা স্থানীয় কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়া রোমান্টিক ভাব নানাপ্রকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র শেলী বায়রন, এইসব ইংরেজ কবির প্রভাব তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার চিলিকা কাব্যে সৌন্দর্যপ্রেমী পাঠক চিল্কা হ্রদের কাব্যময়ী প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার দরবার নামক কাব্য ব্যঙ্গ-রচনায় তাঁহার চাতুর্য প্রমাণ করিয়াছে।

রাধানাথ দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করিয়াছেন। তিনি শুধু পাশ্চাত্য ভাবধারাই গ্রহণ করেন নাই, প্রাচ্য ভাবধারাও তাঁহার কাব্যরচনার মূল্যবান উপাদান। মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কর্মজীবনে ও সাহিত্যজীবনে তিনি যে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান প্রবন্ধে কিছু বিবৃত করিতেছি। এই পুরাতন কাহিনী তখনকার দিনে ভূদেববাবুর পরলোকগমনের পর রাধানাথ সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীযুত দুর্গাচরণ রায় প্রণীত রাধানাথ-জীবনীতে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ভূদেবাবুর উড়িষ্যায় শুভাগমন রাধানাথ তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ভূদেবাবু স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর হইয়া উড়িষ্যার স্কুল-পরিদর্শনের জন্য কটকে আসেন। তখন তাঁহার সর্বত্র প্রতিপত্তি। স্যার এস্‌লি ইডেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে লিখিয়াছিলেন— ইউরোপীয়দের উচ্চতর গুণাবলীর অনেকগুলি ভূদেবের আছে। তাঁহার দেশবাসীর স্বাভাবিক ত্রুটি খুব অল্পই তাঁহার স্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি আমাদের সিভিলিয়ানদের মধ্যে অর্ধেকও তাঁহার মত বিচারশীল কর্মী হইত! ভূদেববাবুর সহিত রাধানাথের এই প্রথম দেখা। ভূদেববাবু কটকে আসিয়া রাধানাথকে লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। যাওয়ার পথে বালিয়ন্তা চটিতে থাকিবার সময় কথাবার্তায় ভূদেববাবু বিরক্ত হইয়া গ্যয়টের কোনো গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষকতায় একটি বাক্য উদ্ধৃত করেন। রাধানাথ সেই বইখানি পড়িয়াছিলেন। তিনি ভূদেববাবুর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, আপনি যে-কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু এ-স্থলে তাহার প্রয়োগ ঠিক হইল না। ভূদেববাবু আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন।— তুমি কি বুঝিয়া আমার কথা সত্য বলিলে? তুমি কি গ্যয়টের নাম শুনিয়াছ? তাঁহার কোনো বইয়ের খবর রাখ কি?

— আজ্ঞে, আমি অবশ্য মূল বই পড়ি নাই, অনুবাদই পড়িয়াছি।

— অনুবাদের কথাই বলিতেছি। আমিই কি মূল বই পড়িয়াছি!

— আজ্ঞে, আমি সেই অনুবাদই পড়িয়াছি।

— তুমি এই বই পড়িয়াছ! গ্যয়টের আর কোনো বইয়ের নাম বলিতে পার?

রাধানাথের নিকট হইতে তাঁহার পড়িবার অভ্যাস জানিতে পারিয়া, ভূদেববাবু কোন্ কোন্ ভাষা তাঁহার জানা আছে এই প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার পরে তাঁহার নিকট হইতে জীবনের স্থূলবৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি প্রীত হইলেন। বালিয়ন্তা হইতে তাঁহারা ভুবনেশ্বরে গেলেন। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তি দেখিয়া ভূদেববাবু মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর যখন সেই স্থান হইতে সরদেইপুর চটিতে বিশ্রাম করেন তখন সেই প্রাচীন আর্যকীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকিল। রাধানাথকে তিনি সুর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক পড়িতে বলিলেন, রাধানাথ আবৃত্তি করিলেন—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥

তাঁহার মুখে মেঘদূতের শ্লোক শুনিয়া ভূদেবের বিশাল নেত্রদ্বয়ে অশ্রু বহিল, কোন্ এক অনির্বচনীয় ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আহা কি সাহিত্য, কি কীর্তি! আজ আমরা কি হইয়া গিয়াছি!

কথায় কথায় ওড়িয়া সাহিত্যের অগ্রণীদের নাম উঠিল। ভঞ্জ কবির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে তিনি রাধানাথকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। সরদেইপুর হইতে তাঁহারা পুরী গেলেন। পুরীতে কিছুকাল থাকিয়া আবার কটকে ফিরিলেন। রাধানাথ এই সময়ে যে কয়দিন তাঁহার সংসর্গে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সেই কয়দিন তিনি তাঁহার জীবনের উৎসবময় কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটু অবকাশ পাইলেই উভয়ে ইংরেজি সংস্কৃত ও ওড়িয়া সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। ইহার পর ভূদেববাবু উড়িষ্যায় আসিয়া দশ-পনের দিনের বেশি কখনও থাকিতেন না, কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে রাধানাথ তাঁহার নিকটে যতদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ততখানি শিক্ষালাভ এক বৎসরেও তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট ছিল। একবার তাঁহার নিকটে রাধানাথ কিরূপ ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছিলেন সে কথা রাধানাথ বলিয়াছেন। আলোচনার বিষয় ছিল সংস্কৃত সাহিত্য। কালিদাসের উপমা— উপমা কালিদাসস্য— সর্বকালে সাধুবাদ অর্জন করিয়া আসিয়াছে: সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাং।
নির্বাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ॥

ভূদেব মন্তব্য করিলেন— উপমাটি বড় সুন্দর, কিন্তু এই শ্লোকে কবির কোনো দোষ কি দেখিতে পাও না?

রাধানাথ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

ভূদেববাবু বলিলেন— তোমাকে এত স্থূলবুদ্ধি বলিয়া ভাবি নাই। তুমি শুধু অলংকার-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া চরিত্রসংগতি বিষয়ে একেবারে অন্ধ হইয়া আছ। দেখ নাই, কবি কোন্ জায়গায় সীতার মুখে হাসি দিয়াছেন? সূর্পণখার সেই নির্লজ্জ আচরণে সীতার মত অপ্রাকৃত সাধ্বী নায়িকার মুখে হাসি মানাইয়াছে

কি? এই জায়গায় তো তাঁহার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইবার কথা! মনস্বিনী নারী অন্য নারীর নির্লজ্জ আচরণে লজ্জিত হইয়া থাকে, হাসি দূরের কথা।

তাঁহার এই মন্তব্য শুনিয়া রাধানাথের চৈতন্য হইল। রাধানাথ আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন— কবি মাইকেল মধুসূদন এ জায়গায় শুধু সাবধান হইয়া লিখিয়াছিলেন—

স্মরিলে সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা,
তার কথা।

আমার দৃষ্টি সেইদিকে মোটেই যায় নাই।

ভূদেব বলিয়াছিলেন— চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রসংগতি রচনার প্রধান বিষয়। কালিদাসের মত জগৎপূজ্য কবিরও এক-এক জায়গায় পদস্খলন হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা! সাধারণ কবি অলংকারকেই কবিতার প্রধান অঙ্গ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কালিদাসের মত কবির পক্ষে এইরূপ ভুল অমার্জনীয়।

রাধানাথ এই প্রসঙ্গে ভবভূতির কথা তুলিলেন, বলিলেন—ভবভূতির বোধ হয় এইরূপ পদস্খলন কখনও হয় নাই?

ভূদেব সায় দিয়া বলিলেন—ঠিক। কালিদাস ভবভূতির অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি বেশি চিন্তাশীল ছিলেন এবং চরিত্রবিশ্লেষণে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিলেন।

ভূদেববাবু প্রশ্ন করিলেন—তোমার মতে পৃথিবীর কোন্ কবি চরিত্রচিত্রণে সর্বাপেক্ষা কৃতী?

রাধানাথ উত্তর করিলেন—আমার মতে হোমার শেক্সপীয়ার এবং ব্যাসদেব এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী।

ভূদেববাবু বলিলেন, ব্যাসদেবের নাম সকলের শেষে করিলে কেন? এ-বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে অন্য কোনো কবির তুলনাই হইতে পারে না। অন্যান্য কবিদের নায়ক-নায়িকা চিত্র মাত্র, ব্যাসের নায়ক-নায়িকা প্রতিমূর্তি। ব্যাসের নীচে হোমার।

এইরূপ কাব্যালোচনায় উভয়ের দিন কাটিত। কটকে ভূদেববাবু আসিলে স্থানীয় ওড়িয়া ও বাঙালি ভদ্রলোকেরা সভা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। ভূদেববাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রীত হইতেন। একবার রাধানাথ তাঁহাকে স্বরচিত বাংলা কাব্য পড়িতে দেন। কাব্যটি মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের আদর্শে লেখা। পত্রাবলীর নায়িকাদের মধ্যে একজন পৌরাণিক, একজন কাল্পনিক। পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ভূদেববাবু প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বলিলেন—পুরানো বিষয় লইয়া শক্তির ও শ্রমের অপব্যয় করিতেছ কেন? তোমার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া খুশি হইলাম, এডুকেশন গেজেটে ছাপাইয়া দিব; কিন্তু আমি আশা করি যে তুমি নূতন জিনিস গড়িবার চেষ্টা করিবে। দেখ, তুমি সুভদ্রার চিত্র আঁকিয়াছ, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিলেও ব্যাসদেবের সুভদ্রার চেয়ে বেশি সুন্দর করিতে পারিবে না। নূতন গড়িবার চেষ্টা কর। তোমার এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে যেটি নূতন সেইখানে আদিরসের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে যে মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। আদিরসের এইরূপ অবতারণা নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, সুতরাং বর্জনীয়। উড়িষ্যা অতি সুন্দর দেশ। এ দেশের মনোহর প্রকৃতি কবিতার সম্পূর্ণ উপযোগী। উড়িষ্যা বাস্তবিকই meet nurse for a poetic child। যে দিকেই চাহিবে নূতন গড়িবার যথেষ্ট উপাদান পাইবে।

ভূদেববাবু শুধু সাহিত্যের বিষয়েই রাধানাথকে উপদেশ দেন নাই। জীবনের অনেক ব্যাপারেই তাঁহার কথা শুধু রাধানাথের নয়, আমাদেরও স্মরণীয়। বালেশ্বরের পথে একদিন রাধানাথ অল্পাহারের

প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভূদেববাবু বলিলেন, আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। তুমি সকলকে নিজের মত মনে করিতেছ। এখন লোকে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, জীর্ণশক্তি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে প্রচুর আহার লাভ দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। লোকে অল্পাহারকে এখন ধন্য ধন্য করিয়া থাকে! প্রাচীন আর্য ঋষিরা তো অল্পাহারী ছিলেন না। তাঁহারা যেমন উপবাস করিতে পারিতেন তেমন খাইতেও পারিতেন। নতুবা তাঁহারা মহাভারত-রামায়ণের মত বিশাল কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। এখন আমাদের দেশের লোকেরা যেমন খাইতে পারে না তেমন বই লিখিতেও পারে না।

বালেশ্বরে তাঁহারা রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুরের অতিথি হইয়া তাঁহার বাগানবাড়িতে ছিলেন। একদিন রাত্রে রাধানাথ বাগানের একটা জায়গায় ভূদেববাবুর নিকটে বসিয়া একমনে তারকাখচিত আকাশ দেখিতেছিলেন। ভূদেববাবু তখন কিছু বলিলেন না। পরে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— দেখ, তুমি এত মন দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলে কেন? সর্বদা ওরূপ করা ভালো নয়। ইহাতে নিজে যে অকিঞ্চিৎকর সেই ভাব খুব পরিষ্কার হয়। নিজের অস্তিত্ব প্রায় লোপ হইয়া যায়, লোকে কর্মে উদাসীন হয়। বিরাটের ধ্যান যোগীর পক্ষেই শোভা পায়।

রাধানাথের কর্মপটুতা দেখিয়া ভূদেববাবু বালেশ্বর হইতে ফিরিয়া মন্তব্য করেন—I would further suggest the advisability of making Babu Radha Nath Rai independent Inspector of Orissa and raising his position by increasing his pay. I have now seen that he is quite capable of holding independent charge of a circle and fully endorse the opinion expressed of him by Messrs. Beames and Norman that he is excellently educated, very intelligent and altogether devoted to his duties।

এইরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও অধস্তন কর্মচারীর প্রতি উদারতা ইতিহাসে বিরল। যে বীমস সাহেবের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই সুপ্রসিদ্ধ জন্ বীমস সিভিলিয়ান হইয়া গুজরাটে আসেন, তাহার পর পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইয়া বাংলায় আসেন। তিনি ছয় বৎসর বালেশ্বরের কালেক্টর ছিলেন এবং ১৮৭৫ সালে *Comparative Grammar of Four Languages* নামক পুস্তক লেখেন। তিনি চৌদ্দটি ভাষায় কথাবার্তা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি উড়িষ্যার এবং ওড়িয়া ভাষার অনুরাগী ছিলেন। রাধানাথকে তাঁহার লেখা একাধিক পত্র রাধানাথজীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম-পরিচয়ের এক বৎসর পরে ভূদেববাবু পুনরায় উড়িষ্যায় আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দবাবু ছিলেন। রাধানাথকে লইয়া তাঁহারা কোণারক যাত্রা করেন। সমুদ্রের ধার দিয়া পথ। পূর্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সরো নামে এক প্রকাণ্ড হ্রদ। সমুদ্রতীরে তালপত্রের অবিরাম মর্মরধ্বনি, অসংখ্য হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। পথ হারাইয়া যাওয়ায় অনাবৃত বালুকার উপরে তাঁহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে হয়। ভূদেববাবু প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া সম্মুখে একজোড়া বাঘ দেখিতে পান। প্রকৃতির ক্রোড়ে ব্যাঘ্রকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে তিনি ইহার পূর্বে কখনও দেখে নাই। যাহা হউক, কোণারকের অতীতের স্মৃতিস্বরূপ ভগ্নাবশেষের সৌন্দর্য দেখিয়া ভূদেববাবুর চক্ষে জল দেখা গেল। বংশীনাদিনী এক স্ত্রীমূর্তির অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখিয়া ভূদেববাবু মুকুন্দবাবু এবং রাধানাথকে প্রশ্ন করিলেন— এই প্রতিমূর্তি দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা মনে পড়ে না কি?

তখন প্রচণ্ড রৌদ্র, সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত। দেউলের নিকটে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের সুন্দর নবগ্রহ মূর্তি দেখিয়া সকলে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন।

রাধানাথ ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ঐ মূর্তিটি দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা স্মরণ করিলেন। কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এই মন্দিরের গঠনকার্য গ্রীকরাই সম্পন্ন করিয়াছিল, আপনি নিশ্চয়ই এই মত দেখিয়াছেন।

ভূদেববাবু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলেন—এইরূপ মত আমি দেখিয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তাহার উপর আরও বলিতে চাই, কিছু জুড়িয়া দিতে চাই। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের কুমারসম্ভব-কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ যখনই অবকাশ মিলিত সাহিত্যের আলোচনায় দিন কাটিত, কোনোদিন বৃথা যায় নাই। ইহার পরে রাধানাথ রায় ভূদেববাবুর সঙ্গে পাটনা বীরভূম গয়া প্রভৃতি জেলায় বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গের আর উল্লেখ করেন নাই। কোণারক হইতে ফিরিবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি অতিথি হিসাবে কুড়ি-পঁচিশ দিন ভূদেববাবুর গৃহে ছিলেন। রাধানাথ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গৃহের মত গৃহ এবং তাঁহার মত গৃহস্থ প্রায় কোথাওই দেখেন নাই।

১৮৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখের রাধানাথের নিকট লিখিত ভূদেববাবুর এক পত্রে অনেক আলোচনা আছে। রাধানাথের কৃষ্ণার্জুন সম্বন্ধে ধারণার ভ্রান্তি দেখাইয়া ভূদেব বলিতেছেন—আমার মনে হয় না যে তুমি গীতা ও ভাগবত পড়িয়া এখনও ইংরেজি সাহিত্যের ও ইহুদি মনোভাবের পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।

প্রায় দেড় হাজার কথার সমষ্টি এই পত্রখানি ইংরাজিতে লেখা। এখানে বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। ১৮৮২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখের এক চিঠিতে জানিতে পাই যে তিনি পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় রাধানাথের সহধর্মিণীকে একখণ্ড বহি পাঠাইয়াছিলেন। নাম জানিতেন না বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন 'বাবু রাধানাথ রায়ের স্ত্রী'। এই পত্রের মধ্যেও আলোচনা আছে। তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। রাধানাথ পারিবারিক প্রবন্ধের লেখক যে পুষ্পাঞ্জলির লেখক হইতে পৃথক্ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ভূদেব উত্তরে লেখেন—The position of the essayist and allegorist is the same; his manner and materials are only different. History and mythology are both of them attempts at the realisation of the ideal, one of the actor and the other of the narrative. · ·To breathe is to know. To know one thing is to know all. The man who said that he knew that he knew not, knew everything and was the wisest man born, not because he was modest in saying what he said, but because he knew the one thing that he knew not.

এই পত্রও ভূদেববাবু ইংরেজিতে লিখিয়াছিলেন; শুধু শেষে দু-তিন লাইন বাংলাতে। পত্রে ভূদেববাবু রাধানাথকে Dearest Radhanath বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই পত্র হইতেই জানিতে পারি যে রাধানাথবাবুর স্ত্রী ভূদেববাবুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উনি কি সর্বজান!

১৮৮৩ সালের ২৯শে মার্চের একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন—

I should like to know if the পারিবারিক প্রবন্ধ has been at all kindly taken to by your part of the Orissa public. The thing was very much praised by some writer in the CALCUTTA REVIEW and it has had some sale here.

I have been induced by friends to take up to write in form of short essays like those of পারিবারিক প্রবন্ধ an exposition of the real teachings of the *Tantra Shastras.* If I can finish what I am just about to undertake, the second part of Puspanjali which I have had long in contemplation, will not be required. The second part would have been the *Tantric* teachings as the first part has been the *Pauranik.* But it seems that the lighter form of essays is more suited to the Bengali taste of these days than the *Pauranik* form in which our forefathers delighted.

ভূদেববাবুর সূত্রে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাধানাথ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ তারিখে তিনি রাধানাথকে প্রথম পত্র লিখেন। চন্দ্রনাথবাবু হাইকোর্টে ওকালতি করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন, তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন কিন্তু সেখানকার আবহাওয়াও বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, পরে বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ হইয়া কাটাইলেন। তাঁহার প্রথম পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—

"এখন যে কর্মে আছি, তাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। অবকাশ পাই না। লেখা একরকম বন্ধ হইয়াছে। এখন সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে লিখিতেছি, লেখা আবশ্যক বুঝিয়া লিখিতেছি। বেশি অবকাশ ও শারীরিক সামর্থ্য থাকিলে উত্তরচরিত প্রভৃতির সমালোচনা লিখিতাম; তাহা নাই। সুতরাং যতটুকু সময় ও সামর্থ্য আছে, তাহা সমাজ ও ধর্মে বিনিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই দুই বিষয়ে আমার কতকগুলি মনের কথা আছে, সেইগুলি বলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। শকুন্তলাতত্ত্বের পর ফুল ও ফল, ত্রিধারা এবং হিন্দুত্ব এই তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছি। আপনাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিব।

"আমার কথা একরকম বলিলাম। আপনার কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আপনার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনি আমার পরমারাধ্য আচার্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিলেন। আপনার কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। হরপ্রসাদ ও আমি একই বাড়িতে কাজ করি। যদি কখনও এখানে আসেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে . .।"

রাধানাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়কেই ভূদেববাবুর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভাবধারার প্রকৃতি তাঁহারা নিশ্চয়ই ভূদেববাবুর নিকট হইতে অনেকখানি পাইয়াছিলেন। বঙ্গ ও উৎকল এই উভয় প্রদেশের সাহিত্যিকদের এই ঘনিষ্ঠ যোগ সাহিত্যের ইতিহাসে উপেক্ষা করিবার নয়।

চিঠিপত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সুকুমার হালদারকে লিখিত

ওঁ

প্রিয়দর্শন সুকুমার

আমার ছেলেবয়সে আমি লোকের মুখে শুনিতাম যে, যে ব্যক্তি হিজলী যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছে সে ব্যক্তি মহাদম্ভে বলে "হাম্ হিজলী যাতা"; সে যখন কিছুকাল পরে হিজলী হইতে ফিরিয়া আসে তখন সে চিঁচিঁ স্বরে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে "হিজ্‌লী-সে আয়া"—

Government Serviceএ ঢুকিবার সময় তেমনি অনেকে দম্ভের সহিত বলেন যে, আমি গবর্ণমেণ্ট Serviceএ প্রবেশ করিতেছি— কায়ক্লেশে one-third pension তাড়াতাড়ি মুঠাইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কাতরস্বরে বলেন "আমি Service হইতে রেহাই পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।" পেষণীযন্ত্র তো আর গাছে ফলে না ইহারই নাম পেষণীযন্ত্র।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

বড়মামা

২

ওঁ

প্রিয়দর্শন সুকুমার

তোমার প্রেরিত পত্রিকাবলী খুব আমার কাজে লাগিয়াছে :— আস্‌চে বারের পরের বারের প্রবাসী দেখিও। Literary Guide খানার আগাগোড়া সমস্তটা আমি পড়িয়াছি, তাহা দৃষ্টে England-এর বর্ত্তমান Literary worldএর একটা bird's eye view প্রাপ্ত হইয়াছি। Literary world দুই দলে বিভক্ত— পাদ্‌রির দল এবং Anti-পাদ্‌রির দল। পাদ্‌রির দল যৎপরোনাস্তি benighted, Anti-পাদ্‌রির দল over-rational কিম্বা Rational with a vengeance। This is a direct result of the present war। Real Religion-এর কোনো দোষ নাই— দোষ হচ্ছে পাদ্‌রিদের মূঢ়তা আর Anti-পাদ্‌রিদের অতিবুদ্ধি। Problem হচ্চে—war কেন হয়। কেহই জানে না Providenceএর Precise will wisdom and love কিরূপ— কেননা তাহা জানা অসম্ভব। কিন্তু এটা আমরা সুনিশ্চিত জানি মনুষ্য গভীর অন্তরে সত্য চায়— অসত্য চায় না, peace চায় war চায় না, love চায় hatred চায় না; গোড়ায় যদি Truth, আনন্দ, love, শান্তি না থাকে তবে মনুষ্যের এ চাওয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। এ চাওয়া কোথা হইতে আসিল— অবশ্য ঈশ্বর হইতে।

Darwinist বলিবেন Evolution হইতে। কিন্তু "evolution" তোমার আমার নিকটে খুব একটা বড় জিনিস হইতে পারে— কিন্তু অসীম জগতের নিকটে এমন কি পৃথিবীর নিকটেও—উহা এক মুহূর্ত্ত-কালের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। The question is কুরুক্ষেত্রতুল্য warএর ঔষধ কি ?—ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করা ঔষধ হওয়া দূরে থাক—তাহা কুপথ্যের একশেষ। উভয় Belligerent party মিলিয়া যদি ঈশ্বরের নিকট "অসতো মা সৎ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবির্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" প্রার্থনা করে, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে war থামিয়া যায়। This is the only medicine। যা হো'ক Literary Guide পড়িয়া আমি অনেক উপকার পাইলাম। ইহার পূর্বসংখ্যক যতগুলা আছে— সবগুলা যদি আমার নিকটে পাঠাও— তবে আমি তোমাকে রাশি রাশি সাধুবাদ, ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ প্রদান করি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
বড়মামা

৩

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রথী,

গাঙ্গুলী সম্বন্ধে পাঁচটা alternative আমার মনে উদয় হয়েছে, যথা :—

1st

আমার হিসাবে আমি ৬০০ দেবো
তোমার হিসাবে তুমি ditto দেবে

2nd

আমার হিসাবে আমি ৮০০ দেবো
তোমার হিসাবে তুমি ৪০০ দেবে

3rd

আমার হিসাবে আমি ৯০০ দেবো
তোমার হিসাবে তুমি ৩০০ দেবে

4th

আমার হিসাবে আমি ১০০০ দেবো
তোমার হিসাবে তুমি ২০০ দেবে

5th

কেবলমাত্র আমার হিসাবে আমি ১২০০ দেবো তোমার কিছুই দিয়া কাজ নাই।

এই পাঁচ alternativeএর যেটা তোমার মনঃপূত হইবে তাহাতেই আমি সম্মত আছি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
জ্যেঠামহাশয়

তুমি কাজ ফেলে আস্‌তে পারিবে না বলিয়া তোমাকে এইটে লিখে পাঠাচ্চি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমাকে আমার আগ্রহের কারণ বুঝিয়ে বল্‌ব।

৪

অনিলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

"এখনি আসিব" বলো যখন
আস্‌বে যত তুমি জানে তা মন ॥
মুনীশ্বরকে হইবে যেতে।
বোল্‌বে সে "আসবেন খেতে" ॥
তার পরে যাবে কানাই সেন।
বোল্‌বে সে এসে "আসিতেছেন"।
ভাব্‌বো তখন ঘণ্টা চারি
করিলাম আমি কী ঝক্‌মারি।

৫

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু
সত্যপ্রসাদ

পথে আসিতে আসিতে রসিক দাসের নিকট শুনিলাম— কতগুলি সামগ্রীর packet আসিয়াছে। কিন্তু তাহা আমি এখনো চক্ষে দেখি নাই— সিংহ-শাবক শান্তি-নিকেতনে গিয়াছেন— তিনি এলে সবিশেষ জান্‌তে পা'ব। বোধ হয় তোমার প্রেরিত আম।

আমের inspiration-এর চোটে কিরূপ কবিতা বেরোয় এখনো তা আমার নিকটে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমের আঁটি গলায় বেধে কোনো ত্রেতাযুগের মহাত্মার মুখ দিয়ে "জয় রাম" বেরিয়ে পড়েছিল— কিন্তু আমের রস গলা দিয়ে নাব্‌লে— শুধু আমের রস হ'লে রক্ষে ছিল, তার সঙ্গে আবার শান্তার ভক্তিরস মেশানো— কি যে আমার মুখ দিয়ে বেরোবে তা আমি জানি নে। শুধু কেবল আ বেবোবে, আর, তার সঙ্গে "রাম"-নামের যোগ হ'লে আরাম হবে ভরপুর। এটা কেবল হনুমানের হ্‌-স্থানে অ; কাজে কিরূপ দাঁড়ায় তা পরে জান্‌তে পাবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
বড়মামা

জুরির ব্যাপারটা সই করে পাটিয়েছি।

৬

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, ৫ সংখ্যকপত্রে উল্লিখিত শান্তা দেবীকে লিখিত

সা ল গ ম - সং বা দ

নাতিনীর নিকট হইতে সালগম উপহার পাইয়া

দাদামহাশয়ের পত্র

সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা,
গান করিলাম সুরু তোম্ তানা নানা;
পাইতাম যদি কাছে গাউন-পরা বুড়ি
ওয়াল্‌জ-নাচ নাচিতাম মিলাইয়া জুড়ি।
শান্তা তুমি কান্তা হও যোগ্য রতনের,
তাহলেই খেদ মেটে আমার মনের।
দিলেন মটন রোষ্ট এস্-পি-জি বাবাজি
চারিধারে সালগম দাঁড়াইল সাজি;
আঁটিনু দুপাটি দাঁত না করি বিলম্ব,
করিনু তাহার পর কারয আরম্ভ;
সালগমে মটনে দোঁহে সোহাগে গলিয়া
মুহূর্ত্ত মাঝারে গেল কোথায় চলিয়া।
কোথায় চলিয়া হায় কোথায় চলিয়া
পেটের কথা পেটেই থাক্—কি হবে বলিয়া।

দাদামহাশয়

নাতিনীর পত্র

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়,

খেয়েছ যে সালগম না করিয়া কাল-গম,
এই আমি বহুভাগ্য মানি;
তার পরে মিঠি মিঠি লিখেছ স্নেহের চিঠি,
তার মূল্য কি আছে না জানি।
তুচ্ছ এই উপহার কে জানিত কমলার
পদ্ম-সরোবর দিবে নাড়া,
সালগম মটন্ রোষ্টে কবির অধর ওষ্ঠে,
খুলি দিবে কাব্যের ফোয়ারা!

কিন্তু বড়দাদা ভাই বড় মনে দুঃখ পাই,
এ খেদ যাবে না প্রাণ গেলে—
শুনিতে হইল এও ভাগ্যবান্ তোমারেও,
নাচের দোসর নাহি মেলে ॥
না হয় না হল বুড়ি, তবুও তো ঝুড়ি ঝুড়ি
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই,
যারেই লইবে বাছি সেই তো উঠিবে নাচি,
নাচিবার ভাবনা তো নাই।
এ কথা ভুলিলে যবে, বুঝায়ে কি আর হবে
ধিক তবে মোর সালগমে!
বুঝিলাম, তরকারী যত হোক দরকারী,
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে।
আর না করিব ভুল, এবারে বসন্তে ফুল,
তুলিয়া আনিব ভরি ডালা
সালগম পেঁয়াজকলি, জলে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাঠাইব বকুলের মালা ॥
তোমার এক নাতনী

দাদামহাশয়ের পত্র

বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সালগমই ভাল,
কাটা ঘায়ে কেন আর লবণাম্বু ঢালো।
গুম্ফ-আক্রমণ-কাব্য উড়াইয়া তোপে
কলপ লাগাতে হল দাড়ি-চুল-গোঁপে।
দাঁতের জন্য ভাবি নে — বেলকুল ফাঁক্,
তথাপি হাসিতে ভাঙে বিদ্যুতের জাঁক্;
গজাইয়া উঠিয়াছে দু-পাটি সুন্দর,
তার সাক্ষী বেয়া'য়ের শ্রীমুখ-কন্দর।
শাস্তা জানি পদ্মিনীরে দিয়াছিনু নাড়া,
কিন্তু এবে দেখিতেছি গতিক বেয়াড়া।
যে মকরন্দের বৃষ্টি! মিষ্টিতে মজিল সৃষ্টি!
বুড়দার শুন পরামর্শ।
মকরন্দ অত ব্যয়, আগে ভাগে ভাল নয়,
ধৈর্য্য ধর তুই এক বর্ষ ॥

আসিবে যখনি অলি, সাধিবে কত কি বলি,
তার জন্য এই ব্যালা থেকে
জমাইয়া মকরন্দ, করি রাখো চাবি বন্ধ,
নহিলে শিখিতে হবে ঠেকে।
এবে মোর বর সাজা, নিতান্ত কঠিন সাজা
তা নহিলে — ফুলমালা বদলি',
অলি যে আসিবে মাতি ফুলায়ে বুকের ছাতি
দেখাতেম তাহারে কদলী।

দাদামহাশয়

৬-সংখ্যক পত্রাবলী ১৩০৯ ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত, পত্রগুলি ভারতীতে বেনামী ছাপা হইয়াছিল। 'নাতিনীর পত্র' প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনা; দাদামহাশয়ের নিকট হইতে কবিতায় চিঠি পাইয়া বিপন্ন নাতিনী, অন্য দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন—কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামেই, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার চিঠির অন্তর্গত হইয়া ১৩৫৮ আষাঢ়-সংখ্যা 'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে—'এতদিন অতিথি ছিল বলে সময় পাইনি। শান্তার জন্যে উত্তর লিখে পাঠালুম—আজ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (বা "এস. পি. জি)" সৌদামিনী দেবীর পুত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়; শান্তা সত্যপ্রসাদের কন্যা।

৩-সংখ্যক পত্র এক দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথের অর্থের প্রতি ঔদাসীন্য, অপর দিকে তাঁহার প্রার্থী-বাৎসল্যের নিদর্শন। কথিত আছে, কোনো বিপন্ন ব্যক্তিকে নগদ টাকার অভাবে তাঁহার গাড়িঘোড়া দান করিয়া দিয়াছিলেন। পৈতৃক জমিদারি পরিচালনা-কালে তাঁহার পরদুঃখকাতরতার প্রকাশ সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে।

গত মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের তিনখানি ইতিপূর্বে 'দেশ' ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতার জন্য পুনর্মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের অপর একখানি চিঠি ১৩৪৬ চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান

বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' -শীর্ষক একটি প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত (বিশেষতঃ হিন্দি বৈঠকী) কোনো কোনো গানের অনুসরণে যে-সব গানে স্বরযোজনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করেন এবং একটি তালিকা (উক্ত সংখ্যার পৃ ২০৯-২১৪) প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হইবার পরে আরও কতকগুলি গান সম্পর্কে জানা গিয়াছে বা অনুমিত হইয়াছে যে, সেগুলিও পূর্বপ্রচলিত কতকগুলি গানের আদর্শে রচিত। পূর্বপ্রকাশিত তালিকা যাহাতে পূর্ণতর হয় এজন্য সেই গানগুলির তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল। এই তালিকা-সংকলনে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এবং শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকগুলি স্বরলিপির খাতা বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। বর্তমান তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে নিমিত্তকারণ হইলেন শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ; শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়া ও মন্তব্য জানাইয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। —সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

হিন্দি-ভাঙা গান

বাংলা গান	মূল হিন্দি গান	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
আইল শান্তসন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম	শ্রীরাগ-চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
আজি রাজ আসনে	প্যারি তেরে পায়ন পকরু	বেহাগ-ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
আয় লো সজনি সবে	আজু মোরন বন	মল্লার-।কাওয়ালি	শতগান
আনন্দ তুমি স্বামী		ভৈরবী-সুরফাঁকতাল[৩]	
উঠি চলো সুদিন আইল	উঠি চলে সুদিন নাচত	কেদারা-সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
এই-যে হেরি গো দেবী / একি করুণা করুণাময় [১]	নইরে মা বরণ	বাহার-আড়াঠেকা[৩]	
এখনো তারে চোখে দেখি নি	পায়েলিয়া মোরে বাজে	ইমন-।কাওয়ালি[৪]	শ্রীইন্দিরা দেবী
ও কী কথা বল সখি[২]		দেশখাম্বাজ-ত্রিতাল[৩]	
ওগো, দেখি আঁখি তুলে	গর্ য়ার্ নহো সাকি	মিশ্র সুরট-দাদ্রা[৩]	শ্রীইন্দিরা দেবী
কাছে তার যাই যদি		জয়জয়ন্তী-কাহার্‌বা[৩]	
কোথা ছিলি সজনি লো[২]		ভৈরবী-ত্রিতাল[৩]	
জননী তোমার করুণ চরণখানি		মিশ্রগুণকেলি-নবপঞ্চতাল[৩]	

তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কছু কহরে	খাম্বাজ-কাহার্‌বা[৩]	
তোমা-হীন কাটে দিবস	তুম বিন কৈসে	বাগেশ্রী-আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুঃখরাতে হে নাথ	রঙ্গরাতি মাতিয়া	সরফর্দা-আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গ ধ্যানরঙ্গ	শুক্লবিলাবল-ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝননন মোর পায়লিয়া	কানাড়া-ঝাঁপতাল[৩]	শ্রীইন্দিরা দেবী
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহন লিয়ে বন	ভূপালি-মধ্যমান[৩]	
ভাসিয়ে দে তরী[২]		জয়জয়ন্তী-†কাওয়ালি[৩]	
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে	হস হস গরওয়া লগাবে	ভৈরবী-যৎ	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমনকল্যাণ-তেওরা	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
যাওয়া আসার এই কি খেলা	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	গান্ধারী-ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা (২)
স্বপন যদি ভাঙিলে[৫]	কহে ন তুম জাবত	রামকেলী-একতালা	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
হরষে জাগো আজি	হরষ জাগো লাল	হাম্বীর-ধামার	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
হা কী দশা হল আমার	হাল মে রবে রবা	বেহাগখাম্বাজ-ত্রিতাল	শ্রীইন্দিরা দেবী
হা কে বলে দেবে মোরে[২]		পিলু-†কাওয়ালি[৩]	
হৃদয়-আবরণ খুলে গেল[১]	নইরে মা বরণ	বাহার	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

বিলাতি সুর-ভাঙা গান

বাংলা গান	মূল গান
আহা, আজি এ বসন্তে	Go where glory waits
তবে আয় সবে আয়	অজ্ঞাত

১ দ্রষ্টব্য: হৃদয়-আবরণ খুলে গেল; তাহারই পাঠান্তর: একি করুণা করুণাময়। এই সুরে কিন্তু ভিন্ন তালে ভিন্ন গান: এই-যে হেরি গো দেবী।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় সর্বদাই সংকেতে সুরকারের নাম আছে। যে-গুলিতে নামের উল্লেখ নাই সেগুলির প্রায় সবই, অন্য পুস্তকাদির প্রমাণে দেখা গিয়াছে, হিন্দিভাঙা। বর্তমান গানগুলির সম্পর্কে অন্য কোনো সূত্রে এখনো কিছু জানা যায় নাই, তবু 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় সুরকার অনুল্লিখিত থাকায় সম্ভবতঃ হিন্দিভাঙা এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

৩ বাংলা গানের রাগ-তাল।

৪ স্বরলিপি-গীতিমালায় উল্লিখিত সুর। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে এই গানের সুর রবীন্দ্রনাথেরই রচিত।

৫ পূর্বমুদ্রিত তালিকায় থাকিলেও, মূলের উল্লেখ ছিল না।

† পূর্বপ্রচলিত কাওয়ালি তালকে অধুনা ত্রিতাল বলা হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ২০৯-২১৪) প্রকাশিত পূর্বোক্ত তালিকায় কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছিল ; তালিকা-নিবিষ্ট সংখ্যা-অনুসরণ করিয়া তাহার সংশোধন নিম্নে দেওয়া গেল।

৬২ সংখ্যক গান 'ডাকি তোমারে কাতরে'— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

১০৩ সংখ্যক গান 'প্রথম কারণ আদি কবি' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এ বিষয়ে শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতা আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪০ সংখ্যক গান 'কী ভয় অভয় ধামে'— শঙ্করা স্থলে বেহাগ হইবে।

৪৬ সংখ্যক গান 'কোলাহল ছাড়িয়ে' স্থলে 'ভবকোলাহল ছাড়িয়ে' হইবে।

৪৯ সংখ্যক 'গহন ঘন বনে' গানটির মূল হিন্দি গান 'আলি রি গরজত' স্থলে 'সঘন ঘন বঙ্ক' এবং প্রাপ্তিস্থান সঙ্গীতমঞ্জরী স্থলে জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইবে।

১১৭ সংখ্যক 'মন জানে মনোমোহন' গানটির মূল হিন্দি গান 'জান সব জগজন' স্থলে 'মন মানো' হইবে। প্রাপ্তিস্থান, গীতসূত্রসার (২)।

১৪৯ সংখ্যক 'হিয়া মাঝে গোপনে হেরিয়ে' গানটির মূল হিন্দিগান 'পিয়া বিদেশ গয়ে'— ভৈঁরো স্থলে পিলু হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'জমিন্দারী পঞ্চায়ত সভা'

কলিকাতা ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে "জমিন্দারী পঞ্চায়ত সভা" স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান রাজা, জমীন্দার ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের যত্নে জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সৃষ্টি। সভার উদ্দেশ্য ছিল এই পাঁচ প্রকার—(ক) বিবাদ-মীমাংসা। (খ) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যাধিকারিশ্রেণীর মধ্যে ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপন। (গ) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি। (ঘ) কৃষিসম্পত্তির এবং ভূম্যধিকারিবর্গের অবস্থার উন্নতি। (ঙ) ভূম্যধিকারিবর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। সভার সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভা স্থাপনের প্রায় দুই বৎসর পরে সভার মুখপত্রস্বরূপ "জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা" ১২৯৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সহকারী সম্পাদক, যোগেন্দ্রনাথ বসু এম. এ., বি. এল.

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; "পত্রিকার ও বিজ্ঞাপনের মূল্য সংক্রান্ত টাকাকড়ি ও কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত পত্রাদি জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উক্ত ঠিকানায় [কার্য্যালয় ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে] পাঠাইতে হইবে।"

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে' উল্লিখিত 'পঞ্চায়ত' প্রসঙ্গে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি

ককুভ। আড়াঠেকা

গান : কেন ভোলো, ভোলো চিরসুহৃদে

কথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রগা -মগরা -গা -া II মা -া পা -া । -া -া -া -া । -পধাঃ -মঃ -পাঃ -মঃ ।
কন০ ০ ০ ০ ০ ০ ভো ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। ধপধপা -মপা মমা গমগা I -রগাঃ -রঃ -সা সসা । সরগা -রা -াঃ রঃ । রগমা -মগরা -গা -া ।
ভো০০ ০ ০ ০ লোচি র০০ ০ ০ ০ ০ সুহৃ দে০০ ০ ০ কে ন০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। মা -া পা -া I -া -া র্সনা র্সা । -া -নধা ধনা ধপা । পা -া -া -া ।
ভো ০ লো ০ ০ ০ ভুলো না ০ ০ ০ চির সুহৃ দে ০ ০ ০

। -পধা -পধণা ধপমা -গরগা II
০ ০ ০ ০ ০ "কেন"০ ০ ০ ০

[র্সর্সা র্সর্গর্রা -র্সর্সা নর্সা -ধনর্সা] c.

II { -া পপা পনধা -র্সর্সা । র্সর্রর্সা -নর্সা র্সা -া । -া র্সর্সা নধা পপা I
০ ধ ন প্রা০০ ০ ণ মা০ ০ ০ ০ ন ০ ০ স ক লি০ যাঁহ

I পনধা -র্সা -া -া } । -া র্সনা র্সা -নধা । ধনা ধপা -া -া । -পধা -পধণা ধপমা -গরগা II
তে০ ০ ০ ০ ০ এম ন ০ ০ সুহৃ দে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "কেন"০ ০ ০ ০

I -া মমা মা -গমপা । { পা -ধমা পা -া । -া -া মমা পধা I ধর্সাঃ র্সঃ র্সর্রর্সা -নর্সা ।
০ থেকো না ০ ০ ০ থে ০কো না ০ ০ ০ তাঁহ তে০ অন্ ত র০ ০ ০

[মগাঃ]

। -ধা -পা (মমা গমপা)} । মমা মপমা । {গগাঃ -মগঃ রা সা । -া সসা রগরা -গগা I
০ ০ থেকো না০ ০ তাঁরে ছেড়ে০ ত্রাণ ০ ০ কো থা য় কোথা শা০০ ন্তি

[র্সর্সা র্সর্গর্রা -র্সর্সা নর্সা -ধনর্সা]

। মা -গমা পা -া । (-ধণা র্সর্সণা ধপা -ধপা)} । {-া পপা পনধা -র্সর্সা । র্সর্রর্সা -নর্সর্সা র্সা -া ।
ব ০ ল ০ ০ ০ তাঁরে ছেড়ে ০ ০ ০ চির জী০ ০ ব ন০ ০ ০ স খা ০

। -া র্সর্সা না -ধপপা I পনধা -র্সা -া -া} । -া র্সনা র্সা -নধা । ধনা ধপা -া -া ।
০ চির স ০ ০ হা য়ে০ ০ ০ ০ ০ করু ণা ০ ০ নিল য়ে০ ০ ০

। -পধা -পধণা ধপমা -গরগা II II
০ ০ ০ ০ ০ "কেন"০ ০ ০ ০

চিত্রপরিচয়

আচার্য নন্দলাল বসুর 'রেখার রীতি ও প্রকৃতি' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তস্বরূপে কতকগুলি ছবি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হল। সূচনায় মুদ্রিত 'আনন্দ ও প্রকৃতি' যে কাহিনী লক্ষ্য ক'রে আঁকা তার বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা (১৩৪০ ভাদ্র) বা নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৩৪৪ ফাল্গুন) রচনায়। শ্রাবস্তী নগরে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন তৃষ্ণার্ত হলেন পথের মধ্যে। 'দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে।' তার কাছে জল চাইতে সে বললে :

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে— আমি চণ্ডালের কন্যা, মোর কূপের বারি অশুচি।...

উত্তরে আনন্দ বললেন : যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি।

পরম কৃতার্থা হয়ে চণ্ডালকন্যা জল ঢেলে দিলেন সমাজপূজিত শ্রমণের বদ্ধ অঞ্জলিতে এবং তিনি 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী' ব'লে বিদায় গ্রহণ করলেন। এই ঘটনা থেকে প্রকৃতির জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত হল যে ভাবে তা পূর্বোক্ত কাব্য দুখানিতে বর্ণিত আছে।

অন্যান্য চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় চিত্রগুলির আনুষঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। শিল্পাচার্য মিশ্র গড়নের রেখার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন (পৃ ৩) আধুনিক ভারতীয় চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাতেই তার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫০ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত উমা (২২৯ পৃষ্ঠার সম্মুখীন) বা মা (২৪৪ পৃষ্ঠার সম্মুখীন) ছবি দুখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

'রেখার রীতি ও প্রকৃতি' প্রবন্ধে পারসিক ও চীনা লেখাঙ্কনের ও তদ্দ্বারা প্রভাবিত চিত্রপদ্ধতির আলোচনা আছে। এ সম্পর্কে জনৈক এদেশীয় ও জনৈক চৈনিক গুণীর উক্তি পাঠকদের উপহার দেওয়া যেতে পারে। মুল্লাহ্ মীর আলী, জহাঙ্গীর বাদশাহ এঁর লেখাঙ্কন অতিশয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন, নিজের লেখার গর্ব ক'রে বলছেন : বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে আমার লেখনী প্রতি পদে, লেখার রূপ লেখার অর্থকে অতিক্রম করে বিরাজ করে এক পরমোৎকর্ষের স্বর্গে। অক্ষরের এক একটি বঙ্কিমার পদতলে পরাভূত গগন-গুম্বজ নতি স্বীকার করে, এক-একটি টানের মূল্য শোধ করতে মহাকাল হয় ফতুর।

মীর আলীর এই উক্তি মোহমুগ্ধ অত্যুক্তি বা প্রলাপ নয় নিশ্চয়ই। সিদ্ধ শিল্পীর জীবনে, পরম মুহূর্তগুলিতে, এজাতীয় উপলব্ধিও সত্যই। তবু চীনা শিল্পীর উক্তির সঙ্গে এর কত তফাত। চীনা শিল্পীর নামটি ঠিক জানি নে, কোনো গ্রন্থের নির্দেশও দিতে পারব না। কিন্তু সে-সবের প্রয়োজনও নেই ; কারণ, পাঠক দেখতে পাবেন উক্তিটি কোনো একজন চীনা শিল্পীর উক্তি নয়, যেন সমস্ত চৈনিক চিত্রশিল্পের, চৈনিক লেখাঙ্কনেরও বটে— কারণ, চীনা রসোত্তীর্ণ চিত্রে আর লেখাঙ্কনে আন্তরিক মিল আছে— উভয়েরই মর্মকথা। গুণী বলছেন : ঘাসের একটি পাতা যখন আঁকি তখনই স্পর্শ করি আমি অনন্তের অঞ্চলপ্রান্ত : I touch the hem of Eternity.

এরূপ শিল্পও অসামান্য, তার সমজ্দারিও সুকঠিন।

কানাই সামন্ত

মৎস্যগন্ধা
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯

চিঠিপত্র

স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[লণ্ডন। পোস্টমার্ক ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২]

ভাই নদিদি

জাহাজে যতদিন চলেছিলুম যথেষ্ট সময় পেয়েছিলুম সেই সময় অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখ্‌তে পেরেছিলুম। এখানে এসে হঠাৎ যথেষ্ট সমাদর পেয়েছি কিন্তু সময় পাইনি। তাই এখানে লেখা বড় এগয়নি। কেবল এখানকার লোকের তাড়ায় নিজের কবিতা নাটক প্রভৃতির ইংরেজি তর্জ্জমা অনেকগুলি করেছি। প্রথম প্রথম এখানে আমার শরীর ভালই ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে তেমন ভাল বোধ হচ্চেনা— তাই আজকাল লেখা বন্ধ আছে। শরীরটা আবার সেরে উঠ্‌লে ভারতীর জন্যে একটা কিছু লেখা পাঠিয়ে দেব।

মণিলালকে [১] আমি কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক অ্যাণ্ডার্সনের [২] ঠিকানায় আমার কতকগুলো বই পাঠাতে বলেছিলুম, কিন্তু বোধহয় মণিলাল সেগুলো পাঠায়নি। কেননা পেলে অধ্যাপক আমাকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাঠাতেন। তাকে তুমি একটু তাড়া দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। নইলে অ্যাণ্ডার্সনের কাছে আমাকে অপ্রস্তুত হতে হবে।

আমার কতকগুলি কবিতার গদ্য তর্জ্জমা করেছিলুম সেগুলো এদের খুব ভাল লেগেছে—ছাপতে দিয়েছে—বোধহয় অক্‌টোবরের শেষাশেষি বই বের হতে পারবে। আমার ছোট গল্পের তর্জ্জমাও এরা ছাপতে চাচ্চে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এবার এদের দেশে গরমিকালে গরম হলই না। কেবলি বৃষ্টিবাদল এবং শীত চলেছে। সেপ্টেম্বরে ঠিক ডিসেম্বরের মত ঠাণ্ডা পড়েছে। সকলে আশঙ্কা করচে খুব বেশি শীত হবে। আমরা নবেম্বরে আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেছি।

জ্যোতিদাদার ছবির খাতা [৩] এখানকার কোনো কোনো আর্টিষ্ট্ দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওঁর drawing একেবারে প্রথমশ্রেণীর ওস্তাদের হাতের উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভাল লোক দিয়ে ওঁর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বল্‌চেন, উচিত ওঁর ছবির একটা selection ছাপাতে। ছবি ছাপানো ভয়ানক খরচ। অন্তত হাজার দেড়েকের কমে হতেই পারেনা। জ্যোতিদাদাকে লিখেছি যদি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়।

তোমার রবি

২

ওঁ

ভাই নদিদি

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা তোমাদের ভাল লেগেছে শুনে খুসি হলুম। ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলো তর্জ্জমা করে ফেলেছি সেগুলোও এখানকার লোকের ভাল লেগেছে এবং ম্যাকমিলানরা ছাপাবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে। আমি এখন পথে। শিকাগো সহরে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল সেইটে শেষ করে রচেষ্টারে চলেছি—সেখানে Religious Liberalsদের এক Congress meeting[৪] হবে, সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে—আজ সেখানে যাত্রা করচি। সেখান থেকে বষ্টন প্রভৃতি দুই এক জায়গায় ঘুরে এখানে ফিরে আসব। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড যে এক সহর থেকে আর এক সহরে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার। কলকাতা থেকে বম্বাই সহরে বক্তৃতা করতে যাওয়া যেমন, আমার পক্ষে আর্ব্বানা থেকে রচেষ্টারে যাওয়াও তেমনি। এখানকার খুব দ্রুতগামী ট্রেনেও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা লাগ্‌বে।

এখানে রথী তার কলেজে একটা Post Graduate Course নিয়েছে— সেটা সমাধা করতে তার আর তিন মাস লাগবে। সেইটে শেষ করে তার পরে মে মাসে আমার ইংলণ্ডে ফেরবার কথা আছে। সেখানে আমার লেখাগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বউমার এ জায়গায় বেশ চল্‌চে। সকলেই ওঁকে খুব ভালবাসে। ওঁর একটা গুণ আছে উনি কিছুমাত্র nervous নন। অপরিচিত লোকদের মধ্যে অপরিচিত জায়গায় বেশ নিঃসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করতে পারেন। অথচ আমাদের আধুনিক মেয়েরা যে রকম একটু সুর চড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বৌমার সে ভাব একেবারেই নেই, খুব শান্তধীর আত্মসমাহিত ভাব— সেইটে এদেশের পক্ষে একটু নূতন এবং এরা সেটাকে ভারতবর্ষের মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ মনে করে খুব আদর করে। ইংরেজি কথাবার্ত্তাও বৌমা একরকম কাজচালানো রকম করে চালিয়ে দিতে পারেন। নানা দেশ দেখে নানাবিধ লোকের সংসর্গে এসে ওঁর পক্ষে এই ভ্রমণটা খুব একটা শিক্ষা হচ্চে।

তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিনে রেলোয়ে ষ্টেশনে পেয়েছি। তুমি জাননা এখানে কোনো বই প্রকাশ করা কত কঠিন। অবশ্য নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক, পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চায় না। এখানকার অনেক বই গ্রন্থকারের খরচে প্রকাশ হয়। আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তা ছাড়া তর্জ্জমা খুব যে ভাল হয়েছে তা নয়— অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয় নি।

আমার জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি[৫] এখানে সকলেই খুব প্রশংসা করচেন। গগনের উচিত তাঁর অন্য ছবিগুলি একটা পোর্টফোলিয়ো আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। ইতি ২৮ জানুয়ারি [১৯১৩]

তোমার স্নেহের

রবি

৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯২৫]

ভাই নদিদি

এখানে এসে অল্প একটু ভালো আছি। কিন্তু এখনো নড়াচড়া প্রায় বন্ধ— কেদারার মধ্যে সমস্ত দিন স্তব্ধ হয়ে আছি। য়ুরোপে যাত্রা পর্য্যন্ত এই রকমই কাটবে। সেখানকার হাওয়ায় শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে এই আশা করে আছি। এখানে এবার এখনো গরম পড়ে নি— প্রায় মাঝে মাঝে মেঘ করে আস্‌চে। রাত্রিটা বেশ রীতিমত ঠাণ্ডা থাকে। প্রণাম।

তোমার রবি

শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২ ডক্টর জে. ডি. আণ্ডার্সন বা 'ইন্দ্রসেন'। কেম্ব্রিজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো আলোচনা ইঁহারই পত্রের উত্তরে লিখিত।

৩ এই সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে 'চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্রষ্টব্য।

৪ এই সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ("Race Conflict") মডার্ন রিভিউ পত্রের ১৯১৩ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত। ইহার অজিতকুমার চক্রবর্তী -কৃত অনুবাদ জাতি-সংঘাত প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) ও প্রিয়ম্বদা দেবী -কৃত অনুবাদ "জাতি-বিরোধ" ভারতী পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) মুদ্রিত হয়।

৫ জীবনস্মৃতির প্রথম সংস্করণ (১৩১৯) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ২৪ খানি চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

শিল্পপ্রসঙ্গ

শ্রীনন্দলাল বসু

একটি আলোচনা

পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গে যখন আমি চীন দেশে গিয়েছিলাম, তখন একদিন গুরুদেবের আহ্বানে সেখানকার সব বড়ো বড়ো শিল্পীদের সমাগম হয়েছিল। তখন গুরুদেব বললেন, নন্দলাল, এ তোমার জীবনে পরম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তোমার শিল্পের বিষয় যা জানবার আছে এই সব মনীষীদের কাছে জেনে নাও।

আমি প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, শিল্পীদের সঙ্গে সমাজের যোগ কোথায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভালো শিল্পীরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন কী ক'রে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ॥ শৌখিন (amateur) শিল্পী সমাজের আনন্দ যোগান, যা সমাজের প্রাণ। অথচ শুধু আনন্দের জন্যে শিল্পসৃষ্টি করেন ব'লে তাঁরা স্বার্থশূন্য ও নির্লিপ্তভাবে তা দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ॥ শৌখিন শিল্পীদের জীবনযাত্রানির্বাহে কোনো চিন্তার কারণ নেই। এই ক'জন হলেন সম্মানজনক শৌখিন শিল্পী-পদের অধিকারী (১) হয় তিনি দেশের রাজা, নয় রাজ্যের বড় কর্মী, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ বা এইরকম কিছু (২) নয় বড় জমিদার বা ব্যবসায়ী (৩) নয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। এঁরা সমাজকে, স্বার্থশূন্যভাবে ও স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা ক'রে, নিজ সাধনার ফল দিতে পারেন। কারও খাতিরে তাঁরা নিজ মত বদলান না। কেবল নিজ সাধনার দ্বারা স্বমত গঠন করেন। এঁরা দেশের শিল্পের ঐতিহ্য বদলে দিতে পারেন। কারণ, এঁরা নিন্দাস্তুতির বহু ঊর্ধ্বে; আর সাধনার দ্বারা সত্যের সন্ধান ও আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন বলে এরূপ করতে সমর্থ। এইসব শিল্পীদের পক্ষে শিল্পের দ্বারা অর্থোপার্জন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পেশাদার শিল্পীদের স্থান শৌখিন শিল্পীদের নিম্নে; কারণ তাঁদের কতকটা সমাজের মনোরঞ্জন ক'রে অর্থোপার্জন ও সম্মানলাভ করতে হয়। পেশাদার শিল্পীদের শিল্পের নানা কৌশল (technique) আয়ত্ত করতে হয়। কারণ, জনসাধারণ প্রায়ই ঐসব ক্রিয়া-কৌশলের দক্ষতার নিরিখেই শিল্পকর্মের বিচার করেন। তবে ইচ্ছা করলে, পেশাদার শিল্পীও স্বাধীন শৌখিন শিল্পী হ'তে পারেন। তবে তখনই তা সম্ভবপর যখন তাঁরা সমাজের ও সংস্কারবদ্ধ অ্যাকাডেমিক শিল্পীদের সমালোচনার ভয় থেকে, অর্থোপার্জনের তাগিদ ও মোহ থেকে মুক্ত হন। এই সব শৌখিন ও পেশাদার শিল্পী ছাড়াও আর দু রকমের শিল্পী চীনের সমাজে আছে। এক হ'ল পোটো অর্থাৎ যাঁরা কয়েকটিমাত্র ছবি বারবার নকল ক'রে অর্থোপার্জন করেন, কোনো মৌলিক ছবি করতে পারেন না। আর-এক হল 'জালিয়াত' শিল্পী, তারা বড়ো শিল্পীদের ছবি নকল করে, আর তাদের নাম ও শীলমোহর ব্যবহার ক'রে সমাজকে ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করে।

একখানি চিঠি

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার লেখা ২৯-৪-১৯৫২ তারিখের পত্র পেলাম। তাতে শিল্প বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন ; সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। আপনার প্রশ্ন হল—

(১) আর্ট্ শিখিতে হইলে কোনো চাকুরি করিয়াও শেখা যায় কি না।

(২) আর্টের শেষ সীমায় পৌছানো যায় কি না।

(৩) 'যদি যায় তাহা হইলে সেইরূপ কোনো অনুকরণীয় জীবনীর কিয়দংশ অনুসরণ করিবার জন্য পাঠাইলে সান্ত্বনা পাইব। কারণ আমিও চাকুরি করিয়া [কিরূপ চকুরি ?] আর্ট শিখিতেছি কিছুদিন হইল [নিজে নিজে বা কাহারও কাছে ?]।'

(৪) আর্টের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ করা যায় কি না।

(১) চাকরি করতে করতে বা যে-কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিখতে শিখতে আর্ট্ শেখা যায়। তবে দেখতে হবে, শিল্পে শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে কি না। যে কাজ করতে করতে শিল্পসাধনা করতে চান সে কাজ করার পরও শিল্পীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে কি না।

(২) আর্টের শেষ সীমায় পৌছানো যায়। কিন্তু খণ্ড সীমায়, দেশ কাল পাত্র হিসাবে। তবে শিল্পে স্বাভাবিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা থাকা চাই ; তা না হ'লে, কালে ধৈর্যচ্যুতি ও লক্ষচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শিল্পসাধনা কিম্বা সংসারপ্রতিপালন দুটার মধ্যে যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তারই শেষ প্রান্তে পৌছানো গিয়েছে, অবশেষে এই দেখা যাবে। ঐকান্তিক অনুরাগ থাকলে আর্টে লক্ষচ্যুতির সম্ভাবনা কম।

শিল্পসাধনার শেষ সীমা কিছু নেই। যেমন আনন্দ-উপলব্ধির সীমারেখা টানা যায় না। আনন্দ বা রসানুভূতির স্বরূপ অনির্বচনীয়। তার ইতি নেই। কখনও তার তারতম্যও হয় না। আনন্দ-উপলব্ধি ও রসবোধ যতই গভীর হ'তে থাকে ততই তার বিরাট ও সর্বত্রগামী সত্তার অনুভূতি তার সীমাবদ্ধ আশ্রয় বা উপলক্ষ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। এই আনন্দ বা রসানুভূতির গহন কন্দরে পৌছনোর একমাত্র পথ শ্রদ্ধা ও আস্তিকতা। শিল্পী প্রথম থেকেই সমালোচকের চোখে ছবি দেখতে আরম্ভ করলে ধন্ধ বাড়তে থাকবে। শেষে হয়তো দেখা যাবে, সার ছেড়ে অসারে তার মগজ বোঝাই হয়েছে। অর্থাৎ, শিল্পী বনেছেন সমালোচক বা ঐতিহাসিক। এ যেন শিব না হয়ে মানুষের পিতামহ হওয়ার দুর্ঘটনা ঘটেছে। আনন্দ ও রসের সম্যক্ বোধের জন্য প্রিয়দর্শী ভালো সমালোচকদের লেখা পড়তে হবে। এমন লেখা অবশ্য দুর্লভ নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, প্রথমে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বেত্তা প্রিয়দর্শীদের গ্রন্থাবলী প'ড়ে পরে বিদেশীয়দের তথা বিদেশী শিল্পের সমজদারদের বই পড়লে ভালো হয়। কিছুতেই ভুলবেন না, আমরা ভারতীয়, আমাদের চোখ ভারতবর্ষের আলোতেই উন্মীলিত হয়েছে এবং আমাদের মন ভারতেরই স্তন্যরসধারাপুষ্ট।

প্রিয়দর্শী, যিনি শ্রদ্ধাশীল ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ; যিনি শিল্পের গুণাবলী আগে দেখেন, তার পর তার অগুণের বিচার করেন।

আর একটি কথা, নামজাদা পুরাতন ও নূতন ভালো শিল্পীর ছবি হামেসাই দেখতে হবে। ছবি যদি

মৌলিক হয় সে সবচেয়ে ভালো। যাঁরা বহুদিন ধরে (অন্তত বিশ বৎসর ধরে) নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাযথ শিল্পসাধনা করছেন দেশকাল ও শৈলী বা স্টাইল -নির্বিচারে তাঁদের সঙ্গ করতে হবে।

(৩) চাকরি বা অন্য কাজ করতে করতে শিল্পসাধনার শেষ সীমানায় পৌঁছেচেন তেমন জীবনের দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের দেশে সেরূপ শিল্পীর জীবনীর বড়ো অভাব। চীন বা পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে ভাগ্যবান। চীনা বা বিলিতি শিল্পীদের জীবনী পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই নে, খবরও রাখি নে। ঐরকম জীবনের সন্ধান করার দরকারও আমার হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা থাকায় সৌভাগ্যক্রমে গুরু বলে যাঁকে প্রথমে বরণ করেছিলাম তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসই আজীবন আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে। ভারতে ঐরূপ শিল্পীর জীবনী না থাকলেও সাধু, সন্ত, সঙ্গীতজ্ঞ মহাপুরুষদের জীবনকথার অভাব নেই। তাঁদের জীবন ও তাঁদের সাধনার ইতিহাস এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করবে। আর দেখে থাকবেন, অনেকে চাকরি বা অন্য কাজ করেও হয়তো সঙ্গীতের চর্চা করে থাকেন এবং তাতে আনন্দও পান ঢের। তাঁরা নাম যশ বা অর্থাগমের পন্থারূপে এই অতিরিক্ত সাধনায় ব্রতী নন, শখের বা নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য এইসব চর্চা করেন। শিল্প শেখায় শিল্পীর স্বাভাবিক প্রীতি বা রসবোধ থাকা চাই। কেবল চেষ্টা করে বা জোর করে শখ বা রসবোধ জাগানো যায় না ; যেমন ধরে বেঁধে ভালোবাসানো কখনও সম্ভবপর হয় না। এ হ'ল অশিক্ষিতপটু সহজাত সংস্কার। লোক-দেখানো ভালোবাসা ভণ্ডামির চূড়ান্ত। নামের মোহে বা অর্থের লোভে ভালোবাসা ঘৃণার যোগ্য ; তাতে নিজের বা অপরের কারোরই তৃপ্তি হয় না, বরং আখেরে হয় চরম মর্মঘাতী। শিল্পীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা থাকলে শিল্পের অনেকখানি স্ববলেই তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। ছোটো ছেলেরা কেমন করে ছবি আঁকে, আদিম যুগের লোকেরা কেমন ক'রে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন, তা দেখলে মনে বিস্ময় জাগে। তবে একটা শিল্পপরিবেশের মধ্যে থাকলে বড়ো সুবিধা হয়।

রসসৃষ্টি করাতেই শিল্পের সার্থকতা। শিল্পরচনায় রসসৃষ্টি ও আঙ্গিকের দক্ষতা সমান দরকারী হলেও রস হ'ল মুখ্য, আর আঙ্গিক হ'ল গৌণ। ইমারত ও ভিৎ, প্রাণ ও দেহের মতো অন্যোন্যমুখী নিত্য সম্বন্ধ, আবার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

তাঁকে পাওয়া তো চাই। তবে তাঁকে সত্যিই কি পেতে চাই ? আপ্ত বাক্য হ'ল, সত্যই তাঁকে চাইলে পাওয়া যাবে। এখানে কথা আসে শিল্পীর যে ঈশ্বর তাঁর স্বরূপ কী। শিল্পী আমরা আমাদের শিল্পভাবনায় তাঁকে পেতে চাই রসরূপে, আনন্দরূপে। ঈশ্বরের স্বরূপ কী তা কেমন ক'রে বলব। জনাবার তো বুদ্ধি নেই। তবে সার কথা এই বুঝি, আনন্দ পেতে চাই।

দুটি স্কেচ্ চেয়েছেন। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এখন বুদ্ধি সচল, কিন্তু মন তার কাজের বোঝা নামিয়ে বিস্রস্ত হয়ে বিশ্রামরত। ইতি

দেশ ও কাল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দেশ আর কাল, এ দুটি হল সৃষ্টির সবচেয়ে আদি ব্যবস্থা, সৃষ্টির মূল কাঠামোই এ দুটি দিয়ে। আমরা জানি, চোখে দেখি, সব জিনিস আছে এবং ঘটে দেশে ও কালে। দেশ নাই, কাল নাই, অথচ বস্তু আছে— এ রকম অবস্থা বা ব্যবস্থার কথা অধ্যাত্মবাদীরা বলে থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয় তা নয়। আমরা বলছি এই স্থূলের কথা, জড়জগতের কথা, জড়জগতের মধ্যে যা-কিছু আছে তার কথা— যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— এই গতিসমষ্টির মধ্যে যা-কিছু গতিময় সেই জিনিস। এখানে সবই দেশ ও কাল পরিচ্ছিন্ন। এ দুটি যেন যুগল বাহন বা আধার, দুটিতে মিলে গড়েছে বিশ্ববস্তুর আদি আশ্রয় ও অবলম্বন— আত্মারই মত এদের সম্বন্ধেও বলতে পারি, এতৎ আলম্বনং শ্রেষ্ঠং এতৎ আলম্বনং পরম্। সাধারণ বোধে তাই দেশ কাল হল স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। কারো উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, তাদেরই উপর নির্ভর করে আর-সকলের অস্তিত্ব। এ হল স্থির নির্দিষ্ট নিশ্চিত জিনিস— একটা সুদৃঢ় অনড় পট, আর তার উপর আঁটা রয়েছে বস্তু ও ঘটনা সব। বস্তু বা ঘটনাবলীর গুণকর্মের উপর এই যুগ্মসত্যের সত্যতার ব্যতিক্রম কিছু হয় না। তাছাড়া এ দুটি যুগ্মসত্য বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই আবার নিজের নিজের সত্যে ও সত্তায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; তারা পরস্পরকে ধরে আছে বটে, অচ্ছেদ্যভাবে— কিন্তু একের স্বকীয়তা অন্যটির উপর নির্ভর করে না।

একটি জিনিসের অস্তিত্ব অর্থাৎ একটি জিনিস আছে বলতে বুঝি তাহলে তা আছে একটি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ কালে, অর্থাৎ চতুর্দিকবিস্তৃত অসীম প্রসারের মধ্যে তা হল একটি বিন্দু এবং পৌর্বাপর্যের অনন্ত ধারাবাহিকতার একটি ক্ষণ। দেশের প্রসারে স্থান বৈজ্ঞানিকেরা নির্দেশ করে থাকেন তিনটি রেখা ধরে : ১. দ্রষ্টার দৃষ্টিরেখা হতে কতখানি উপরে বা নীচে, ২. দ্রষ্টার দক্ষিণে বা বামে কতখানি, আর ৩. দ্রষ্টার সম্মুখে সোজা কতদূরে ; অন্য কথায়, লম্ব, তির্যক আর বেধ রেখা এই তিনটির সংযোগ যেখানে তাই হল জিনিসের স্থান বা স্থিতি। মাপের জন্য দ্রষ্টা ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ স্থিরবিন্দুও গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থিতির এই যে কাঠামো তার মূলরূপ দিয়েছিলেন ফরাসী দার্শনিক ও গাণিতিক দেকার্ত (Descartes), তাই এর নাম cartesian co-ordinates, আমরা বলতে পারি, কার্তেজীয় রেখাঙ্ক। তার পর জিনিস এক জায়গায় থাকে না, তার স্থিতির অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায়, রেখাঙ্কের পরিবর্তন হয়। এক স্থিতি হতে আর-এক স্থিতিতে পরিবর্তনের মধ্যে যে অবকাশ তারই নাম কাল। কাল-মুহূর্ত বা ক্ষণ যদি জানা থাকে, আর জানা থাকে সেই মুহূর্তে দেশগত স্থিতি, তাহলে আমরা যে-কোনো মুহূর্তের (অতীতে হোক আর ভবিষ্যতে হোক) স্থিতি-কাঠামো নির্ণয় করে দিতে পারি। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে transformation— রূপান্তর। রূপান্তর না বলে আমরা বলতে পারি, মাপান্তর। এই মাপান্তর নানা ধরনের আছে— গতিবেগের সাম্য বা বৈষম্য অনুসারে। এই মাপান্তর বা মানান্তরের বিধি সমীকরণ সূত্রে (equation) বেঁধে দেওয়া হয়।

দেশকাল সম্বন্ধে এই যে সিদ্ধান্ত এটি হল প্রাচীনতর বা 'ক্লাসিকাল' বিজ্ঞানের কথা। এই সিদ্ধান্ত জগতের যে চিত্র এঁকেছে তাতে ত্রুটি, ফাঁক কোথাও আছে— এ প্রত্যয় বা অনুভবও আবার সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু ত্রুটি ঠিক কোথায় এবং মীমাংসাই বা কি তার যথাযথ হদিশ পাওয়া যায় নি। এই যেমন ত্রুটিটি গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno) দেখিয়েছেন তাঁর একিলিস (Achilles) আর কচ্ছপের বিখ্যাত গল্পে। গল্পটি এই : একিলিস ও কচ্ছপ পাল্লা দিয়ে দৌড় খেলছে। কচ্ছপ আগে, একিলিস একটু পিছনে— একিলিস, বলা বাহুল্য, কচ্ছপের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ছুটছে। কিন্তু তা হলে কি হবে ? গাণিতিক হিসাবে সে কখনও কচ্ছপকে পেরিয়ে যেতে পারে না। কি রকম ? ধর, একিলিস ক বিন্দুতে, আর কচ্ছপ তার আগে খ বিন্দুতে ; একিলিস যখন এসেছে খ বিন্দুতে, কচ্ছপ তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে গ বিন্দুতে, যতটুকু আগেই হোক। তার পর আবার একিলিস যখন এসে পৌঁছেছে গ বিন্দুতে, কচ্ছপ সেখানে নেই, এগিয়ে গেছে ঘ বিন্দুতে, যতটুকু আগেই হোক— এ রকমে কচ্ছপ সরে সরে যাবে বরাবর, একিলিস কখনও তার নাগাল পাবে না। তাহলে, শাস্ত্র অনুসারে একিলিস কচ্ছপকে কখনো ধরতে পারে না— শাস্ত্র অনুসারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ? শাস্ত্রের ফাঁক তবে কোথায় ?

অবশ্য গল্পটিকে এ যাবৎ গল্প হেঁয়ালি বা ধাঁধা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞান এর মধ্যে দেখছে নূতন অর্থ, নূতন অভিব্যঞ্জনা। ধাঁধাকে গম্ভীরভাবে নিয়ে তার একটা সদর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। এ গল্পটি দেশ সম্বন্ধে যে প্রাচীন ও প্রচলিত ধারণা, তার মূলে যে অব্যবস্থা বা প্রমাদ রয়েছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ *(reductio ad absurdum)*। দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে স্বভাবত জিনিস দেখা হয়, তার পিছনে দুটি সিদ্ধান্ত বা স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। প্রথম হল, দেশ একটা বস্তুনিরপেক্ষ জিনিস অর্থাৎ বস্তু না থাকলেও দেশ থাকতে পারে, এবং এ-রকম শূন্য দেশের গুণবৃত্তি বিধি-বিধান নির্ণয় করা সম্ভব। জ্যামিতি, বিশেষতঃ ইউক্লিড-রচিত, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, দেশ হল বিন্দুসমষ্টি— অসংখ্য অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি বা ব্যষ্টিস্থানের সমাহার। একটা স্থির নির্বিকার একান্ত-বাহ্য স্বতন্ত্র প্রসার পড়ে রয়েছে, আর তার উপর পৃথক পৃথক ব্যষ্টিবিন্দু-সব চলাফেরা করছে— এই চিত্রটি সাধারণ চোখে দেখা যায় এবং বিজ্ঞান মূলত একেই স্বীকার করে নেয় ; কিন্তু সকল বিপত্তির মূলও ঠিক এইখানে। এ-রকম ব্যবস্থা অনুসারে একিলিস যে কচ্ছপকে ধরতে পারে না তা অনিবার্য। কারণ, গতি এখানে হয়ে পড়ে স্থিতির সমষ্টি মাত্র, স্থিতি পারম্পর্যই হয়ে ওঠে গতি। কিন্তু স্থিতির সমষ্টি স্থিতিই হতে পারে, গতি হয় না— অসংখ্য সংখ্যার সমষ্টি অসীম নয়, অথবা সান্তের অন্তহীন পরম্পরা বা পরিব্যাপ্তি অনন্ত নয়।

দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হল, কাল সম্বন্ধেও ঠিক তাই প্রযোজ্য। কাল মুহূর্তের সমষ্টি নয়, পারম্পর্য নয়। দেশ যেমন বরাবর সাজানো বিন্দুরাশি নয়, কালও তেমনি পরপর সাজানো নিমেষ-শ্রেণী নয়। দেশ যেমন একটা অখণ্ড অচ্ছেদ্য টানা প্রসার, কালও তেমনি একটা অবিভাজ্য একটানা প্রবাহ।'

আইনস্টাইন তাই প্রাচীন চিত্রে একটা পরিবর্তন প্রস্তাব করলেন। বস্তু-নিরপেক্ষ একান্তবাহ্য স্বতন্ত্র দেশ যদি কিছু থাকে, তবে তা দিয়ে কাজ চলে না অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের কাজ ; আমাদের কারবার বস্তু-সাপেক্ষ দেশ নিয়ে। কার্যত বাস্তবে দেশ এক অখণ্ড কিছু নয়। দেশের এক-একটা গণ্ডী বা কোট রয়েছে— ফলতঃ প্রত্যেক বস্তু বা ব্যষ্টিরই রয়েছে নিজস্ব দেশ— প্রত্যেক বস্তু চলে তার চারিদিকে আপনার দেশকে সঙ্গে নিয়ে। কারণ বস্তুর দেশ-পরিমিতি নির্ভর করে তার গতির উপর। আর দেশ যে বস্তুনিরপেক্ষ নয়,

তার একটা হেতু কাল— প্রত্যেক বস্তুর পৃথক দেশ হতে বাধ্য, কারণ প্রত্যেক বস্তু রয়েছে পৃথক কালে। অন্য কথায়, প্রত্যেক বস্তু রয়েছে তার নিজস্ব দেশে ও কালে যুগপৎ অথবা দেশ ও কালের বিশিষ্ট যৌগপত্য নিয়ে হল বস্তুর বিশিষ্টতা।

স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ দেশ, স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ কাল আইনস্টাইন মানলেন না। তিনি দেশ ও কাল অভিন্নভাবে জুড়ে দিলেন, এনে দিলেন দেশ ও কালের সমবায় বা যৌগপত্য, আর দিলেন বস্তু (অথবা বস্তুগোষ্ঠী বা মণ্ডলী) অনুসারে এই দেশ-কাল-সমবায়ের বহুত্ব। অবশ্য এই বস্তুর বহুত্বের ঐক্যসাধন বা সমীকরণ করা চলে কিন্তু তা হল একটি গাণিতিক সূত্র মাত্র— গণনা বা অঙ্কক্রিয়ার জন্য তাতে সুবিধা হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব তার কিছু নাই।

এই যে বৈজ্ঞানিক বা আইনস্টাইনীয় দৃষ্টিভঙ্গী— তার অনুরূপ দৃষ্টি বহুদিন হতেই এক শ্রেণীর দার্শনিককে প্রভাবান্বিত করে এসেছে। তাঁরা বলেছেন বাহ্যজগতের যে খবর সাক্ষাৎ মানুষের কাছে আসে তা হল অসংখ্য খণ্ডিত ব্যষ্টির পুঞ্জ— ইন্দ্রিয় তাদের এক এক করে নিয়ে আসে, পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু সে-সবকে সাজিয়ে গুছিয়ে রূপ দেয় মানুষের মনবুদ্ধি-চেতনা। যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বাহ্যজগতে আমরা দেখি তা বাহিরে আছে কি না জানা যায় না, তা হল ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের দান।

জর্মন দার্শনিক কাণ্ট সিদ্ধান্তটিকে এমন সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন যে তা একটা মহাবাক্যে পরিণত হয়েছে। তা হল এই যে, দেশ ও কাল মানুষের দুটি চোখ বা চোখের চশমা, এর ভিতর দিয়ে সে দেখে বিশ্বকে, এ ছাড়া বিশ্বকে সে দেখতে পারে না। দেশ ও কাল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কিছু নয়, তা হল দ্রষ্টার মস্তিষ্কে দুটি ছাঁচ যার ভিতরে বাহিরের জগৎটা আকার গ্রহণ করে। জগৎ বা বস্তু নিজস্ব স্বরূপে কি তা জানবার উপায় নেই, জানবার যন্ত্র হল যা তার মূল গুণ হল দেশ ও কাল— মানুষ যা দেখে তা এ দুটির আয়তনে ছড়িয়ে পড়ে, সজ্জিত হয়ে দেখা দেয়। ভারতীয় মায়াবাদী বৈদান্তিকেরও অনেকটা ঐ মতই দাঁড়ায় শেষে— তিনি মায়াদৃষ্টিকে এক পা পিছনে সরিয়ে নিয়েছেন মাত্র। কাণ্ট মনবুদ্ধিকে রাজা করে দেশ-কালকে তার মুখ্য-মন্ত্রী বা দণ্ডবিধি করে সাজিয়েছেন— মায়াবাদী অহং বা অহং-প্রত্যয়গত ব্রহ্মকে সম্রাট করে চিৎশক্তিকে (দেশ ও কাল যার বাহ্য আয়ুধ বা ঐশ্বর্য) করেছেন সৃষ্টিপ্রসারের উৎস।

দার্শনিক তাহলে দেশ-কালকে মনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তার ধর্ম, গুণ-কর্ম যা দিয়েছেন তাতে জড়েরই প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম হতে বাধ্য, কারণ, বৈদান্তিকেরা যেমন বলে থাকেন জগৎ বা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন সত্তা হল 'ব্যাবহারিক' সত্য, আর সাংখ্যের মতে মন, সমস্ত প্রকৃতিই হল জড় বা অচিৎ— এক ব্রহ্ম বা পুরুষই, প্রকৃতির অতীতে বা বাহিরে যে সৎবস্তু তাই, চিন্ময়।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন দেশ ও কালের যে প্রকৃতি দেখিয়েছেন তা যত নূতনই হোক জড়ের কাঠামোকে ছাড়িয়ে যায় নি। এমন কি তাঁর দেশ প্রাচীন জ্যামিতিক প্রসারের সমধর্মী মূলত, এবং কালও তদনুরূপ বিভাজ্য পরিমাণগত বস্তু। জড়ের মত উভয়কেই কাটা যায়, ছাঁটা যায়, মাপ করা যায়। আইনস্টাইন ওজনের বাটখারা শুধু বদলে দিয়েছেন কিন্তু ওজন রেখেছেন পুরোমাত্রায় প্রাচীনপন্থীর মতই। দেশ-কাল-সমবায় (Space-Time-Continuum) জড়প্রসার এবং জড়প্রসারের স্পন্দন, এই তো সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়।

বের্গসন তাই বলেছেন যে জড়ের ধারা নিয়ে থাকলে চলবে না—জড় নিয়ে থাকলে গতির অর্থ হবে

একিলিস-কচ্ছপ-গতি অর্থাৎ আনর্থক্য। এই সত্যটি ভালো করে ধরতে হবে গতি অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গতি— পর পর সাজানো বিন্দু নয়, একটানা প্রবাহ। কাল এই সত্যের বিশেষ প্রতীক। কালকে মুহূর্ত-সমষ্টি হিসাবে আমরা দেখি, আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে। ঘণ্টা-মিনিট বাস্তবকালে কিছু নাই। বাস্তব-কাল টানা স্রোত— আসল সত্য হল এই নিরবচ্ছিন্নতা (*durée réelle*), কেটে কেটে যে দেখি তা হল যেন মৃতদেহের বিশ্লেষণ— শবচ্ছেদ। ফলত স্থাবর জড় নয়, জীবনধারা, প্রাণপ্রবাহ জিনিসের নিগূঢ় রহস্য। প্রাণ ছুটে চলেছে তার নিজের আবেগে, স্বতোৎসারিত প্রেরণার অখণ্ড ধারাবাহিকতায় (*élan vital*) —এই প্রেরণার প্রবেগ যেখানে যতটুকু আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের কাঠামোয় বা কর্মপ্রযোজনের ছকে এসে বাঁধা পড়েছে তখনই সে হয়ে উঠেছে আমাদের পরিচিত বৈজ্ঞানিকের খণ্ডিত জড়ভূত জড়ধর্মী দেশকাল। প্রাণের দেশকাল জড়ের দেশকাল হিসাবের বাহিরে, তার সত্যকার স্বরূপ ; জড় হল প্রাণের স্থির মৃত খণ্ড, প্রক্ষিপ্ত অবয়ব।

বের্গসন যে একটা নূতন পর্যায় এনে দিলেন দেশকালের, তা থেকে আমরা আরো কিছু এগিয়ে যেতে পারি। সৃষ্টির মধ্যে যে কেবল জড়ার প্রাণ আছে তা নয়— মন আছে, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) আছে, সত্তার ও চেতনার নানা স্তর আছে, প্রাচীন ঋষিরা বলে গেছেন। অধুনিক দ্রষ্টারা নীচের দিকে কয়েকটি আবিষ্কার করেছেন মাত্র, আরো নীচে আরো উপরে বহুতর স্তর আড়ালে রয়েছে অদৃশ্য আলো বা অশ্রুত ধ্বনির মত। এই প্রত্যেক স্তরের রয়েছে নিজস্ব প্রসার ও স্থায়িতা— অর্থাৎ দেশ ও কাল। আইনস্টাইন যে বলেছেন প্রত্যেক বস্তু বা ব্যষ্টিমণ্ডলীর রয়েছে পৃথক পৃথক দেশ ও কাল, সেকথা আরো গভীরতর ব্যাপকতর অর্থে সত্য। তিনি যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন তা হল জড় স্তরের পার্থক্য, আর তা পরিমাণগত ; কিন্তু দেশ ও কালের গুণগত পার্থক্যও রয়েছে যখন ধরি চেতনার বিভিন্ন স্তর। জড়ের দেশকাল যেমন আছে, প্রাণের দেশ ও কাল আছে (বের্গসন যার কথা বলেছেন), মনের দেশকাল আছে (ভাববাদী দার্শনিকেরা যার কথা বলেন)— মনের উপরেও উঠে যেতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধি ও সাক্ষাৎজ্ঞানের জগতে, দিব্য চেতনার জগতে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে— দেশ ও কালের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়ে চলে তদনুসারে। অধ্যাত্ম-সিদ্ধেরা বলে থাকেন এমন চেতনা আছে যেখানে বিন্দু অর্থ অসীমতা, ক্ষণ অর্থ নিত্যতা— সান্ত ও অনন্ত অসীম ও সসীম যেখানে ওতঃপ্রোত হয়, প্রায় এক হয়ে আছে। জড় দেশ ও কালের প্রায় বিপরীত ধর্মই পেয়েছে এই লোকোত্তম দেশ ও কাল।

বৈদিক ঋষি বলছেন বাক চার শ্রেণীর— মানুষের মুখে প্রকট একটি মাত্র— সর্বশেষ শ্রেণীর। অবশিষ্ট তিনটি লোকোত্তর জিনিস, যবনিকার অন্তরালে আবৃত। দেশ ও কাল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে।

বঙ্গদেশে প্রভাকর-মীমাংসার চর্চা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মধ্যযুগে ভারতের সারস্বত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে মাত্র দুইটি শব্দ দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়— দার্শনিক সূক্ষ্মবিচার। ইহার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল বঙ্গদেশে। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া নব্যন্যায়ের চর্চা ৫০০ বৎসর (১৪০০-১৯০০ খ্রী) ধরিয়া প্রতিভার বিলাসকে এক দুরারোহ শিখরে উত্তোলিত করিয়াছিল। মিথিলার গুরুগৌরবের অবসান সূচিত করিয়া রঘুনাথ শিরোমণির সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যূন ৩৫০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সর্বত্র তর্কশাস্ত্রে বাঙালী জাতির পরম প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যযুগে শাস্ত্রচর্চায় এতটা একনিষ্ঠ সাফল্য অন্য কোনো প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার প্রামাণিক বিবরণ আমরা সবিস্তার সংকলন করিয়াছি।[১] নব্যন্যায়ের অভ্যুদয়ের ফলে বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সম্প্রদায় প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া বাংলার সারস্বত ইতিহাসকে অনেকাংশে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা দ্বারা এই অন্ধকার দূর করা আবশ্যক। নতুবা বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য সম্যক্ চিত্রিত হইতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চা পূতসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় প্রধানতঃ ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়াছে— কাব্যব্যাকরণাদি লঘুশাস্ত্র, নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়। একটি অতি বিস্ময়কর তথ্য আমরা অদ্য ভুলিতে বসিয়াছি যে, প্রাচীনকাল হইতে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসমাজ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণকে পাঠ্য করিয়া টীকাটিপ্পনী দ্বারা পরিবর্ধিত করিয়া লইয়াছে এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে গৌড়ীয় গ্রন্থসংখ্যা সমগ্র ভারতের সমষ্টিসংখ্যার অন্যূন অর্ধাংশ হইবে। পাণিনি, কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, সারস্বত ও প্রযোগরত্নমালা অদ্যাপি বঙ্গদেশে নিবিড়ভাবে অধীত হয় এবং চান্দ্রব্যাকরণও এক সময়ে হইত। মৈত্রেয় রক্ষিত-প্রমুখ বাঙালীর পাণিনীয় গ্রন্থ (ধাতুপ্রদীপ প্রভৃতি) পূর্বে বাংলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিপুল ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের যথাযথ বিবরণ সংকলিত হইলে বাঙালীর সারস্বত অবদানের ভিত্তি রচিত হইতে পারে।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দর্শনশাস্ত্রচর্চায় অধুনালুপ্ত বাঙালীর একটা অপূর্ব কীর্তির কথা নিদর্শনস্বরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রশ্ন হইল, নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের ও নব্যন্যায়চর্চার উৎপত্তির পূর্বে বাংলার সারস্বত কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ছিল এবং দর্শনশাস্ত্রের কোন্ বিভাগে বাঙালীর প্রতিভা উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের চরম প্রতিষ্ঠাকালেও বাংলার চতুষ্পাঠীসমূহে দুইটি গ্রন্থ আলোচিত হইত : চিরঞ্জীবের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী এবং কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।[২] শেষোক্ত গ্রন্থের দুইটি টীকাও বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছিল— মহেশ্বর ন্যায়ালংকার-কৃত (মুদ্রিত) ও রুদ্রদেব তর্কবাগীশ-কৃত (অমুদ্রিত)। নাটকটিতে রাঢ়দেশের ইতিহাস অন্তর্নিহিত আছে— অন্যতম পাত্র 'দক্ষিণ-রাঢ়'-নিবাসী অহংকার কাশীর পণ্ডিতদের মূর্খতা বর্ণনচ্ছলে 'সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা'মূলক ছয়জন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন

১ বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত, চৈত্র ১৩৫৮।

২ প্রবন্ধলেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ স্মার্ত রামরাম সিদ্ধান্তবাগীশ (১১৫৭-১২৩৩ বঙ্গাব্দ) স্বহস্তে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুলিপি করিয়াছিলেন (৮০ পত্র, লিপিকাল পৌষ ১৭০১ শকাব্দ)।

— প্রথম পর্যায়ে গুরু, শালিক ও মহোদধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তুতাতিত (=কুমারিল), বাচস্পতি ও মহাব্রত। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, কৃষ্ণমিশ্রের সময়ে (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) দক্ষিণরাঢ়ই ছিল বাংলার সারস্বত কেন্দ্র এবং ষড়্‌দর্শনের মধ্যে পূর্ব-মীমাংসার সূক্ষ্মবিচারমূলক প্রস্থানদ্বয়— ভট্টমত ও গুরুমত— প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশে ন্যায়কন্দলীকার বৈশেষিকাচার্য শ্রীধর ভট্ট (৯১৩ শকাব্দ) হইতে নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌমের সময় পর্যন্ত সমগ্র ষড়্‌দর্শনের চর্চাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিচারের সূক্ষ্মতা দ্বারা প্রথমতঃ মীমাংসকাচার্য কুমারিলের সম্প্রদায় এবং পরে প্রভাকর গুরুর সম্প্রদায় চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কন্দলীকার এবং সর্বজ্ঞকল্প গৌড়ীয় মহাপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকার চক্রপাণিদত্ত নয়পালদেবের (১০৪০-৫৫ খ্রী) রাজত্বকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া শেষে একটি বিস্ময়কর অভিসম্পাত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্ তত্রৈব নিঃক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥

'যে আমার গ্রন্থোক্ত অতিরিক্ত সিদ্ধযোগসমূহ বৃন্দরচিত সিদ্ধযোগগ্রন্থে নিঃক্ষেপ করে কিংবা আমার গ্রন্থ হইতে তুলিয়া দেয় তাহার মস্তকে ভট্টত্রয় ও বেদত্রয়াভিজ্ঞ মহাজনের প্রদত্ত অভিশাপ পতিত হউক'— টীকাকার শিবদাস সেন টীকা করিয়াছেন "কারিকা বৃহট্টীকা তন্ত্রটীকেতি ভট্টত্রয়ম্"। অর্থাৎ ঐ সময়ে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ ছিলেন শ্রোত্রিয়, যিনি বেদত্রয়ের সহিত কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক, চিরলুপ্ত বৃহট্টীকা ও তন্ত্রবার্তিক অধিগত করিতেন।[৩]

কিন্তু কৃষ্ণমিশ্র ভঙ্গীক্রমে সূচনা করিয়াছেন কুমারিলের সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়া বঙ্গদেশে প্রভাকর গুরুর সম্প্রদায়ই অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রভাকর মিশ্র শবরভাষ্যের উপর দুইটি পৃথক্ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। একটির নাম 'বিবরণ', ক্ষুদ্র বলিয়া নামান্তর 'লঘ্বী', পরিমাণ ৬০০০ গ্রন্থ। ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অপরটির নাম 'নিবন্ধন', নামান্তর 'বৃহতী', পরিমাণ ১২০০০ গ্রন্থ। ইহার 'তর্কপাদ' সটীক মুদ্রিত হইয়াছে। ভোজরাজার 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' (১১শ প্রকাশ) একটি শ্লোকে প্রভাকর সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ উক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—

ধূর্তৈর্যৎ শ্বপচীকৃতো "বররুচিঃ" সর্বজ্ঞকল্পোপি সন্
জীবন্নেব পিশাচতাং চ গমিতো "ভশ্চু"-র্যদভ্যর্চ্যধীঃ।
ছন্দোগোঽয়মিতি "প্রভাকরগুরু"-র্দেশাচ্চ নির্বাসিতো
যদ্বৃত্তান্তবিজৃম্ভিতেন মহতা তৎসর্বমল্পীকৃতম্॥

নির্যাতনের প্রসিদ্ধ উদাহরণস্থল তিনজনের মধ্যে ভশ্চু ছিলেন বাণভট্টের গুরু। প্রভাকর দক্ষিণ-কোশলের লোক ছিলেন, কারণ 'বঙ্গপ্রান্তে' পরীক্ষিত একটি বৃহতীর অনুলিপিতে পুষ্পিকা ছিল— 'ইতি শ্রীদক্ষিণ-কোশলেশ্বরমহামাত্যবিভাকরমিশ্রাত্মজস্য প্রভাকরমিশ্রস্য কৃতৌ বৃহত্যাং·।' (নয়বিবেক, মাদ্রাজ সং, প্রাস্তাবিক, পৃ. ৩৪)। 'ছন্দোগ' (অর্থাৎ সামবেদী অথবা বেদজ্ঞ) প্রভাকর কেন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত

৩ শ্রীধরের বিবরণ ও কৃষ্ণমিশ্রের উক্তি 'বঙ্গে নবান্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃ. ৬-৮) দ্রষ্টব্য। চক্রপাণি দত্ত স্বয়ংই নয়পালের সভায় ছিলেন, তাঁহার পিতা নহে (I. H. Q., XXIII, 131-5)—এবিষয়ে সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

হইয়াছিলেন বুঝা গেল না। প্রভাকর কুমারিল ভট্টের পরবর্তী, অথচ মণ্ডন মিশ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন। মণ্ডনের 'বিধিবিবেক' গ্রন্থে প্রভাকরের উভয় গ্রন্থেরই বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৯৬, ১০৯ ও ৪১৩) এবং একস্থলে (পৃ. ২৮১) 'অলং গুরুভির্বিবাদেন' বলিয়া প্রভাকরের প্রতি গুরুগৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবাবিষ্কৃত উম্বেক ভট্ট (অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ ভবভূতি) রচিত শ্লোকবার্তিকের তাৎপর্যটীকায় প্রভাকর সর্বত্র 'অনুপাসিতগুরু' পদে অভিহিত হইয়াছেন (পৃ. ১৪,৩০,৩৩ প্রভৃতি)। এই পদের উৎপত্তি-সূচক আখ্যায়িকা বর্তমানে জানিবার উপায় নাই— সম্ভবতঃ স্বীয় গুরু কুমারিল ভট্টের সহিত উৎকট মতবিরোধজনিত এই বিদ্রূপাত্মক পদ হইতেই তাঁহার 'গুরু'-নাম রূঢ়িপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভট্টমত ও গুরুমতের নানা বিষয়ে পার্থক্য এখন প্রকরণপঞ্চিকা, প্রভাকরবিজয়, মানরত্নাবলী প্রভৃতি মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। মীমাংসাদর্শনের মূল 'অধিকরণ'বিভাগে ভট্টমতে ও গুরুমতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই— অধিকরণ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বিচারের) সংখ্যা এক সহস্র, যদিও মাধবাচার্যের 'ন্যায়মালাবিস্তারে' ৯০৭ অধিকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই ভট্ট ও প্রভাকরের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং কোনো কোনো 'গুরুমত' এখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে চিরস্থায়ী বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা দুইটিমাত্র মত নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। বাক্যার্থ বিষয়ে কুমারিলের সম্প্রদায় 'অভিহিতান্বয়বাদী' অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা এই মতে বাক্যগত পদসমূহের পদার্থমাত্রই প্রতীত হয় এবং তাৎপর্য নামক পৃথক্ বৃত্তি দ্বারা অন্বয়াংশ পরে প্রতীত হইলে বাক্যার্থের উপলব্ধি হয়। প্রভাকর হইলেন 'অন্বিতাভিধানবাদী' অর্থাৎ অন্বয়াংশও অভিধাবৃত্তিলভ্য বটে। কাব্যপ্রকাশের বাঙালী টীকাকার পরমানন্দ ভট্টাচার্যচক্রবর্তী "বাচ্য এব বাক্যার্থঃ" পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন— "অভিধয়ৈবান্বয়-বোধোপপত্তৌ কিং বৃত্ত্যন্তরেণেতি অন্বিতমেবাভিধত্তে ইতি বাদিনঃ প্রভাকরগুরোর্মতমিত্যর্থঃ'। এস্থলে উভয় মতের পরিষ্কার প্রণালী কালক্রমে অতি সূক্ষ্মস্তরে উঠিয়াছিল।

'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে পূর্বপক্ষকারীর আপত্তি, অন্যপর ও অবিবক্ষিতার্থ বলিয়া 'স্বাধ্যায়োঽধ্যে-তব্যঃ' এই বিধিবাকের 'ভাব্য' অর্থাৎ ফল বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না এবং শাস্ত্রারম্ভের সার্থকতাই নাই। কুমারিলের মতে ঐ বিধিবাক্য দ্বারাই বেদাধ্যয়ন বিহিত হয়—'স্বাধ্যায়'-পদ বৃত্তিকার উপবর্ষাদির ব্যাখ্যাবলে 'প্রাপ্য'-কর্ম রূপে গ্রহণীয় (নির্বর্ত্য ও বিকার্য কর্ম নহে)— এইভাবে শাস্ত্রারম্ভও সার্থক হয়। প্রভাকর এস্থলে সূক্ষ্মবিচারের অবতারণা করিয়া বলেন, স্বর্গাদি ভাব্য (অথবা ফল) নিশ্চয়ই বেদাধ্যয়নরূপ কার্যের প্রয়োজক নহে— যাগাদি বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যে 'অপূর্ব'-নামক অতীন্দ্রিয়বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই প্রয়োজক। অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির লোভে যাগাদি কর্তব্য নহে, বেদোক্ত বিধিবাক্যদ্বারা বিহিত বলিয়াই তাহা কর্তব্য। যাগানুষ্ঠান একজন কর্তা বিনা হয় না এবং 'অধিকার' বিনা কর্তৃত্বও ঘটে না। 'এই কার্যে আমিই প্রভু'— এবম্বিধ প্রভুত্ববোধই অধিকার পদের অর্থ ('অস্মিন্ কর্মণ্যহমীশ্বর ইত্যেবমৈশ্বর্যলক্ষণোঽধিকারঃ'— ন্যায়সিদ্ধি পৃ. ৮)। পক্ষান্তরে 'নিযোজ্য' বিনা অধিকার-সিদ্ধি হয় না— 'ইহা আমার কর্তব্য' এইরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তি নিযোজ্য ('মমেদং কর্তব্যমিতি বোদ্ধা নিযোজ্যঃ', ঐ)। স্বর্গ-পুত্রাদি কামনা নিযোজ্যের বিশেষণরূপেই গ্রাহ্য। সুতরাং ৮ বৎসরের মাণবকের বিষয়ে বেদাধ্যয়নে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' বিধিবাক্য তাহার বোধগম্য নহে। প্রভাকরের মতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন 'আচার্যকরণ' বিধিদ্বারা প্রযুক্ত এবং এই বিধির অনুমাপক হইল মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ শ্লোক—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্-দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥ ২।১৪০

এস্থলে স্মৃত্যনুমিত বিধিবাক্য হইবে 'শিষ্যমুপনীয় বেদাধ্যাপনেনাচার্য্যকং ভাবয়েৎ'। নব্য-প্রাভাকরের মতে, 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত' ইহাই আচার্যকরণবিধি। এই বিধির প্রয়োগ দ্বারা মাণবকের বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান হইতে ক্রমে অধিকারবোধ ঘটে। প্রাচীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে প্রভাকরের অভিনব যুক্তি বর্তমান প্রগতির যুগেও আলোচনা যোগ্য। প্রভাকরের মতে যাহা বেদবাক্য তাহাই কর্তব্য, কুমারিলের মতে ফলবৎকর্মাববোধ বিনা কর্তব্যতা বুদ্ধি জন্মে না। সুতরাং প্রভাকরমত ছাত্রদের বশ্যতাবুদ্ধির (discipline) পরিপোষক এবং ভট্টমত তাহার বিরোধী বলা যাইতে পারে।

প্রভাকরমতের দুইজন ভারতবিশ্রুত মহাপণ্ডিত ও গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শালিকনাথ গুরুমতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম টীকাকার— তিনি বৃহতীর উপর 'ঋজুবিমলা', লঘ্বীর উপর 'দীপশিখা' এবং 'প্রকরণপঞ্জিকা' ও 'ভাষ্যপরিশিষ্ট' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় ও ঋজুবিমলার তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে এবং দীপশিখার শেষাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালাবার অঞ্চলে একটি চমৎকার শ্লিষ্ট শ্লোক প্রচারিত আছে—

শালিকনাথবদ্-মূঢ়ো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
প্রভাকরপ্রকাশায় যেন দীপশিখা কৃতা॥

শালিকনাথ স্বয়ং তাঁহার টীকাদ্বয়কে 'পঞ্চিকা'-পদে উল্লেখ করিয়াছে ('পঞ্চিকাদ্বয়ে প্রপঞ্চিতম্'— প্রকরণ-পঞ্জিকা পৃ. ৪৬) এবং পঞ্চিকাকার পদে মীমাংসকেরা একমাত্র শালিকনাথকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহার কালনির্ণয় করা কঠিন— প্রভাকরের সাক্ষাৎ শিষ্য হইলে (প্রকরণপঞ্জিকার ২য় প্রকরণের আরম্ভে 'প্রভাকরগুরোঃ শিষ্যৈস্তথা যত্নো বিধীয়তে' তাহাই সূচনা করে) তাঁহার অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় ৭৫০-৮০০ খ্রী.। উদয়নাচার্য (খ্রী. ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ) অনেক স্থলে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিরণাবলীর তেজঃ প্রকরণে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে ('কেচিত্তু সংসর্গিদ্রব্যতয়া নিঃসরদেব নায়নং তেজঃ ·ইতি সমাধানমাহুঃ'— সোসাইটি সং পৃ. ২৮৮)— বর্ধমানের মতে তাহা 'শালিকমত' বটে। কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নের একটি অদ্ভুত বিদ্রূপোক্তি ('ভবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্বাদিবাক্যেষু অপৌরুষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়ঃ') ব্যাখ্যা করিয়া কাশ্মীরনিবাসী বরদরাজ লিখিয়াছেন— 'গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ, গৌড়ো হি বেদাধ্যয়নাভাবাদবেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসক ইত্যুক্তম্' (কুসুমাঞ্জলিবোধিনী, পৃ. ১২৩)। মন্বাদি স্মৃতি বাক্যের শ্রুতিভিন্নত্ব শালিকনাথ জানিতেন না, ইহা অসম্ভব উক্তি এবং প্রতিপক্ষভূত প্রতিবেশী বিদ্বৎসমাজের প্রতি যুক্তিহীন আক্রমণ মাত্র বলিয়া মনে হয়।

প্রভাকরমতের দ্বিতীয় গ্রন্থকারের নাম মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র— মণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় শব্দখণ্ডে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া 'শব্দমণি-পরীক্ষা' নামক এক অতি দুর্লভ টীকাগ্রন্থে আমরা উক্তি দেখিয়াছি ('অয়ঞ্চ সিদ্ধান্তবিরোধঃ প্রভাকরং প্রতি ন তু মিশ্রং তেনাখ্যানামেবাত্র দেবতাত্বাস্বীকারাৎ, তন্মতস্ত বক্ষ্যমাণচন্দ্ররাদ্ধান্তদূষণেনৈব দূষিতমিত্যুপেক্ষিতম্।' কাশীর সরস্বতী ভবনের পুথি ১১৮ পত্র)

শঙ্কর মিশ্রের বাদিবিনোদ, পদ্মনাভের সেতুটীকা (পৃ. ১০৫) প্রভৃতি গ্রন্থে 'প্রাভাকরৈকদেশী' একাদশ পদার্থবাদী চন্দ্রের মতোল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্রচিত দুইটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে 'অমৃতবিন্দু' প্রকরণ (সোসাইটির অতি অশুদ্ধ পুথি, পত্রসংখ্যা ৪৯) ও 'নয়রত্নাকর'।[৪] অমৃতবিন্দুতে অপূর্ববাদ ও বিধিবাদের সূক্ষ্ম বিচার আছে— নিবন্ধন (৩৬।২, ৪৮।১-২ পত্র), বিবরণ (২৩।১, ৩৬।২ ও ৪৮।২ পত্র) ও প্রকরণ-পঞ্জিকা (৩৪।১ পত্র) ব্যতীত এক স্থলে মহাব্রতের (৪৫।১ পত্র) নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। নয়রত্নাকরের শেষে তিনি কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অসৌ চন্দ্রঃ শ্রীমানকৃত নয়রত্নাকরমিমং
নিবন্ধং 'পোশালী' কুলকমলকেদারমিহিরঃ।

মিথিলার ব্রাহ্মণসমাজে পোশালীকুল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণসমাজে কাশ্যপগোত্র শ্রোত্রিয় 'পুশিলাল' বংশ সুপরিচিত। আমরা প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে এই বংশের উল্লেখ যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি— 'শৌরিঃ পোষলিরেব চ' (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, নবদ্বীপের পুথি), 'ভানুঃ পোষলিরেব চ' এবং 'তিলাড়ী পোষলী নান্দী পলশাঞিস্তথৈব চ' (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথি)। সুতরাং রাঢ়দেশে অবস্থিত পোশলীগ্রাম হইতে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে এবং জীমূতবাহন ও ভবদেবের ন্যায় চন্দ্রও রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ছিলেন। আমরা নয়রত্নাকর গ্রন্থ অদ্যাপি পরীক্ষা করিতে পারি নাই। এই গ্রন্থে পঞ্জিকা ও বিবরণ ব্যতীত 'বিবেক' (অর্থাৎ ভবনাথ-রচিত নয়বিবেক) ও শ্রীকরের নামোল্লেখ আছে।[৫] সুতরাং চন্দ্রের অভ্যুদয়কাল খ্রী. দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন নয় বিবেককার ভবনাথও বাঙালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়— প্রবোধচন্দ্রিকার অভিজ্ঞ টীকাকার নাগিল্লগোপ 'ভবনাথবৎ' ও 'ভবদেববৎ' পদদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে যেভাবে যোজনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐরূপ অনুমানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কৃষ্ণমিশ্রের সময় হইতে রাঢ়দেশে প্রভাকরমীমাংসার চর্চা ক্রমবর্ধমান গতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করে। উৎকলনিবাসী সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতামহানুজ কবিপণ্ডিত চণ্ডিদাস কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা' টীকা রচনা করেন (খ্রী. ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)। পঞ্চমোল্লাসের টীকা হইতে চণ্ডিদাসের একটি কৌতুকজনক সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল—

'ন চ সামান্যয়োঃ পরস্পরমন্বয়ঃ সম্ভবতি, ব্যক্তিদ্বারকান্বয়স্তু ব্যক্তীনামসামান্যতয়ানভিধেয়ত্বেন নিরস্ত ইতি চেৎ কিং পুনরতঃ। প্রাভাকরীয়ান্বিতাভিধানদৌর্বল্যাদিতি চেৎ কিমস্মাকমনয়া পরগৃহচিন্তয়া। যথা তথা প্রাচীনতন্ত্রাপূর্ববৃত্তিবোধ্যো বাক্যার্থ ইত্যেতাবানেব হি ধ্বনিতন্ত্রসারঃ। যদি তু প্রাভাকরৈঃ সার্ধং বিজিগীষুকথাকণ্ঠদুর্দুরো দেহস্তদা তামেব মৃগয়িতুং **রাঢ়াদিরাষ্ট্রং** গচ্ছেতি ব্যঙ্গ্য এব সর্বো বাক্যানামর্থ ইতি নির্বিবাদমতঃ।'[৬]

শঙ্খধর রণরঙ্গমল্ল মহামণ্ডলিকাধিরাজ গোবিন্দদেবের সভায় 'লটকমেলক' প্রহসন রচনা করেন— সাহিত্যদর্পণে (৩।২১৯) একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক ('গুরোর্গিরঃ পঞ্চদিনান্যপাস্য' ইত্যাদি) এই লটকমেলক হইতে (২।১৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরবর্তী শ্লোকটি এই—

---

৪ Sastri : *Nepal Cat*, 1905, p. 113

৫ Jha Comm. Vol, p. 245

৬ সোসাইটির অতিজীর্ণ তালপত্র পুথি, ৪ পত্র।

তথা হি রাঢ়ীয়া বচনরচনা,
এষ ব্যাকরণং ন বেত্তি ন কৃতঃ কাব্যেষ্বনেন শ্রমঃ
শ্রুত্বাচামতি ভট্টবার্তিকগিরঃ স্নাতি স্পৃশংস্তদ্বিদঃ।
চাণ্ডালানিব তর্কশাসনপটূন্ নৈয়ায়িকান্ মন্যতে
রাঢ়ীয়ৈরতিহর্ষগদ্গদগলৈঃ প্রাভাকরঃ শ্রূয়তে ॥[৭]

পরবর্তীকালে নব্যন্যায়ের অপূর্ব আকর্ষণের সহিত ইহার তুলনা হয়।

প্রভাকরমতাবলম্বী বহু বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শূলপাণির পূর্ববর্তী বিখ্যাত গৌড়ীয় স্মৃতিনিবন্ধকার নারায়ণোপাধ্যায় স্বয়ং ছিলেন "প্রভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্তিঃ" এবং তাঁহার পিতা গোন ও পিতামহ উমাপতিও প্রাভাকর ছিলেন। উত্তর রাঢ়ের এই বিশিষ্ট পণ্ডিতগোষ্ঠীর বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি।[৮] চক্রপাণি দত্তের প্রাচীন টীকাকার রামপালের অধীন বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর একস্থলে ছুরাধিকরণন্যায়ের আলোচনা দ্বারা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতপূর্ব 'বররুচি' নামক প্রাভাকর আচার্যের একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'অত্রার্থে বররুচিঃ—
প্রাচীনং যত্তু যজ্ঞস্য তেনোপাংশ্বিতি চান্বয়ঃ।
বীপ্সা-তেনেতি শব্দাভ্যাং ব্যবধান্ন তথান্বয়ঃ ॥'

ব্যাখ্যা শেষে আছে 'ছুরাধিকরণন্যায়ঃ প্রাভাকরাণাম্'।[৯] ৩৫ বৎসর পূর্বে রাজসাহীতে পূর্বনৈষধের একটি সুপ্রাচীন টীকা আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার শ্রীবৎসেশ্বর (সংক্ষেপে শ্রীবৎস) পিতৃপরিচয় দিয়াছেন 'মীমাংসাহৃদয়াধিদৈবতমভূদ্ যঃ শ্রীনৃসিংহঃ কৃতী' (নবম সর্গের শেষে) এবং 'গুরুনয়বিদাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সভাসু বিপশ্চিতাম্' (অষ্টম সর্গের শেষে)। সুতরাং ইহাও একটি প্রাভাকর গোষ্ঠী এবং সম্ভবতঃ বাঙালী। মীমাংসাদর্শনের এবং বিশেষ করিয়া প্রভাকরমতের চর্চা বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রায় ১৪০০ খ্রী. বিলুপ্ত হইতে থাকে— ইহার কারণ দুইটি, গঙ্গেশের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা এবং তন্ত্রমতের প্রাবল্যহেতু বেদচর্চা ও আনুষঙ্গিক মীমাংসাদর্শনের প্রচারসংকোচ। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রধানতঃ গুরুমতেরই খণ্ডন।

---

৭ কাব্যবালা সং, পৃ. ২২

৮ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৬-১৭।

৯ রত্নপ্রভা, পুণার পুথি, ১৫৩ পত্র, Indian Historical Quarterly, XXIII, p. 147

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস বৈষ্ণবপদাবলীর যুগ্ম কবি। কিন্তু কবিপ্রতিভার স্বরূপবিচারে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য কিছু কম নয়। চণ্ডীদাসকে বলা যায় খাঁটি গীতিকবি, আর বিদ্যাপতির গীতিপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় কলাকৌশলবোধ। এই নাট্যধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন— বিদ্যাপতির রাধিকা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেখানেই বিদ্যাপতির নাট্যশিল্পপ্রবণতার প্রতি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আত্মনিষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানাভঙ্গীতে নানা আবেশে আস্বাদন যদি গীতিকবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়, চণ্ডীদাসকে তাহা হইলে খাঁটি গীতিকবি বলা যায়। আর বস্তুনিষ্ঠতা ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ বা বিবর্তনই যদি নাট্যকলাকৌশলের মূল কথা হয়, বিদ্যাপতির পদাবলীকে তাহা হইলে গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। আত্মনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সাহিত্যের দুইটি ভঙ্গী। আত্মনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে বিষয়ী, বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়ী গৌণ, বিষয়ই মুখ্য। প্রথমটির সার্থক উদাহরণ গীতিকবিতা, দ্বিতীয়টির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য। চণ্ডীদাসের আত্মনিষ্ঠতা এবং বিদ্যাপতির বস্তুনিষ্ঠতা, চণ্ডীদাসের গীতিপ্রবণতা এবং বিদ্যাপতির নাট্যকলা-কৌশলবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন রহিয়াছে উভয়ের রাধিকাচরিত্র-পরিকল্পনায়।

কবি চণ্ডীদাস নিজে এবং চণ্ডীদাসের রাধিকা মূলতঃ অভিন্ন। স্রষ্টা আর সৃষ্টি সেখানে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর চণ্ডীদাসের কৃষ্ণসেবাবাসনার ব্যাকুল আবেগ রাধিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকা তাই কবিরই মানস-প্রতিফলন। এ রাধিকা বৈষ্ণবী প্রেমের symbol; তিনি বৈষ্ণবদর্শনের মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। ইনি অশরীরী ভাববিগ্রহ বলিয়া ইঁহার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন বা বিবর্তন নাই। চণ্ডীদাস অবশ্য ইঁহাকে নানা অবস্থায় কল্পনা করিয়া নানা ভঙ্গীতে ইঁহার লীলা আস্বাদন করিয়াছেন। তবু পূর্বরাগের রাধিকা, মিলনের রাধিকা আর বিরহের রাধিকা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। ইঁহার অবস্থা-পরিবর্তন জলের আধার-পরিবর্তনের অনুরূপ। আমরা আদিতে তাঁহাকে যেভাবে দেখি পরিণতিতেও তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখি। তাঁহার পূর্বরাগ উচ্ছ্বাসহীন, মিলনও উল্লাসহীন। তাঁহার পূর্বরাগ-মিলন-অভিসারের উপর বিরহের কালোছায়া প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে পরম বিষাদময়ী করিয়া তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিণী-বিষাদপ্রতিমা। তাই প্রথম পূর্বরাগের সময় দেখি—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্বেই রাধিকার যে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ পর্যন্ত সেই ক্রন্দনের জের চলিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রাধিকার কেন্দ্রস্থ ভাবটি এই— যাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাই মানসসাগরের অগমতীরে তাঁহার বাস, তাঁহার সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া ? তাই রাধিকা 'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নতারা'। এ প্রেমে যে আর্তি তাহা তো মিলনেও মিটিবে না, উভয়ের মধ্যে যে চিরবিরহের অশ্রুলবণাম্বুরাশি উদ্বেল, ক্ষণিক মিলন তাহার উপর সেতু রচনা করিবে কেমন করিয়া ? তাই 'দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। চণ্ডীদাসের রাধিকা এই ভাবেরই বিগ্রহ।

বিদ্যাপতির রাধিকা কোনো বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাঁহার চরিত্র আছে। তিনি রূপৈশ্বর্যে মূর্তিমতী। তিনি কবির মানস-প্রতিফলন নন, কবি তাঁহাকে দূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার শুধু পরিণতিটুকুই আছে। বিদ্যাপতির রাধিকার সূচনাও আছে পরিণতিও আছে, এবং সূচনা হইতে পরিণতি পর্যন্ত সেই চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানা স্তর আছে। এইখানেই বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। পরিণতিতে বিদ্যাপতির রাধিকাও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, নানা মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা, নানা অশ্রুহাসির দোলা। বয়ঃসন্ধিতে যে রাধিকা 'মেঘমালা সঁয় তড়িত লতাজনি', যাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'গেল চলি কামিনী গজহুগামিনী', সেই বিদ্যুল্লেখাসম চঞ্চলসৌন্দর্যপ্রতিমাকে পরিশেষে দেখিলাম 'মলিন কুসুম তনু চীরে, করতল কমল ঢর নীরে'। বিদ্যাপতি কুশল-নাট্যকারের মত তাঁহার রাধিকাকে ক্রমশ এই পরিণতির পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ক্রমশ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই রাধিকার বাহিরের রূপপরিবর্তনের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসিয়াছে। বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধিকা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার মানস-বিকাশের সূক্ষ্ম স্তরগুলি স্পষ্ট ধরা পড়িবে। এ দিক দিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহ-খণ্ডে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার অশ্রুপ্লাবনে 'কালিনী নই' কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল দান-খণ্ড বান-খণ্ডের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা এবং বিদ্যাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের রাধিকার সেখানে শুরু।

বর্তমান আলোচনায় বিদ্যাপতির নায়িকার মানস-বিকাশের ধারাটি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ের পদ এই আলোচনার বিষয়ীভূত করা সম্ভব হইবে না ; তাহা হইলে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতির অভিসার এবং বিরহ -পর্যায়ের পদগুলির বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রাধিকার মানস-পরিবর্তনের স্তরগুলির প্রতি ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করা হইবে। আশা করা যায়, ইহাতেই বিদ্যাপতির নাট্যপ্রতিভার আভাস পাওয়া যাইবে।

২

অভিসারের পরিকল্পনায় বিদ্যাপতির মৌলিকত্ব না থাকিলেও অভিনবত্ব আছে যথেষ্ট। ভাগবতপ্রমুখ পুরাণ-রচয়িতারা সাংকেতিকতার তির্যক পথ অবলম্বন না করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ঐশী মহিমা অত্যন্ত সরল প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেবই সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে পূর্ণ মানবিকতার

স্ফুরণ করাইয়া মানবীয় প্রেমের পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন স্তর-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ প্রেমেও আর্তি আছে, ঘাতপ্রতিঘাত আছে, মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা আছে। ভাগবতকার রাধাকৃষ্ণের যে লীলাকে কেবলমাত্র শুষ্ক ধর্মাবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন জয়দেব তাহাকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংঘাতসংকুল মানবমনের সনাতন হৃদয়বৃত্তির সহিত সংযোগ ঘটাইয়া ইহাকে ভক্ত ও রসিকের হৃদয়তীর্থে স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার অভিসারযাত্রার বিবরণ অনুসরণ করিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমে সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছেন, কৃষ্ণের যে সর্ববিলোপী আকর্ষণ এবং রাধিকার যে নিবিড় প্রেমাবেশ এই পর্যয়ের পদগুলির মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে তাহা পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের আদর্শ। কিন্তু জয়দেবের কাব্যেও অভিসারের অধ্যাত্মব্যঞ্জনাটি অতিপল্লবিত সৌন্দর্যবর্ণনার এবং সুললিত শব্দঝংকারের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। অভিসারের মধ্যে প্রেমের যে চিত্র ফুটিয়া ওঠে তাহাতে স্নিগ্ধ ভাববিহ্বলতা নাই, আছে অপ্রতিরোধনীয় উত্তেজনা এবং গতি। অভিসারের বর্ণনার ভিতর দিয়া সেই গতি প্রেমিক-প্রেমিকার সেই অসীম দুঃসাহসিকতার আভাস ফুটিয়া ওঠা চাই। পরিবেশ-বর্ণনার ভিতর দিয়া এই মূল সুরটি স্ফুটতর হইবে, নতুবা প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের মধ্যে যদি কেবল ঘুমপাড়ানি স্নিগ্ধতাই প্রধান হয়, অভিসারের মূল উদ্দেশ্য তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে না। সে বিচারে জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব বেশি।

বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর পদগুলির ভিতর দিয়া নায়িকার মানস-পরিবর্তনের কতকগুলি স্তরও আবিষ্কার করা যায়।—

১॥ কতকগুলি পদে আছে অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতির বর্ণনা। পদসংখ্যা ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩ প্রভৃতি।[১] এই শ্রেণীর পদগুলিতে অভিসারে যাইবার জন্য রাধিকার সুচতুর সখীবৃন্দ রাধাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন অভিসারের প্রকৃষ্ট সময় কখন, অভিসারের জন্য কখন কি পরিচ্ছদ-ভূষণ পরিধান করিতে হয়, কিভাবে অঙ্গসজ্জা অলংকরণ করিতে হয়, কিভাবে নূপুর ও মেখলার মুখরতা রোধ করিতে হয়,— এইরূপ নানা বিষয়ের উপদেশ দিয়া রাধিকাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

এই পদগুলিতে রাধিকার প্রতি সখীবৃন্দের উক্তি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, রাধিকা তখন অভিসারে যাইবার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। গুরুপরিজনের ভয় তখনও তাঁহার হৃদয় কম্পিত করিতেছে। অভিসারোপযোগী অঙ্গসজ্জাতেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা এবং এই বর্ষা-রজনীতে প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়া নায়কের সঙ্গে মিলিত হইতেও তিনি অনিচ্ছুক। মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল নয় যে লোকলজ্জা এবং পথভীতি দূর করিতে পারে। অভিসার-যাত্রার অনিচ্ছা প্রকাশ্যে কোথাও ব্যক্ত না হইলেও সখীদের পুনঃপুনঃ অনুরোধেই ইহা অনুমান করা যায়। আবার কৃষ্ণের আকর্ষণ তাঁহাকে স্থির থাকিতেও দিতেছে না, 'জীব সয়ঁ তৌলল গরুঅ সিনেহ'— প্রাণের চেয়ে স্নেহ তাঁহার কাছে বড় মনে হইল, তাই 'বাটভুয়ঙ্গম উপর পানি' উপেক্ষা করিয়া তিনি অভিসারে চলিলেন, কিন্তু 'চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই গুরুজন ভবন দুয়ার'; শুধু তাই নয় 'অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই, কাঁপই নীল নিচোল'।

---

১ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'

এগুলিকে ঠিক অভিসারের পদ বলা যায় না, অভিসারের মূল অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাটি দুর্জয় প্রেমের আবেগ এবং রাধিকার অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যঞ্জনা এ শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই। অভিসারিকা রাধিকার যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত এ পদগুলির মধ্যে রাধিকার সে রূপের প্রকাশ কোথায়? এ রাধিকা লজ্জানম্র, ব্রীড়াসংকুচিত, কিন্তু অভিসারিকা রাধিকা অসমসাহসিকা, প্রচণ্ড আবেগে উল্কাগতিতে পথের সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ছুটিয়া যান নায়কের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায়। মূল ভাবব্যঞ্জনার সহিত নিঃসম্পর্কিত হইলেও পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে আলোচ্য পদগুলি অভিসারের অপরিহার্য অঙ্গ।

২॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে সেগুলির মধ্যে রাধিকার দ্বন্দ্বমথিত চিত্তখানি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭২ ইত্যাদি। একদিকে কৃষ্ণের প্রেম, আর-একদিকে কুলগৌরব। কৃষ্ণের প্রেম— অমোঘ তাহার আকর্ষণ, সে আকর্ষণকেও উপেক্ষা করা যায় না। আবার পতিব্রতাধর্ম, লৌকিক সংস্কার, লোকলজ্জা, নিন্দা-ভর্ৎসনার ভীতি তাহাও-বা বিসর্জন দেওয়া যায় কি করিয়া। অবশেষে সর্ববিধ্বংসী প্রেমই জয়ী হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বক্লিষ্ট রাধিকার আন্তর-চিত্রখানি কবি অত্যন্ত কৌশলের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন—

কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
বচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ॥

এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে কৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ, ইহার ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের প্রগাঢ়তা বিশেষভাবে দ্যোতিত হইয়াছে—

ও ভরে লাগল নব সিনেহা
এঁ ভরে কুলকগারি।
সকল পেম সম্ভারি না হোএত
হঠ বিনাসতি নারি॥

এই শ্রেণীর পদ সংখ্যায় কিছু কম নয়। এগুলিকে যথার্থ অভিসারের পদ বলা যায়। অভিসারে পথের দুঃসাহসিক বর্ণনাটাই মুখ্য নয়— রাধিকার অন্তর্জগতের যে বিলোড়ন, পশ্চাতের বন্ধন এবং সম্মুখের আকর্ষণ, এই সমাধানহীন সমস্যার পীড়নে রাধিকার যে করুণ আর্তি তাহাও মূল অভিসারের পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অভিসার-পর্যায়ের অন্য পদগুলি যদি বাহ্যিক অভিসারের পদ বলিয়া নামকরণ করি, এগুলিকে তাহা হইলে বলা যায় মানস-অভিসারের পদ। এই মানস-অভিসারের বর্ণনা এক অদ্ভুত তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে। সে পদটি এই— 'সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার হরি রহু মানস সুরধুনী পার'। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে রাধিকার অভিসারের কথা বলা হইলেও ইঙ্গিতটি মহাপ্রভুর স্বরূপ অভিসারের দিকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং একটি তত্ত্ব। তাঁহার নিজের মধ্যেই কৃষ্ণ ও রাধার লীলা চলিতেছে—সেই লীলার যে আস্বাদন মহাপ্রভুর তাহাই স্বরূপাস্বাদন। পূর্বে রাধা-কৃষ্ণ পৃথক পৃথক কায়-ব্যূহে ছিলেন, এখন এক আধারে উভয়ে মিলিত

হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের এক অংশ কৃষ্ণ এবং অপর অংশ রাধা। মহাপ্রভুর এক অংশ কৃষ্ণ অপরাংশ রাধিকার উদ্দেশে যখন অভিসার করে তখনই হয় মানস-অভিসার। বিদ্যাপতির মানস-অভিসারের পদে অবশ্য এ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নাই, থাকিবার কথাও নয়।

দ্বন্দ্ব নাট্যকৌশলের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই শ্রেণীর পদগুলির ভিতর দিয়া রাধিকার যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দ্বারা তিনি আমাদের কাছে অধিকতর মানবিকা হইয়া উঠিয়াছেন। এবং তাঁহার চরিত্রটিও নাট্যশিল্পসম্মতভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনও আসে নাই, প্রেমের প্রথমাবস্থা পূর্বরাগেই তাঁহার প্রেমে এমন প্রগাঢ় পরিপক্কতা আসিয়াছে যে কৃষ্ণের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন। সত্য বটে, তিনি কাল-পরিবাদের জন্য কাজরের সাধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যমুনার ঘাটে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কেবলই আত্মছলনা, আত্মদ্বন্দ্ব নয়। চণ্ডীদাসের রাধিকার চিত্ত স্থির-অচঞ্চল-নির্দ্বন্দ্ব। বিদ্যাপতির রাধিকার অন্তর দ্বন্দ্বসংকুল, তাই তিনি অধিকতর বাস্তব ও মানবিক।

৩॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে, সেগুলির মধ্যে পথ এবং প্রতিবেশ -সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রেমের গভীরতা এবং তীব্রতা আরও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। হরির এমনি আকর্ষণ যে তাহাতে যে কেবল কুলগৌরব পতিব্রতাধর্ম লৌকিক সংস্কারের মোহ উপেক্ষা করা চলে তাহা নয়— অন্ধকার রাত্রি, অবিরাম ধারাপতনধ্বনি, দুস্তর কর্দমপিচ্ছিল সর্পসংকুল পথ, ইহার কিছুই আর পথরোধ করিতে পারে না। হরির মুরলীধ্বনি যখন কানে আসিয়া বাজে—

বাট বিকট ফণি মালা।
চৌদিস বরিসএ জলধর জালা॥
হে মাধব বাহু তরিএ নারি ভাগে।
কতএ ভীতি জোঁ দৃঢ় অনুরাগে॥

নিজ গৃহ-মন্দির হইতে দুই-চারি পা বাড়াইতেই ঘন ঘন বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। মহী জলপূর্ণ হইল। পথও বড় পিচ্ছিল। নিতম্বগুরু কতবার পড়িয়া যায়। কোনো অবলম্বন নাই, বিজলীর ছটা মেঘ দেখায়। জলধারার অবলম্বনে উঠিতে যাই। একগুণ অন্ধকার লক্ষগুণ হইল। উত্তর-দক্ষিণের জ্ঞান দূরীভূত হইল। সখী বলিতেছেন, হে সখি, তুমি ছাড়া এই নিশিতে আর কে অভিসারে আসিতে পারিত! বিকট সর্পসকল পথে ভ্রমণ করিতেছে, কর্দমাক্ত পথ, বিজলীর আলোকে পথ চলিতে হইতেছে।

বর্ষা-অভিসারের পথ ও প্রতিবেশ -বর্ণনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। ইতস্ততঃ কয়েকটি পদ পড়িলেই তাহা বোঝা যাইবে। যেমন—

কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুঅ অভিসার ন জীএ বর নারি॥
বরাহ মহিস মৃগ পালে পালায়।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায়॥
ফণি মণি দীপ ভরম দুই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ॥

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অভিসারের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, পথ ও প্রতিবেশ

-বর্ণনা সেই বিভিন্ন পর্যায়ের একটি বিশেষ পর্যায়। মনে হয়, এই পর্যায়ের কবিতায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব সর্বাধিক।

এই স্তরের পদগুলির মধ্যে দেখি রাধিকা আর পূর্বের মত ভীরু লজ্জিত নন, অভিসারে আর তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জা-সংকোচ নাই, উপরন্তু অভিসারের জন্য এতখানি কৃচ্ছ্র সাধনা করিতেছেন। রাধিকা এখন সম্পূর্ণ সপ্রতিভা। তিনি সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আজ আমি যাইব, গৃহের গুরুজনকে ভয় করিব না, আকাশ ব্যাপিয়া যদি সহস্র চন্দ্রও উদিত হয় তাহা হইলেও আমি শ্বেত বসনে অঙ্গ আবৃত করিব, ধীরে ধীরে গমন করিব। রাধিকার এই দুর্জয় প্রেমাকুলতা, এই সর্বভীতিনাশক প্রেমোৎকণ্ঠার চিত্র কতকগুলি পদে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মধ্যে এই পদটি উল্লেখযোগ্য—

নব অনুরাগিণি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান॥
জামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হিয়-উজিয়ার॥
বিঘিন বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥

৪॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে, সেগুলিতে অভিসারের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। রাধিকার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া অন্যান্য সখীবৃন্দ ননদিনী প্রভৃতি রাধিকাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং রাধিকা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। সংখ্যায় এই শ্রেণীর পদ খুব বেশি নয়।

৫॥ মূলতঃ মান-সম্বন্ধীয় কিন্তু অভিসারের সহিত সম্পর্কিত কতগুলি পদ আছে। দুর্গম পথে অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকা-রাধিকা যখন মাধবের কুঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন তখন কুঞ্জ শূন্য। মাধব নাই। কয়েকটি পদে রাধিকার এই খেদোক্তি আছে, এবং ইহার ক্রমপরিণতিস্বরূপ আরও কয়েকটি পদ আছে তাহাতে রাধিকা মান করিয়াছেন। মাধব কুঞ্জে ছিলেন না। এখন অঙ্গে নারী-উপভোগের চিহ্ন মাখিয়া রাধিকার সম্মুখে উপস্থিত। খণ্ডিতা নায়িকার মান এবং মাধবের মানভঙ্গ-চেষ্টা কতগুলি পদে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অভিসারের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

অভিসারের পূর্বপ্রস্তুতি, মূল অভিসার, অভিসারের পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্ত্য স্তরের ভিতর দিয়া বিদ্যাপতি অভিসারের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। এবং দেখা গিয়াছে এই বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া রাধা-মানস কিভাবে বিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানে বিদ্যাপতির নাট্য-শিল্পবোধের পরিচয়। নাটকে যেমন একটা সুঠাম গঠন, আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্বের ভিতর দিয়া সমগ্র ঘটনাসংস্থানের ভিতর যে একটা গভীর ঐক্য প্রকাশ পায়— কেবল অভিসারের নয়, বিদ্যাপতির প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের পদে তাহা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিরহ-পর্যায়ের কবিতায়।

বিদ্যাপতি অভিসার-যাত্রাকালে নায়িকার অঙ্গ-সজ্জা বর্ণনায় জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন— 'চরণ নূপুর উপর সারী। মুখর মেখলা কর নিবারী'। জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই 'মুখরমধীরং

ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্। চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয়নীলনিচোলম্'। সমস্ত পারিপার্শ্বিক এমন নিস্তব্ধ যে সখী রাধিকাকে বলিতেছেন যে মাধব 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপজানম্। রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্'। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বর্ণনায় বিদ্যাপতি মোটামুটিভাবে জয়দেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু ইহারই বিপরীত একটি চিত্র পাই চৈতন্য-পরবর্তী কবি জ্ঞানদাসের 'শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা' এই পদটিতে—'আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥ রবাব-খমক-বীণা সুমিল করিয়া। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া'। অভিসার একটি গোপন ব্যাপার; লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে নির্জনে নায়কের সঙ্গে গোপন মিলন-যাত্রাই অভিসার। রবার-খমক-বীণা সুমিল করিয়া কেহ অভিসারে বাহির হয় না, আর জয় জয় দিয়াও কেহ নিভৃত-কুঞ্জে প্রবেশ করে না; বলা বাহুল্য, ইহা রাধিকার অভিসার-বর্ণনার ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর নামাভিসারেরই বর্ণনা।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে পূববর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদের উপর অতি নগণ্য। বাহ্যতঃ কোনো কোনো জায়গায় জয়দেবের প্রভাব পড়িলেও (প্রতিবেশ-বর্ণনায় বা নায়িকার অঙ্গ-সজ্জা-অলংকরণে) বিদ্যাপতি জয়দেবকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্বে অভিসারিকা রাধিকার এমন দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গী আর কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই; তা ছাড়া প্রতিবেশ-বর্ণনারই বা কি মহিমা। সূক্ষ্ম খণ্ড কতকগুলি চিত্রের ভিতর দিয়া এমন অখণ্ড-সার্থক পরিপূর্ণ চিত্র আর কোনো কবি আঁকিতে পারেন নাই। সেদিক দিয়া পূর্ববর্তীদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির কবি-শক্তি অপরিসীম।

পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের উপরও বিদ্যাপতির প্রভাব প্রচুর। কোনো কোনো পর্যায়ের কবিতায় বিদ্যাপতি পরবর্তীদের সহিত তুলনায়ও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অভিসার-পর্যায়ের কবিতায়, মনে হয়, বিদ্যাপতির প্রভাব স্বীকরণ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অভিসার-বিষয়ক পদ সংখ্যায় অনেক, আশিটিরও বেশি। কিন্তু ইহার মধ্যে খাঁটি অভিসারের পদ অর্থাৎ অভিসারের মূল ভাবব্যঞ্জনা যে পদগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সংখ্যায় সেগুলি খুব বেশি নয়। অধিকাংশ পদই অভিসারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা। আবার মূল অভিসার-বিষয়ক পদগুলির মধ্যেও প্রেমের যে তীব্রগতি ঠিক যেমন ভাবে ফুটিয়া ওঠা উচিত ছিল ঠিক তেমনটি ফুটিয়া ওঠে নাই বলিয়া মনে হয়। প্রতিবেশসৌন্দর্য-বর্ণনার উপর রাধিকার প্রেমাকুলতার উপর যেন আরও জোর দেওয়া উচিত ছিল। অভিসার-পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে গতি ও আবেগ সঞ্চার করা একটু শক্ত। অভিসারিকা রাধিকাকে সচল করিয়া দেখানো যায় না, কারণ পথের কচ্ছ্র-সাধনার বর্ণনা বা গুরুকুলজনের ভয়ের কথা সমস্তই সখী বা রাধিকার উক্তির ভিতর প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে প্রত্যক্ষ ঘটনার অবতারণা সম্ভব নয়, সেখানে একমাত্র উপায় অপ্রত্যক্ষ ঘটনার উপর প্রত্যক্ষের উত্তাপ ও গতি সঞ্চার করা, যে বর্ণনা রাধা বা দূতীর স্মৃতির মাধ্যমে আসিয়া আবেগ হারায় তাহার উপর সাহিত্যিক কৌশলে কৃত্রিম আবেগ সঞ্চার করা। এই উপায়ে একমাত্র অবলম্বন চিত্ররীতির প্রাধান্য এবং নাটকীয় কৌশলে বস্তুলীন (objective) ঘটনাবিবৃতি। এই উভয় প্রক্রিয়াতেই বিদ্যাপতি সিদ্ধহস্ত; তাহার প্রমাণ আছে অন্য পর্যায়ের পদগুলিতে। কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতায় এই দুই রীতি অবলম্বন করিয়াও

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন না। গোবিন্দদাস পথের বর্ণনায় বিশেষ করিয়া চিত্র-ধর্ম এবং নাট্যকৌশলের অবতারণা করিয়া অভিসার-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য আরোপ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে এই পদটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ—

মাধব, কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিএ
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

রাধিকা যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এই বর্ণনার ভিতর দিয়া রাধিকার দ্রুত নিশ্বাস পতন-ধ্বনিটিও যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই মাত্র অন্ধকার রজনীতে যে দুর্গম পথ একাকী নারী অতিক্রম করিয়া আসিল তাহার বর্ণনা রূপকথার বর্ণনার মত নয়, ইনাইয়া-বিনাইয়া সমস্ত কিছুর উপর রং চড়াইয়া তাহার বর্ণনা করিলে চলিবে না, প্রচণ্ড গতিতে দুই-একটি অর্থপূর্ণ গূঢ়স্বচ্ছ ইঙ্গিতের সাহায্যে সমস্ত চিত্রখানিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে; কোথাও দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিবার স্থান নাই। 'তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিএ পথযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ'— পদযুগে ভুজঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল তাহাতেই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, সে ভুজঙ্গ ফণা ধরিয়া দংশন করিয়াছিল কি না, কেমন করিয়া রাধিকা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সৌন্দর্য হানিকর হইত। ইহার পর 'একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী ঘোর পহন অতিদূর'। শুধু কুলকামিনী বলিয়াই কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন, কুলকামিনীর পক্ষে অভিসারে বাহির হওয়া যে কতদিক দিয়া কত বিপদ সে কথা ভাবিয়া দেখিবার ভার পাঠকের উপর। 'একে কুলকামিনী' তাহার পর আবার 'কুহুযামিনী', শুধু তাই নয়—'ঘোরপহন অতিদূর'। অতি সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশের ভিতর দিয়া কবি সমগ্র অর্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। এ কাজ শক্তিশালী কবি ছাড়া সম্ভব হয় না। কবির অনুভূতি যখন গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয়, নায়ক-নায়িকার ভাবের দ্বারা কবি যখন আচ্ছন্ন হন, তখনই প্রকাশভঙ্গীতে এই প্রকারের স্বচ্ছতা এবং গভীরতা আসে। এই প্রসঙ্গে 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটি স্মরণ করা যায়। পদটির রচয়িতা যিনিই হউন শুধু প্রকাশভঙ্গীটি লক্ষণীয়। গোবিন্দদাসের এই পদটির সঙ্গে তুলনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, এই দুইটি পদে কবির অনুভূতি কি গভীর ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে।

এই ব্যঞ্জনাধর্মী-অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ ব্যবহার করিবার অন্য কারণও আছে। রাধিকার অভিসার-আগমনের পথকষ্টের বর্ণনা দিতেই হইবে নতুবা তাঁহার প্রেমের কৃচ্ছ্রসাধনতৎপরতার দিকটি প্রস্ফুটিত হয় না; আবার খুব বিস্তৃত বিবরণও দিবার উপায় নাই। কারণ সমস্ত পথবর্ণনা রাধিকার উক্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে; রাধিকা নিজে যদি তাঁহার পথ-আগমনকষ্টের কথা খুব বড় করিয়া বর্ণনা করেন তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেম লঘু হইয়া যায়। তোমার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় কুল-মান-লজ্জা ত্যাগ

করিয়াছি; পথের কষ্ট সে তো বাহ্য; তোমার সহিত মিলনানন্দে সে দুঃখের প্রতিটি স্মৃতি মুছিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়, তোমার সহিত যে মিলন হইবে সে মিলন তো সাধারণ নয়, সে মিলনের পথ কণ্টকাকীর্ণ কর্দমপিচ্ছিল সর্পসংকুল, কিন্তু সে কথা কে বড় করিয়া দেখিবে? এইভাবে স্বচ্ছ ও সহজ বর্ণনার ভিতর দিয়া অভিসারের অধ্যাত্ম-তাৎপর্য বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গোবিন্দদাসের আলোচ্য পদটিতে যতখানি সৌন্দর্য বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের কোনো পদে এতখানি সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির রাধিকাও ঠিক এমনই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকার বক্ষস্পন্দন-ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে নাই।

পরিশেষে আলোচ্য অভিসারের অধ্যাত্মব্যঞ্জনাটি কি? অনেকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে জীবাত্মাপরমাত্মার লীলা বলিয়া মনে করেন এবং অভিসারকেও পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আকর্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনসম্মত নয়। তাঁহাদের মতে রাধিকা এবং কৃষ্ণ স্বরূপত একই। যোগমায়ার বসে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ আপন হ্লাদিনী অংশভূত রাধিকার সহিত লীলা করেন; রাধিকা কি করেন— তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি বিভিন্ন রসের গুণগুলি অঙ্গীকার করিয়া আর-একটি স্বতন্ত্র গুণাধিকারিণী। তিনি নিজ অঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা করেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণসেবারই নামান্তর। অভিসারের পদগুলির ভিতর দিয়া স্বাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা করিবার অসীম ব্যাকুলতা এবং তাহার জন্য সর্বপ্রকার কষ্টস্বীকার, ও কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়া কৃষ্ণপ্রেমেরই নিবিড়তা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বরাগে-বিরহে প্রেমের যে অসীম প্রতাপ, অভিসার-পর্যায়ের পদেও প্রেমের সেই অপ্রতিহত প্রভাব। ইহারই সহিত রাধিকার প্রেম গভীর সাংকেতিকতার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই অভিসারের তাৎপর্য।

বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া নায়িকার মানস-বিবর্তনের ক্রমপর্যায়গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। অভিসারের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণে এবং তুলনা-মূলক আলোচনায় এই স্তরনির্দেশের সূত্রটি হয়তো বহু জায়গায় হারাইয়া গিয়াছে, এইবার বিরহ-পদাবলীর আলোচনায় সেই সূত্রটি আবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইবে।

৩

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের পদগুলিতে যে ভাববিশুদ্ধি দেখা যায় তাহার মূলে আছে চৈতন্যের জীবন। মহাপ্রভুর জীবনে যে লীলা প্রত্যক্ষীভূত হইল তাহাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের নিকট আদর্শ হইয়া রহিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্য লৌকিক প্রণয়কাহিনীমূলক না হইলেও তাহা ছিল আদি-রসাত্মক। মহাপ্রভু যে প্রেমের প্রবর্তন করিলেন সে প্রেম সাধারণ প্রেম নয়। এ প্রেমের কষ্টিপাথর বিরহ। মহাপ্রভু বলিলেন, 'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে'। গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ যুগযুগান্তর বলিয়া মনে হয়, সমস্ত জগৎ মনে হয় শূন্য। ইহাই প্রেমের আদর্শ। কিন্তু বিদ্যাপতি যদিও চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি এবং বিশেষ করিয়া রূপসম্ভোগের কবি বলিয়া পরিচিত, তবু বিরহ-পদগুলির বিচারে বিদ্যাপতি পরবর্তী পদকর্তাদের সহিত সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন। যে ভাববিশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ পরবর্তীকালের পদকর্তাদের রচনায় ঠিক সেই সুরই বিদ্যাপতির বিরহ-কবিতায়। ইহার কারণ, কি ঐশী প্রেম, কি লৌকিক প্রেম— মিলনের মধ্যে

একটা স্থূলতা একটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে। মিলনের অর্থ দেহসম্ভোগ, দেহকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার বিস্তার। কিন্তু বিরহের মধ্যে আছে একটা উদার ব্যাপ্তি, একটা সার্বভৌম বিস্তৃতি। বিরহিণী নায়িকার মধ্যে তাই আপনা হইতেই একটা বৈরাগ্যের সুর বাজিয়া ওঠে। রাধাকৃষ্ণের মিলনে রাধার দৃষ্টি, তাহার চিন্তা-ভাবনা কৃষ্ণকেই কেন্দ্র করিয়া। তখন 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া কৃষ্ণে কেন্দ্রস্থ হইয়াছে। কিন্তু বিরহে সে সংকীর্ণতা বা স্থূলতার চিহ্ন মাত্র নাই। বিরহিণী রাধিকা কৃষ্ণকে সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন, কৃষ্ণ তখন নববর্ষার জলভারমন্থর মেঘমালায়, শ্যামল বনশ্রেণীতে, কালিন্দীর কালো-জলে। বেণুবনের মর্মরধ্বনির মধ্যে তখন শোনা যায় কৃষ্ণের মোহন-মুরলী-ধ্বনি। বিশ্ব সংকীর্ণ হইয়া কৃষ্ণে রূপপরিগ্রহ করে নাই, কৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন নিখিল বিশ্বে। নিখিলের সুর তখন তাহাদের সে প্রেমলীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তের স্পর্শ সে ভোগবাসনাকে বিপুলব্যাপ্তি উদার বিস্তৃতির মহিমা দান করিয়াছে। পার্থিব প্রেমকে স্থাপন করিয়াছে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামে। সংস্কৃত কবি তাই বলিয়াছেন, 'সঙ্গমবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো, মিলনে সৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'।

বিদ্যাপতির বিরহ-পদাবলীর আধ্যাত্মিক-ভাব-বিশুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া এত কথার ভূমিকা করিতে হইল, ইহার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধারণ পাঠক এবং সমালোচক বিদ্যাপতিকে জানেন রূপসম্ভোগের কবি বলিয়া, যেমন জানেন কালিদাসকে। এইসমস্ত ব্যাখ্যা ও টীকাকারদের প্রধান অবলম্বন বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি এবং তাঁহার ব্যবহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারগুলি।

বিদ্যাপতি এমন কতকগুলি উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করিয়াছেন যাহা প্রকৃতই অত্যন্ত অশ্লীল। উদ্ধৃতি দিতে চাই না, কৌতূহলী পাঠক তাঁহার মান-পর্যায়ের পদগুলি খুঁজিলে ইহার প্রচুর উদাহরণ পাইবেন। ইহা অবশ্য মুখ্যতঃ রাজ-প্রতিবেশ প্রভাব। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতির পক্ষে আর-একটি কথা বলিবার আছে। বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতির গীতিপ্রবণতার সঙ্গেসঙ্গে একটা নাট্যশিল্পবোধ ছিল। তিনি তাঁহার রাধিকাকে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি পরিকল্পিত পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন এবং এই রাধিকা-চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানা স্তর আছে। যাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা ইহার যে-কোনো একটি স্তরের উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যাপতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করিতে পারেন না। অংশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করা কবির উপর অবিচার করা। রবীন্দ্রনাথ যখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি রচনা করেন তখন অনেকে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি ভিত্তি করিয়া তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে পরে কবিকে তাঁহার কাব্যপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল যে, কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি তাঁহার কাব্যজীবনের শেষ কথা নয়, ইহা তাঁহার কাব্যসৌধের একটা সোপান মাত্র। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর যে অবিচার হইয়াছিল বাঙালীপাঠক আজিও বিদ্যাপতির উপর সেইরকম অবিচার করিতেছেন।

এখন, বিদ্যাপতির কথা উঠিলেই আমরা তাড়াতাড়ি হাতের কাছের চণ্ডীদাসকে স্মরণ করি এবং উভয় কবির কাব্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া সমস্ত সমস্যার একটা সুলভ মীমাংসা করিয়া

ফেলি। কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিপ্রকৃতির স্বরূপ বিদ্যাপতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চণ্ডীদাসের রাধিকার ভিতর-বাহির জন্মজন্মান্তর হইতে গেরুয়া রঙে ছোপানো, তাঁহার কোনো পরিবর্তনও নাই বিবর্তনও নাই; কিন্তু বিদ্যাপতি যে রাধিকাকে তাঁহার পদাবলীর কেন্দ্রস্থ চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন সে একটি সাধারণ নবোদ্ভিন্নযৌবনা বালিকা। শ্যামকে সে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনো পূর্বসংস্কারের প্রভাব নাই। এ রাধিকার কাছে কৃষ্ণ 'সর্বকারণকারণম্' নয়। এ প্রেম নিতান্ত প্রাণের আবেগে প্রেম, যৌবনধর্মের প্রেম। চণ্ডীদাসের রাধিকার কিন্তু এ প্রাণের আবেগ নাই। বিদ্যাপতি দেখাইয়াছেন, প্রাকৃত প্রেম কি করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলায় পর্যবসিত হয়। সেইজন্য প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা দুইটি বিপরীতধর্মী প্রেমের চিত্র তাঁহাকে পাশাপাশি রাখিতে হইয়াছে। তিনি পার্থিব প্রেমের সহিত অপার্থিব প্রেমের সূত্র যোজনা করিয়াছেন। পার্থিব প্রেমের বর্ণনায় মর্ত্যের মাটির গন্ধ একটুও গোপন রাখেন নাই, আবার সেইখানেই না থামিয়া সে প্রেমলীলাকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধিকাকে দেখি 'যোগিনীপারা'। পূর্বরাগ-মিলন-অভিসারের সে উন্মত্ত উদ্দামতা, সে ভোগলুব্ধ চটুলতা স্তিমিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত নম্র মঙ্গলশ্রী দান করিয়াছে। ইহাই রাধিকার অন্তিম পরিণতি। এই বিরহিণী রাধিকাই বিদ্যাপতির উদ্দিষ্টা রাধিকা। দক্ষ নাট্যকারের মত বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া, ভোগের অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থূলতা দগ্ধ করিয়া কবি রাধিকাকে পরিণতিতে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তখন রাধিকার প্রেম মার্ত্যদেহ পরিহার করিয়া স্বর্গাভিমুখী হইয়াছে। বিদ্যাপতি যে সূত্রে পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমকে গাঁথিয়াছেন রসিক পাঠক সেই সূত্রটি অন্বেষণ করিবেন। কেবলমাত্র একটি বিশেষ স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া, চূড়ান্ত তো দূরের কথা, কোনো প্রকারের মন্তব্যই করা চলে না। অনুরূপ ব্যাখ্যা কালিদাসের কাব্যেও হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সাধারণ সমালোচকদের এই মন্তব্যগুলি কতখানি একদেশদর্শী।

৪

বিদ্যাপতির বিরহ-পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীভাগ লক্ষ্য করা যায়। আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর পদের ভিতর দিয়া নায়িকার মানস-পরিবর্তনের ধারাটি অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম স্তরে দেখি স্থূল ভোগলালসার প্রতি রাধিকার তখনও পূর্ণ আকর্ষণ রহিয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহ তখন তাঁহার নিকট ভোগ-বিরহেরই নামান্তর। কৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার পরিপূর্ণ যৌবন বিফল হইয়া গেল, তাঁহার ভোগবাসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই তবু কান্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল— এই ক্রন্দনের সুরই এই শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ যে রাধিকাকে 'বিনু দোষে পরিহরি গেল' এবং তাহাতে রাধিকার 'যৌবন জনম বিফল ভেল', এই জীবন-যৌবনের জন্য ভোগের জন্য ক্রন্দনই এই শ্রেণীর পদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রেমের যে চরমোৎকর্ষের অবস্থায় নায়কের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল ভাব আসা সম্ভব, যে অবস্থায় সংশয়-সন্দেহ-নৈরাশ্য দুরীভূত হয়, রাধিকার তখনও সে অবস্থা আসে নাই। এখনও তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুরের মত সংশয়-সন্দেহ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে, তাই বিদেশ যাত্রাকালে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরোধ এই—

মধুকর যদি কর রাব।
যদি পিক পঞ্চম গাব॥
তখনে করব অনুমান।
মুদি রহব বর কান॥
পরতিরি মানব-তীতি।
থিরজে মনোভব জীতি॥

এই শ্রেণীর পদ সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

দ্বিতীয় স্তরে ভোগবহ্নি অনেকখানি নির্বাপিত হইয়াছে কিন্তু অন্তরের সে উদ্বেলতা এখনও বর্তমান। প্রথম স্তরে ভোগের জন্য ক্রন্দন, যখন দেখা গেল সে ক্রন্দন নিষ্ফল, তখন যে এই ভোগ-বিরহ ঘটাইয়াছে তাহার উপর আক্রোশ ও তাহাকে ভর্ৎসনা। এই স্তরের কবিতাগুলির মর্মার্থ 'পহু কপটক গেহ'। কৃষ্ণের প্রেমের কোনো মহিমাই রাধিকা এখন স্বীকার করিতেছেন না— 'জৌবন রূপ আছল দিন চারি। সে দেখি আদর কএল মুরারী'। নায়ক কৃষ্ণকে তিনি অতি সাধারণ কামান্ধ প্রাকৃত নায়কের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ চতুর কপট ভণ্ড। রাধিকার দেহযৌবনে মুগ্ধ হইয়া কয়েকদিনের জন্য তাঁহার উপর আসক্ত হইয়াছিলেন, এখন নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের উপর এই তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা ও কঠিন দোষারোপ প্রকাশ পাইয়াছে আলোচ্য স্তরের পদগুলির মধ্যে। সংখ্যায় এই পদগুলি খুব কম নয়।

তৃতীয় স্তরে দেখি, বিরহ-বহ্নি রাধিকার অন্তরের সোনাকে অনেকখানি নিকষিত করিয়া তুলিয়াছে। যে ভোগলুব্ধতা, যে সংশয় আবেগ উৎকণ্ঠা, প্রতারকের প্রতি প্রতারিতের যে মর্মভেদী অভিশাপ তাহার সমস্তই সংযত হইয়া রাধিকাকে এখন পরম বিষাদময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকার অন্তিম পরিণতি এইখানেই নয়— এখনও কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা, তাঁহার অভাবের তীব্র বেদনা, গোকুলে তাঁহার অসংখ্য স্মৃতি তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। প্রথম-দ্বিতীয় স্তরে রাধিকার ভোগলুব্ধতার জন্য তাঁহার বেদনা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। এখন হইতে রাধিকার বিরহ-বেদনা আমাদের অন্তরের অশ্রুসাগরকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতিবোধকে জাগ্রত করিতেছে। এতক্ষণ তাঁহার চঞ্চলতা, তাঁহার ঔদ্ধত্য, তাঁহার যৌবনমদগর্বিত স্পর্ধিত দম্ভ আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এখন কৃষ্ণ-বিরহে গোকুলের করুণ পরিবেশের পটভূমিকায় কবি রাধিকার যে করুণ চিত্রখানি আঁকিয়াছেন তাহা প্রকৃতই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—

সুণ ভেল মন্দির সুণ ভেল নগরী।
সুণ ভেল মন্দির সুণ ভেল সগরী॥
কৈসনে যাওব যমুনাতীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর॥

চতুর্থ স্তরে রাধিকাকে দেখি বৈরাগিণী রূপে। ইহাই বিদ্যাপতির রাধিকা, ইহাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতিনাট্যের চরম পরিণতি। বয়ঃসন্ধি-পূর্বরাগ-মিলন-মান-অভিসার প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে রাধিকা-চরিত্র ক্রমশ মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল বিরহের চতুর্থ পর্যায়ে সেই পূর্ণ মুকুলিত রাধিকাকে

দেখিলাম। সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রগল্‌ভতা, বিরহের অশ্রুপ্লাবনে ধৌত হইয়া গিয়াছে, রাধিকা এখন দিব্য-অম্লান-শোভনশ্রী। রাধিকার এ রূপের সঙ্গে বয়ঃসন্ধির রাধিকার রূপের মধ্যে বহু পার্থক্য। সে রূপ ভোগের, এ রূপ ভোগাতীতের। সে রূপ রাধিকাকে দিয়াছে চিরচঞ্চলতা, এ রূপ দিয়াছে চিরশান্তি। এই স্তরে দেখি, যে কৃষ্ণকে তিনি নিজ ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য দায়ী করিয়াছিলেন, যাহাকে ভণ্ড-কপট বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণের উপর তাঁহার আর-কোনো অভিযোগ নাই। তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিত। তাই অন্তিম প্রার্থনা—

মোরি অবিনএ জত পরলি খেওঁব তত
চিতে সুমরিব মোরি নামে ॥

যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে প্রাণ আকুল হইয়াছিল এখন তাঁহার স্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকাতেই চরম সার্থকতা মনে হইতেছে। যে রাধিকা কৃষ্ণের মথুরা যাইবার সময় উপদেশ দিয়াছিলেন—'পরতিরি মানব তীতি'— এখন তিনিই বলিতেছেন সহস্র রমণীর সহিত সে সহস্র রজনী যাপন করুক, কিন্তু 'চিতে সুমরিব মোরি নামে'— আমার কথা তাঁহার চিত্তে যেন একবার উদিত হয়, আমার কথা যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া না যায়। তাহাতেই রাধিকার শান্তি। দৈহিক ভোগবন্ধনের মধ্যে তাঁহাকে আর বাঁধিতে সাধ যায় না। সে চেষ্টা একবার তো হইয়াছে। দেহের বন্ধন খুলিয়া যায়। তাই যাহার সঙ্গে ছিল দেহের সম্পর্ক এখন তাহার সঙ্গে স্থাপিত হইল চিত্তের সম্পর্ক। বাহিরের গ্রন্থিবন্ধন শিথিল হইয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু অন্তরের যে নিবিড় সংশ্লেষ তাহা তো অচ্ছেদ্য। দূতী আসিয়া সংবাদ দিল— কৃষ্ণ কুব্জার সহিত রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও রাধিকার চাঞ্চল্য নাই। তিনি বলিলেন—

ও তহু রহথু গঅ ফিরি।
হে সখি, দরসন দেখু একবেরি।

ইহা রাধিকার অভিমান নয়, পরিণতি। অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণবিন্দুর মত রাধিকার এ প্রেম উজ্জ্বল, অম্লানরেখ। মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়। এখন রাধিকার এ প্রেম প্রকৃতই মহৎ। যাঁহার জন্য সমস্ত জীবন ঊষর হইয়া গেল, যাঁহার বাঁশির ধ্বনি অনুসরণ করিয়া সমস্ত কুল-শীল-লজ্জা-ভয় বিসর্জন দিয়া আসিলাম, আজ সে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার জন্য কাহারও উপর অভিমান নাই, ভাগ্যকে দোষারোপ নাই, প্রতারককে ভৎ'সনা নাই, কোনো অনুশোচনা কোনো গ্লানি কিছুই ইহাকে স্পর্শ করে নাই। যাঁহার জন্য লৌকিক সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিলাম সে ফিরিয়া তাকাইল কি না, সে আমার দেহ-যৌবনকে গ্রহণ করিল কি না সে বিচার কে করিবে? তাঁহার জন্য আমি কতখানি ত্যাগ করিতে পারিলাম, পশ্চাতের কোনো বন্ধন সম্মুখের সেই মহাকর্ষণে বাধা দিয়াছে কি না তাহাই দেখিতে হইবে। ইহাই রাধিকার প্রেম। চৈতন্যদেব জীবন দ্বারা এই প্রেমকেই প্রত্যক্ষীভূত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রেমের স্পর্শে রাধিকার উদ্বেল অন্তর যখন শান্ত হইয়াছে তখনকার একখানি চমৎকার চিত্র বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন—

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥
উরপর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি করি নাগিণী ॥

কেও সখি তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনী দলে কর বাতাসে॥
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী।

নদী যখন তটবন্ধনে আবদ্ধ, তীরের সীমায় সীমিত, তখনই তাহার উদ্দাম কলরোল, উচ্ছ্বসিত আবেগ; কিন্তু উচ্ছ্বাস-আবেগ-প্রগল্‌ভতা সমস্তই শান্ত সমাহিত স্তব্ধ হইয়া যায় যখন সে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্যাপতির রাধিকা যখন মিলন-মান-অভিসারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তখন তাঁহার প্রগল্‌ভতা ছিল, চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু বিরহের সীমাহীন অকুলতার মধ্যে রাধিকা শান্ত কোমলশ্রী ধারণ করিয়াছে। তখন বিরহ-মিলন কিছুই তাহার শান্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে না। প্রেমের এই চরম অবস্থায় 'অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলি মধাঈ'। অগভীর জলে তরঙ্গোৎক্ষেপ বেশি; রাধিকার প্রেম যখন অগভীর ছিল তখন তাহাতে মান-অভিমানের, দ্বন্দ্ব-সংশয়ের তরঙ্গোৎক্ষেপ হইয়াছে, কিন্তু বিরহের গভীর প্রেমে তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই, নিষ্কম্প সরোবরের বক্ষের মত তাহাতে ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গও লক্ষ্য করা যায় না। প্রেমের এই গভীর অবস্থায় পাওয়া-না-পাওয়া বিরহ-মিলনের কোনো পার্থক্য নাই, তাই বিদ্যাপতির রাধিকা বলেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

বিরহের এই চারিটি স্তর। এখন, বিশ্লেষিত এই চারিটি স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরের কবিতাগুলি বিরহের পদ হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং সে শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারের মানদণ্ডই বা কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

বিরহের উৎপত্তি অভাব হইতে, তাই একটা অভাববোধ সমস্ত বিরহ-কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিরহ মিলন নয়, একটা কিছু হারাইয়াছে— সেই হারাইয়া যাওয়া জিনিসটির জন্য ক্রন্দনই বিরহের ক্রন্দন। কিন্তু এ ক্রন্দন আত্মগত ক্রন্দন। নিজে দুঃখ পাইয়াছি বলিয়া অপরকে দুঃখ দিবার চেষ্টা এ ক্রন্দনে নাই। গভীর দুঃখ যেমন চিত্তে একটা শান্ত বৈরাগ্যের সুর জাগাইয়া তোলে, বিরহের কবিতাও ঠিক তেমনি— সমস্ত চিত্ত আজ স্তব্ধ শান্ত। কোথায়ও কোনো অনুযোগ-অভিযোগ নাই। কোনো অনুশোচনা নাই। সমস্ত দুঃখ আমি নিজেই সৃষ্টি করিয়াছি— ইহাই বিরহের কবিতা।

বিদ্যাপতির প্রথম দুইটি স্তরের কবিতাকে ঠিক বিরহের কবিতা বলা যায় না। সেখানে ভোগবাসনা, যৌবনোপভোগের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র, রাধিকাচিত্ত এত চঞ্চল ও উদ্বেলিত যে মনে হয় বিরহের গভীর সুর তাঁহার হৃদয়ে তখনও বাজে নাই। বায়ুতাড়িত জলের উপরিভাগের ন্যায় সামান্য একটুখানি কম্পন, সামান্য একটুখানি ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, গভীর কোনো সুর বাজে না। গভীর বিরহের ক্রন্দন শোনা যায় তৃতীয় স্তরের কবিতায়। চতুর্থ স্তরের কবিতায় সুর এত চড়ানো হইয়াছে, আদর্শবাদ এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে এই পদগুলিকে ভাবসম্মিলনের পূর্বরূপ বলা যায়। আর-একটু সুর চড়াইলেই পদগুলি বিরহের রাজ্য ডিঙাইয়া ভাবসম্মিলনের রাজ্যে পৌঁছাইতে পারিত। এই স্তরের পদগুলিতে দেখা যায়, মিলন আর বিরহে কোনো পার্থক্য নাই এবং যে তীব্র সংযত অভাববোধ বিরহ-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা এই স্তরের পদগুলিতে অবর্তমান। তাই উচ্চভাবদ্যোতক হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর পদগুলিকে শ্রেষ্ঠ বিরহ-কবিতার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না।

'সখি হামার দুখক নাহি ওর' পদটি তৃতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ পদ। পদটিতে কাব্যের দুইটি অঙ্গ— চিত্র ও সংগীত, এবং পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এই ত্রিধারার অপরূপ সম্মিলন ঘটিয়াছে।

৫

বিদ্যাপতির পদাবলীকে যদি যথার্থই একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখিতে হয় এ গীতিনাট্যের মূল ভাবব্যঞ্জনাটি কি। পদগুলিকে যদি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে ইহার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি আবিষ্কার করিতে না পারিলেও বিশেষ কিছু উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ হয় না। কিন্তু ইহাকে একখানি গীতিনাট্য বলিয়া আখ্যা দিতে গেলে ইহার অন্তর্নিহিত অখণ্ড একটা ভাবসূত্রের সন্ধান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। খণ্ডভাবে প্রত্যেকটি পদের কাব্য-সৌন্দর্য এবং অখণ্ডভাবে ইহাদের মূলভাব-সৌন্দর্য উভয় মিলিয়া পদগুলিকে সার্থক গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য দান করিবে। সুতরাং বিদ্যাপতির সমগ্র পদগুলির মূলভাব-ভিত্তিটি কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

পরিপূর্ণ প্রেম এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন চিত্তের ধ্যানতন্ময়তা। চঞ্চল অস্থিরচিত্তে দৈহিক ভোগলালসা নিয়া যখন পরিপূর্ণ প্রেমের রহস্য ভেদ করিতে যাই, অন্তরের ভাব-ঐশ্বর্যে নয়, দৈহিক রূপ-ঐশ্বর্যের মূল্যে যখন দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাই— তখন সে মিলনের অন্তে করুণ সুর আপনা হইতেই বাজিয়া ওঠে। কিন্তু রূপের গরিমা ধুলায় লুটাইয়া দিয়া, বাহিরের রূপের সূত্রে নয় অন্তরের ধ্যানের সূত্রে যখন তাহাকে বাঁধিতে যাই তখন সে বন্ধন হয় অক্ষয়, তখন সে মিলনও হয় পরিপূর্ণ। তখনই বলা যায় 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর'।

যৌবন-প্রাণপ্রাচুর্যে রাধিকা চঞ্চল। এতই চঞ্চল যে কৃষ্ণ তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেও পাইলেন না, 'সজনী, ভাল কএ পেখন না ভেল। মেঘমালা সয়ঁ তড়িত লতা জনি হিরদয়ে সেল দঈ গেল'। তিনি যেন তড়িতের চকিত আলোক। একদিকে তাঁহার চঞ্চলতার জন্য তাঁহাকে ভালো করিয়া যেমন দেখা যায় না, আর-একদিকে তাঁহার রূপৈশ্বর্যের দিব্যচ্ছটায় তাঁহার দিকে ভালো করিয়া তাকানোও যায় না। এই অস্থির চঞ্চলতা এবং রূপের ছটাই বিদ্যাপতির রাধিকার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই পরিণামে তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছে।

প্রথমযৌবনের উত্তেজনা এবং আবেগে যখনই রাধিকা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন তখনই তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্তরে তাঁহার জন্য ধ্যানের আসন প্রস্তুত না করিয়াই কেবল বাহিক রূপের মোহে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বুঝিতে পারেন নাই, অস্থির হইয়া কেবল জল ঘোলাইয়া তোলা যায়, কোনো মহৎ জিনিস লাভ হয় না। কবি ভণিতায়ও বহু বার তাহাকে সাবধান করিয়াছেন, যখনই তিনি বলিয়াছেন, 'কানু হেরব ছল মন বড় সাধ' তখনই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, 'ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারী'। কিন্তু ধৈরজ ধরিবার শিক্ষা তখনও রাধিকার বাকী। বিদ্যাপতির এই যে উক্তি, 'ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারী' ইহাই তাঁহার প্রেম-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আদর্শ। এই আদর্শ-সাম্যে তাঁহাকে কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় কবিগোষ্ঠের সহিত একসূত্রে বাঁধা যায়। প্রেম-সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আদর্শও ইহাই— শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি সম্ভব, অস্থিরতার মধ্যে নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃপুরে যে সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজ করিতেছেন, শান্ত সমাহিত

পবিত্র না হইলে তাহার সাক্ষাৎ মিলবে না। বিদ্যাপতির রাধিকা ইহা বুঝিতে না পারিয়া ভুল করিলেন, তিনি দুঃশাসনের মত অস্থির চিত্তে প্রাণশক্তির আবেগে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ফলে নিজেই নিজের ভাগ্যবিপর্যয় ডাকিয়া আনিলেন।

একদিকে রাধিকার এই চঞ্চল অস্থিরতা যেমন তাঁহাকে শান্তি দেয় নাই তেমনি আর-একদিকে তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য-গর্ব এবং চটুল ভোগবাসনা তাঁহার নিজের কাছেই নিজের অস্তিত্বকে বিষাইয়া তুলিয়াছে। ভোগ-তৃষ্ণা তাঁহাকে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ঘুরাইয়া মারিয়াছে আর দেহ-সৌন্দর্য-গৌরব পরিশেষে তাঁহার আত্মগ্লানির আর সীমা রাখে নাই। রাধিকার রূপের তুলনা নাই, দূতির উক্তিতেই প্রকাশ—

সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু তরু লোচনা
কাজর রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝ কাল ভুজঙ্গিনী
সিরিজুত খঞ্জন-খেলা॥

এই সৌন্দর্য তাঁহার কাল হইয়াছে। কৃষ্ণকে তিনি মনে করিয়াছিলেন দেহ-সৌন্দর্যের কাঙাল। বলিয়াছেন, 'যৌবন রূপ অছল দিন চারি। সে দেখি আদর কএল মুরারী'। কিন্তু পরিশেষে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার কাছে যাইতে হইলে সর্বাগ্রে এই বাহ্যিকরূপের আবর্জনা বিসর্জন দিতে হইবে, মুছিয়া ফেলিতে হইবে রূপের গরিমা। রিক্ত, নিঃস্ব, নির্বিকার হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিলে তবেই তিনি অভ্যর্থনা করেন। এই বোধ রাধিকার জন্মিয়াছে অনেক পরে, যখন জন্মিয়াছে তখন বলিয়াছেন, 'শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর, তোড়হ গজমতি হার রে'। রাধিকা যখন বাহ্যিক আভরণের অসার্থকতা বুঝিতে পারিলেন, যখন বুঝিলেন, রূপের ছটায় তাঁহাকে ভুলানো যাইবে না, অন্তরের সাধনায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন—

জত বা জকর লেলে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী।

বহিঃপ্রকৃতি রাধিকার রূপায়নে সহায়তা করিয়াছিল। আজ রাধিকার রূপের প্রয়োজন নাই, তাই তিনি সমস্তই যথাযোগ্য স্থানে ফিরাইয়া দিতেছেন— লোচন-লীলা দিলেন হরিণকে, কেশপাশ চামরীকে, দশনরুচি দাড়িম্বকে, বান্ধুলিকে অধররুচি, সৌদামিনীকে দেহকান্তি দান করিয়া তিনি কাজলের ন্যায় মলিন হইলেন। 'কাজর সনি সখি ভেলী'—এই কাজরের ন্যায় মলিন রাধিকার তুলনা চলে 'নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্বতী'র সঙ্গে। পার্বতী এবং রাধিকা— সৌন্দর্যের অভাব ইঁহাদের কাহারও ছিল না, অভাব ছিল ভাবৈশ্বর্যের। উভয়ের প্রধান অবলম্বন দেহসৌন্দর্য এবং মদন। মদন যে মিলন ঘটায় তাহার ব্যর্থ পরিণাম কালিদাস যেমন দেখাইয়াছেন বিদ্যাপতিও ঠিক তেমনি দেখাইয়াছেন। মদন যে মিলন ঘটাইল সে মিলন বিরহের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, যে মিলন রাধিকার আত্মপ্রস্তুতির ভিতর দিয়া সংঘটিত হইয়াছে সেই মিলন হইল সার্থক। তখনই তিনি বলিলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।

অস্থিরতা বিসর্জন দিয়া, রূপগর্ব ভুলিয়া গিয়া, ভোগ-বাসনার অতীত হইয়া যখন রাধিকা প্রেম-স্বরূপের কাছে আসিলেন তখন তিনি পরিপূর্ণ প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন তিনি প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যাও করিলেন—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

চণ্ডীদাসের পদে রাধিকা যেমন symbol, বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ তেমনি symbol : তিনি পরিপূর্ণ প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক। রাধিকা প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক; ইহার স্বরূপ-রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করিতে চান। কিন্তু সোজাপথে না গিয়া তিনি ধরিয়াছিলেন বাঁকাপথ; দুঃখের দহনও হইয়াছিল তেমনি তীব্র। কিন্তু পরিশেষে গন্তব্যস্থলে তিনি পৌছিয়াছেন। পরিপূর্ণ প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া রাধিকা-চরিত্র আবর্তিত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা-চরিত্র। বিদ্যাপতির রাধিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা উভয়ে একই সুরে বাধা। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক। উভয়েরই প্রথম অগ্রসর ভুল পথে, তাহার ফলে দুঃখ-বিরহের ভিতর দিয়া প্রায়শ্চিত্ত। পরিণতিতে দুইজনেই আবার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। বিদ্যাপতির গীতিনাট্যে এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' সাংকেতিক নাটকেও দেখি কয়েকটি চরিত্র অপরিবর্তনীয়— বিদ্যাপতির কৃষ্ণ এবং দূতি-সম্প্রদায়, 'রাজা'র রাজা এবং ঠাকুরদা সুরঙ্গমা। তবে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ-চরিত্রে যে সামান্য অবস্থা-পরিবর্তন আছে, তাহা প্রকৃত পরিবর্তন নয়, প্রচলিত ধারার প্রতি আনুগত্য।

বিদ্যাপতির রাধিকাকে 'সর্বকারণকারণম্' কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির রূপে না দেখিয়া সাধারণ প্রেম-সৌন্দর্যোপাসক নায়িকারূপে দেখাই সংগত। এ রাধিকার মিল ও সংগতি রহিয়াছে কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনার সঙ্গে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীদের সঙ্গে নয়। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের নায়িকা শকুন্তলার প্রেমের বিভিন্ন পর্বগুলি বিচার করিলে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাধিকার প্রেমের স্তরের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে, শকুন্তলা হয়তো ঋষিকন্যা আশ্রম-বাসিনী বলিয়া রাধিকার মত অতখানি চটুল ও উগ্রচঞ্চল হইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু মূল সুরটি এক। তাহা ছাড়া বিদ্যাপতির সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-মহাজন ছিলেন না। রাধিকার প্রেমলীলার মধ্যে যে একটা চমৎকার রোমান্টিক কাব্যের সম্ভাবনা আছে সেইটুকুই তাঁহার কবিদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যের সুর আর বৈষ্ণব কাব্যের সুর এক নয়। তাঁহার সমগ্র পদাবলীর মধ্যে যে সুরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, ভোগের আসক্তি দিয়া প্রেম-সৌন্দর্যকে আবৃত করিয়া দেখিলে পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হয়; প্রেম দেহের নয় মনের, ভোগের নয় ভোগাতীতের। প্রেম সম্পর্কে কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই এক সুর। আশা করা যায় বৈষ্ণব-কাব্য বা পদাবলীর সুর ইহা নয়।

৬

বিদ্যাপতির পদাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যিক আস্বাদন আজিও হয় নাই। বিদ্যাপতি কত বড় কবি তাহার অনেকখানিই এখন আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহা ছাড়া

বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া তাঁহার কবি-স্বরূপের অন্যান্য দিককে একেবারে উপেক্ষা করা হইয়াছে। আর কবি হিসাবে তাঁহার যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাহাও সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লোপ করা হইয়াছে। বিদ্যাপতিকে কোনো গোষ্ঠিভুক্ত না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা উচিত। আর এ আলোচনায় কোনো পূর্বসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া, কোনো সুপ্রচলিত পন্থার অনুবর্তন না করিয়া আধুনিক বিশ্লেষণপ্রধান (analytical) সমালোচনা-পদ্ধতির অনুসরণে বিদ্যাপতির কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা দরকার। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা ও আস্বাদন কেবল ভক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, সমালোচনা আবেগ-উচ্ছ্বাসপ্রধান নয় বুদ্ধি-যুক্তিপ্রধান।

এই প্রকার আলোচনার পূর্বে প্রয়োজন বিদ্যাপতির সমগ্র রচনার একখানি নির্ভরযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ। এ যুগে বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনাপ্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা জটিল বাধা তাঁহার পদের কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতা নির্ধারণ করা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাপতির নামে যেসমস্ত পদ চলিতেছে তাহার প্রত্যেকটি মিথিলানিবাসী মহারাজ শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচনা নয়, বহু বাঙালী কবির পদ উহার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। আর এইসঙ্গে আরও একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাপতি নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। মোট কথা, বিদ্যাপতি-সমস্যা চণ্ডীদাস-সমস্যার চেয়ে কম জটিল নয়। প্রথমে এই গ্রন্থিসংকুল জটিলতাকে সরল করিয়া কোন্ পদগুলি মৈথিলী বিদ্যাপতি রচিত তাহা ঠিক করিয়া সেই অনুপাতে তাঁহার যেটুকু কবি-কৃতিত্ব সেইটুকুই তাঁহাকে দেওয়া উচিত। নতুবা এই বিদ্যাপতি-আবর্তে পড়িয়া অনেক বাঙালী কবির কবিত্ব খর্ব হইয়াছে এবং হইতেছে।[১]

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কোনো ব্যাপক আলোচনাকে কেবল রসের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। কবিকে নিয়া যেমন বিদ্যাপতি-সমস্যা, কবির ভাষা নিয়া অনুরূপ ভাষা-সমস্যা আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাও অপরিহার্য। বিদ্যাপতির ভাষা-রহস্যের গ্রন্থিমোচন করিতে পারিলে আপনা হইতেই ব্রজবুলি-রহস্যেরও গ্রন্থিমোচন হইবে। বিদ্যাপতি বিভিন্ন রসের কাব্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীর ভাষা খাঁটি মৈথিল নয়, মৈথিলীর আধারে সৃষ্ট বিদ্যাপতির নিজস্ব একটি ভাষা। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের উপযোগী বলিয়াই তিনি এইভাবে ভাষাকে কৃত্রিম ও সাহিত্যিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের ব্রজবুলি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের বিকৃত অনুকরণজাত নয়, ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে বিদ্যাপতির মধ্যে। বলা যায়, বিদ্যাপতিই এই ভাষার বীজ রোপন করিলেন।

ভাষা সম্বন্ধে কবির নিজস্ব একটি দৃষ্টি ছিল—

বাল-চন্দ বিজ্জাবই ভাসা।
দুহু ন হি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেসর হর শির সোহই।
ঈ নিচ্চই নাঅরমন মোহই।· ·
দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্‌ঠা।
তেঁ তেসম জম্পঞো অবহট্ঠা।

---

১ এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠি' (বর্ধমান সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

কীর্তিলতায় অবহট্ট ভাষা প্রয়োগের জন্য কবির এই চমৎকার কাব্যিক কৈফিয়ত। এই উক্তি কাব্যভাষা সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট বৈদগ্ধ্যই প্রমাণ করে।

বিদ্যাপতির ভাষার সঙ্গেই আর-একটি বিষয়ের আলোচনা হওয়া দরকার—বিদ্যাপতির উপমা। ভারতীয় সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত। বিদ্যাপতির উপমাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাঁহার উপমাগুলিও কাব্যসৌন্দর্যে ন্যূন নয়। এই উপমাগুলির অনেকগুলি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লুণ্ঠিত, অনেকগুলি তাঁহার নিজস্ব।

বিশেষ অর্থে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে উপমার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে প্রায় যাবতীয় অর্থালংকারই উপমার পর্যায়ে পড়ে। একটু ব্যাপক অর্থে উপমার নামকরণ করা যায় চিত্র-কৌশল। ইহার সংজ্ঞা মোটামুটি এই— রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপসৃষ্টির পথে শব্দঝংকার এবং চিত্রসম্পদের আশ্রয় নেয়; শব্দঝংকারের নাম শব্দালংকার ও ছন্দোবিজ্ঞান, আর চিত্রসম্পদের নাম অর্থালংকার। বিদ্যাপতির উপমা-বিচারে অর্থালংকারের নাম করা উচিত চিত্র-কৌশল।

বিদ্যাপতির চিত্রগুলি দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর চিত্র আছে, বর্ণনীয় বিষয়কে সেই চিত্রগুলির সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয়। এই শ্রেণীর চিত্রে দুইটি জিনিস থাকে, একটি প্রস্তুত আর-একটি অপ্রস্তুত। যেমন ধরা যাক, 'মেঘমালা সয়ঁ তড়িত লতা জনি'; রাধিকার চঞ্চলতা প্রস্তুত বিষয়, ইহাকে পরিস্ফুট করা হইতেছে অপ্রস্তুত তড়িৎ-রেখার সাহায্যে। এই তড়িৎ-রেখা যেমন প্রস্তুত বিষয়কে পরিস্ফুট করিতেছে তেমনি একটি চিত্রের আভাসও দিতেছে। অবশ্য প্রত্যেক অপ্রস্তুত বিষয়ই যে চিত্রের আভাস দিবে এমন নিয়ম নাই। অপ্রস্তুত চিত্রও হইতে পারে বস্তুও হইতে পারে।

অর-এক শ্রেণীর চিত্র আছে যাহাতে প্রস্তুত-অপ্রস্তুত নাই। যেমন—

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে॥
উর পর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি করি নাগিনী॥
কেও সখি তাকএ নিসাসে।
কেও নলিনী দলে কর বাতাসে॥

এক শ্রেণীতে ভাবব্যঞ্জনা ও অর্থগভীরতা। আর একশ্রেণীতে বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও মাধুর্য। শেষোক্ত শ্রেণীর ইংরাজী নাম Image।

চিত্র বা শব্দঝংকার—ইহারা কাব্যের অলংকার বটে, কিন্তু কাব্যের আত্মভূত অলংকার। এই সংস্কৃত শ্লোকটিতে সে কথা চমৎকার ভাবে বলা হইয়াছে।—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্ত্য সোঽলঙ্কার ধ্বনৌ মতঃ॥

রস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত একই প্রযত্নে যাহা সিদ্ধ হয় তাহাই অলংকার। বিদ্যাপতির চিত্রগুলি বিচার প্রসঙ্গে দেখিতে হইবে যে তাহার চিত্রগুলি কাব্যের বহিরঙ্গ মূলক সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে, না, কাব্যাত্মার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাব্যের আত্মা অলংকারের সহিত কেমন

গভীরভাবে অন্বিত হইতে পারে কালিদাসের কাব্যে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে।[১]

কাব্যে চিত্রসৃষ্টি করে রূপ, আর সংগীত ব্যঞ্জনা দেয় অরূপের। উভয়ের লক্ষ্য এক চিত্তে রম্যার্থ-প্রতিপাদন। সাধারণত দেখা যায়, যে কবি রূপমোহে আবিষ্ট তাহার অবলম্বন চিত্র; আর যাহার কাব্যে অরূপের বাণীই প্রবল তাহার আশ্রয় সংগীত। কালিদাস-কীট্স্-বিদ্যাপতি চিত্ররীতির কবি; শেলী-ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ-চণ্ডীদাস সাংগীতিক কবি। প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় কোথায়ও চিত্র কোথায়ও সংগীত। চিত্ররীতি বিশেষভাবে বস্তুলীন (objective); সাংগীতিক রীতি অনেকখানি আত্মলীন (subjective); চিত্রের ভিতর দিয়া শুধু রূপটাই ধরিয়া দেওয়া যায়, আত্মগত অনুভূতি প্রকাশ করিবার অবকাশ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সাংগীতিক রীতিতে বস্তু নয় ভাব লইয়া কারবার। অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুরণের অবকাশ সেখানে বেশি। এই জন্য চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ যতখানি বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদাবলীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততখানি নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বিদ্যাপতি প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের কবিতায় চিত্ররীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ ভাবসম্মিলনে যেখানে রূপের জগৎ ছাড়াইয়া অরূপের রাজ্যে আসিয়াছেন সেখানে তিনি চিত্র ছাড়িয়া সংগীতেরই আশ্রয় লইয়াছেন। বিরহের দুই-একটি চিত্ররীতির পদ থাকিলেও ভাবসম্মিলনের প্রত্যেকটি পদই সাংগীতিক রীতিতে লিখিত। আবার এই চিত্রগুলিরও একটা ক্রমবিবর্তন আছে। এই বিবর্তন রাধিকা-চরিত্র বিকাশের অনুসারী। পূর্বরাগ-মিলন-মান প্রভৃতিতে যে চিত্র বা উপমা আছে সেগুলি নিতান্ত লৌকিক বা প্রাকৃত। প্রেমকে সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণকে কলুর বলদের সঙ্গে এবং যুবতী নারীর কুলধর্মকে কাঁচের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

এইসকল চিত্র এবং উপমায় অধ্যাত্ম ভাববিশুদ্ধি নাই। হয়তো ইহা বিদ্যাপতির উপর রাজ-প্রতিবেশ-প্রভাব সূচিত করে। কিন্তু ক্রমশঃ শেষের দিকে দেখা যায় যে, চিত্রগুলির প্রকার পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উপমা-চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিবার সঙ্গেসঙ্গে এইগুলির ক্রমবিবর্তনের ধারাটিও অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহার ফলে এই আলোচনার মধ্যে রাধিকার মানস-বিবর্তনের যে ধারাটির প্রতি ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেই ধারাটি সুস্পষ্ট হইতে পারে।

১ এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত 'উপমা-কালিদাসস্য' গ্রন্থখানিতে; এবং রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'প্রবন্ধসংগ্রহ') দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-জীবনী ১।২।৩। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। মূল্য যথাক্রমে সাড়ে আট টাকা, দশ টাকা, দশ টাকা।

কবিকথা। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সুপ্রকাশন। সাড়ে তিন টাকা।

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। সাড়ে চার টাকা।

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ ১।২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং; মিত্রালয়। মূল্য যথাক্রমে সাড়ে তিন ও চার টাকা।

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ ১।২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্রালয়। মূল্য চার টাকা ও সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। তিন টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা ১ম খণ্ড। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। দি বুক হাউস। বারো টাকা।

কবিগুরু। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস। তিন টাকা বারো আনা।

রবীন্দ্রদর্শন। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং লিঃ। দুই টাকা।

জনগণের রবীন্দ্রনাথ। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সিগনেট প্রেস। আড়াই টাকা।

কিছুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠক ও লেখকদের মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে, এতগুলি বই কাছাকাছি প্রকাশিত হওয়া তারই অন্যতম প্রমাণ। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক ও লেখকের মন সব সময়েই উৎসুক হয়ে থাকবে, এ কথা মোটেই আশ্চর্য নয়। তবু অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকের চিন্তা-ভাবনা আচ্ছন্ন করে যাঁর রচনা প্রসারিত ছিল, আমাদের ভাষা ছন্দ কবিতা নাটক গান উপন্যাস ছোটগল্প, এমনকি সামাজিক চালচলন শিষ্টাচার সুমিতিবোধ হতে শুরু করে রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রত্যেক দিকে যাঁর ভাবরস আমাদের সর্বদা পুষ্ট করেছে, মরজগতে তাঁর অনুপস্থিত ঘটবার পরই এই বিরাট বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সবিশেষ আলোচনা হবে, এ খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রপ্রতিভা এতই বিরাট যে তার সামগ্রিক ও সর্বদিকব্যাপী অখণ্ড আলোচনা করতে হলে আর-একজন রবীন্দ্রনাথেরই দরকার। সেইজন্য আলোচ্য গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রপ্রতিভার এক-একটি দিক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝতে হলে রবীন্দ্রজীবন জানা এবং আলোচনা করাও অপরিহার্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোভাবে কবি, তাঁর কবিতায় সুন্দরের উপাসনা জীবনে সুন্দরের উপাসনা থেকে পৃথক্ হয় নি। আলোচ্য বইগুলিকে সেইজন্য প্রথমেই দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধে আলোচনা এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা; যদিচ ও-দুটির মধ্যে কঠিন ভেদরেখা কখনোই টানা চলে না।

প্রথম রবীন্দ্রজীবন সংক্রান্ত বইগুলির উল্লেখ করি। গোড়াতেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থের। এর তৃতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডে কবির জন্মকাল থেকে ১৩০৮ সাল, অর্থাৎ কথা ও কাহিনী এবং ক্ষণিকার যুগ পর্যন্ত আলোচনা আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩০৮

সাল থেকে ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) সাল পর্যন্ত; তৃতীয় খণ্ডে ১৩২৫ সাল হতে ১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) সাল পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিই-বা তথ্য জানা ছিল।··তার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয়েরা কবির জীবনী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন।" সেইসমস্ত তথ্য ও উপকরণই এই সংস্করণে এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু জানতে চান বা যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে বা আলোচনা করতে চান তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য। কবির দৈনন্দিন জীবন, তার খুঁটিনাটি কথা, কোন্ ঘটনা কবির মনে কেমন ছায়াপাত করেছে, কোন্ কোন্ দেশে কবি গিয়েছিলেন, কি পরিবেশের মধ্যে কি কাব্য রচিত হয়েছিল— এইসমস্ত বিষয়েই রবীন্দ্রজীবনের একটি সাবলীল বর্ণাঢ্য অথচ তথ্যনিষ্ঠ চিত্র বইটিতে পরিস্ফুট। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হয়েছে, তখনও সবুজ পত্রের যুগ চলেছে, সেই সময় এই তৃতীয় খণ্ডের শুরু। কবির কয়েকবার য়ুরোপ-ভ্রমণ, আমেরিকা-গমন, সিংহল মালয় চীন জাপান দক্ষিণ-আমেরিকায় গমন, যবদ্বীপ শ্যাম ও বৃহত্তর ভারতের অন্যান্য অংশ পর্যটন, তাছাড়া রুশিয়া ও পারস্য ভ্রমণের বর্ণনা এই খণ্ডটিতে আছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব— এরই মধ্যে রচিত হয়েছে শিশু ভোলানাথ, মুক্তধারা থেকে শুরু করে চার অধ্যায় পর্যন্ত গ্রন্থগুলি। তাছাড়া এই যুগের মধ্যে কবিজীবনের কতকগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, বিশ্বভারতী-স্থাপনা, পরে শ্রীনিকেতনেরও সূচনা। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে কবির যোগ ঘন ও নিবিড় হয়ে উঠল। অন্যদিকে, এই যুগের মধ্যেই চিত্রকররূপে তাঁর আবির্ভাব হল, নৃত্যকলার পরীক্ষা হল শুরু। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়া, রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-ত্যাগ, তার পরে সত্যাগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক, 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক প্রবন্ধ, পুনা-চুক্তি— সংক্ষেপে মণ্টেগু-আইনের শুরু থেকে ১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন আইনের পূর্ব পর্যন্ত সারা যুগটিতে রবীন্দ্র-মানসের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কবিপ্রতিভার দীপ্ত মধ্যাহ্নের কাহিনী আছে এই খণ্ডটিতে। এইরকম পরিশ্রম ও যত্নের সঙ্গে রবীন্দ্রজীবন বর্ণনা করার জন্য গ্রন্থকার সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের কবিকথা রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা বটে, কিন্তু ও ধরনের জীবনকথা নয়। ধারাবাহিক জীবনী লেখবার প্রয়াস এতে নেই, এ হল মানুষ রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত ঘরোয়া জীবনযাত্রার টুকিটাকি নানা কাহিনীর সুমধুর ও স্বচ্ছন্দ বর্ণনা। লেখক বহুকাল রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তার স্বীকৃতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন এবং বইটিতে তা ছাপাও আছে। সেই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্যে সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার নানা বিচিত্র ছোট ছোট কাহিনী এ বইটিতে সংগৃহীত। মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, রূপে প্রতিভায় ব্যক্তিত্বে চোখ-ধাঁধানো রবীন্দ্রনাথ— কবির এই বিশ্ববিজয়ী মূর্তির আড়ালে একটি সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছবি অপরূপ হয়ে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ কিরকম মুঠো মুঠো বায়োকেমিক ঔষধ খেতেন অনবরত, দু-চার দিন পর পরই বাড়ি বদলাবার ধুম উঠত, একবার খুব সাদাসিধে জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে বিছানায় কম্বল জানলায় কম্বলের পর্দা, ঘরময় কম্বল লাগিয়ে শেষকালে ছারপোকার উৎপাতেই হোক্ কম্বলের রোঁয়াতেই হোক্ একেবারে অস্থির কাণ্ড, শেষপর্যন্ত কবিকে প্রায় স্নানই করতে হল ফ্লিট্ দিয়ে— এইরকম নানা ঘটনার উল্লেখ আছে বইটিতে। তাছাড়া অপরাধী কেমন

সহজে মার্জনা পেত কবির কাছে, কাউকে পীড়া দিতে কবির চিত্ত সহজেই বিমুখ ছিল, কবির কেমন আসর বসত, এসবেরও ছবি বইটিতে আছে।

রবীন্দ্রজীবনী লেখার চেয়ে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনা করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার আবার সমালোচনা করা তার চেয়েও অনেক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ আজকালকার যুগে। বাস্তবিক-পক্ষে সমালোচনার সূত্র কি, এই নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করতে গেলে সমালোচক তার এক-একটি দিক, যেমন, ভাষা আঙ্গিক ইত্যাদিতেই আটকে যেতে পারেন; এবং এইরকম বিশিষ্ট দিক-আশ্রয়ী আলোচনার প্রয়োজনও কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রমানসের ব্যাপকতর আলোচনা করছেন তাঁদের কাছে পাঠক স্বতঃই আশা করবেন যে তাঁরা আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানসের মূল সুরটি ধরিয়ে দেবেন; অথবা, রবীন্দ্রমানস কি বৈচিত্র্যের সঙ্গে আলোচ্য বস্তুর মধ্যে কি বিচিত্রভাবে বিকশিত হচ্ছে সেই কথাটি ফুটিয়ে তুলবেন। শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের হাতে পড়লে এই সমালোচনাই নতুন এবং অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়; যেমন রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালিদাসের সমালোচনা। কিন্তু ও-পর্যায়ের সমালোচনার কথা ছেড়েই দিলাম, ওগুলি ক্বচিৎ মেলে। সাধারণক্ষেত্রে একজন কবির মূল কথাটা কি, সেটা তাঁর কাব্যে কি বিচিত্রভাবে ফুটল, সেটা কেন আমার ভালো লাগল— পাঠকদের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার যাচাই করা সমালোচনার অন্যতম পদ্ধতি। কিন্তু কালক্রমে সমালোচনার আদর্শও বদল হতে চলেছে। এককালে এলিয়ট্ প্রমুখ সমালোচকেরা কবি বা সমালোচকের ব্যক্তিচিত্তকে প্রায় অস্বীকার করে একধরনের বিচিত্র নৈর্ব্যক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আজকাল দাবি দাঁড়িয়েছে এই যে, কোনো রচনা শুধু ভালো হলেই হবে না, প্রচলিত সামাজিক আদর্শে ভালো হতে হবে। কবি, সার্থক কবি, কখনই 'অ-সামাজিক' হতে পারেন না, তাতে তাঁর কবিধর্মই ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু যে-যুগে লঘু সামাজিকতা প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে সে-যুগে কাব্যাদর্শ রক্ষিত হল কি না, সে কথা আলোচনার বদলে সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হল কি না তাই নিয়েই সমালোচনা উন্মত্ত কলরবে আবর্তিত হতে থাকে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি কি না এ নিয়ে সময় সময় তর্ক দেখা যেত না।

আলোচ্য সমালোচনা-গ্রন্থগুলির লেখকেরা খুব স্পষ্টভাষায় এ নিয়ে তর্ক না করলেও তাঁদের মনে এসব চিন্তা যে কিছু কিছু ছায়াপাত করেছে তা তাঁদের আলোচনার বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে বোঝা যায়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থের। রবীন্দ্রকাব্যে বলাকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বলাকার রচনাকাল হল সবুজপত্রের যুগ, সে সময় রবীন্দ্রমানসে একটি বিরাট পালাবদল হচ্ছিল, একটা বিরাট বন্ধনমুক্তির সূচনা দেখা দিয়েছে। কবির কথায়, "তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল · আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।" বলাকা এই পটভূমিতে রচিত। শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন সেই পটভূমির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ে। বিভিন্ন সময়ে কবি নিজেই বলাকার কবিতাগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁর কিছু কিছু অনুলিখন শ্রীযুত প্রদ্যোতকুমার সেন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। তাছাড়া এইরকম শ্রুতিলিখিত ও প্রকাশিত ব্যাখ্যা ছাড়াও

শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন কবির সঙ্গে নানা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এবিষয়ে যা জানবার সুযোগলাভ করেছিলেন সে সবগুলি একত্র করে এই পরিক্রমা প্রকাশ করেছেন। তিনি কবিকে যেসব গাথা ও দোঁহা দিয়েছিলেন সেগুলিও গ্রন্থের প্রথম দিকে বলাকা-কাব্যের ইতিহাস উপলক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। কোন্ কবিতাটি কোন্‌খানে কি অবস্থায় রচিত তারও বর্ণনা আছে 'বলাকার জন্মকথা' নামক অধ্যায়ে। 'ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে বলাকার ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু স্বকৃত আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার পরে আছে প্রত্যেকটি কবিতার আলাদা ব্যাখ্যা। জীবন-দর্শন, ছন্দের স্বরূপ, গতিবেগ, বন্ধনমুক্তির আকুলতা ইত্যাদি বিষয়ে কবির অজস্র উক্তি এই বইটিতে ছড়ানো আছে, যার বহু অংশ সম্ভবতঃ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থখানি প্রচলিত অর্থে সমালোচনা নয়, এ হল পরিক্রমা; অর্থাৎ সমালোচকের নিজের কথার চেয়ে প্রধানতঃ লেখকের উক্তিরই বিন্যাস, যদিচ, সমালোচকের নিজের কথাও অনেকখানি এর মধ্যে আছে।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর গ্রন্থগুলি অসীম অধ্যবসায়ের ফল। তিনি সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, আবার বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্ররচনার সেই অংশের প্রায় প্রত্যেকটি বই বা প্রত্যেকটি কবিতার আলোচনা আছে। তাঁর রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর কবির বাল্যকালের রচনার আলোচনা, যে সময় কবির ভাষায় তাঁর কাব্যভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে মাত্র। বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও শৈশবসঙ্গীত প্রভৃতি কাব্য এ বইটিতে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচনার এই অংশগুলি স্বল্প-পঠিত এবং স্বল্প-আলোচিত, কবিও এগুলির প্রতি পরে আর কৃপাদৃষ্টি দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার পক্ষে এগুলির মূল্য কম নয়, এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম স্ফুরণের চকিত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও ধন্যবাদার্হ তাঁর অতি সুন্দর ভূমিকাটির জন্য। এ সময় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কেমন ছিল, সমাজের চেহারাটা কিরকম ছিল, ভূমিকাটিতে তার সুনিপুণ সাহিত্যিক আলোচনা আছে। লেখক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে বলেছেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন-এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর।" রচনার মধ্যে, বিশেষতঃ অন্য বইগুলিতে, অবশ্য লেখক কেবল সামাজিকতার মানদণ্ডে সাহিত্যবিচারের কোনো চেষ্টা করেন নি, নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের প্রথম খণ্ড অনেকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে গীতিনাট্য কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য ঋতুনাট্য ঋতুচক্র প্রভৃতি বিষয় আলোচিত; দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বনাট্যগুলির আলোচনা করা হয়েছে, যথা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, ইত্যাদি। লেখকের মতে এইসব রচনার মূল কথা হল তত্ত্ব। কাহিনী পুরোভাগে স্থাপিত হলেও তার প্রাধান্য নেই, কাহিনীর পিছনের তত্ত্বটিই মুখ্য। এই তত্ত্বনাট্যগুলির তিনটি পর্ব আছে, যথা, প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ; দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর; তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা। লেখকের মতে, প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তীকালের তত্ত্বনাট্যসমূহের পূর্বাভাস। দ্বিতীয় পর্বে কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলে গিয়েছে। তৃতীয় পর্বের সাধারণ লক্ষণ হল "এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস

প্রভৃতি প্রায় সমুদয় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্বভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পূজা, উপন্যাসে ব্যতিক্রম যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্বশিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই তত্ত্বপ্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।" এই তত্ত্বনাট্যগুলির সমস্যা ত্রিবিধ: মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। প্রথমটির উদাহরণ প্রকৃতির প্রতিশোধ, দ্বিতীয়টির উদাহরণ শারদোৎসব প্রভৃতি, তৃতীয়টির উদাহরণ অচলায়তন। এইরকম পর্ব ভাগ করা ছাড়াও বিশী মহাশয় আরও প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে এই নাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা 'অ-ভারতীয়' নয়, কারণ এগুলির মধ্যে সর্বত্রই বিষয়বস্তু ও মনোভঙ্গী সনাতন ভারতীয় ধারা হতে বিচ্যুত নয়, এমন কি আঙ্গিকও। অবশ্য তাঁর মতে অচলায়তনের অধিকাংশ চরিত্রই "রক্তাল্পতা-ব্যাধিগ্রস্ত, ছায়াপ্রায়, আইডিয়ার মুখোশমাত্র।"

বিশী মহাশয়ের রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের প্রথম খণ্ডটিতে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে নৈবেদ্য পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডটিতে বলাকা পর্যন্ত। তাছাড়া শেলি কীট্স ও কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনাও আছে। উপসংহারে লেখক রবীন্দ্রকাব্যে অতিকথন ও সামান্যকথন-দোষের আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ লেখক বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম মানবমুখিতা। এইখানেই কালিদাসের সঙ্গে বা য়ুরোপীয় মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা, কারণ পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমুখী আর ভারতীয় সাহিত্য— অবশ্য কালিদাস তার অন্যতম ব্যতিক্রম— প্রধানতঃ ভগবদ্‌মুখী। কিন্তু লেখকের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম হলেও তাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাতে কবি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানুষের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করতে পারেন নি। বারে বারে কবি মানুষের দ্বারে করাঘাত করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নি। তৃতীয়তঃ, "রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার এই ট্র্যাজেডি"র হাত এড়াতে গিয়ে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "প্রকৃতি মানুষের বিকল্প" হয়ে দাঁড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথ "প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে মানবপ্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন।"

বিশী মহাশয়ের আলোচনায় আভিধানিক বিস্তার আছে, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আছে, তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়ও আছে, বক্তব্যের দুঃসাহস আছে, প্রয়োজনবোধে অপ্রিয় সমালোচনা করতেও কুণ্ঠা নেই। যেমন, প্রকৃতিপ্রীতি মানবপ্রীতির বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথাটা অসাধারণ সন্দেহ নেই, বলতে সাহস লাগে। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এইসব সিদ্ধান্তের কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই লিখতে হয়। সংক্ষেপে বলা চলে, রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতি যত বড় স্থানই অধিকার করে থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথ রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পেরে প্রকৃতিপ্রীতির দ্বারা সেই অভাব মিটিয়েছেন এ কথা কি বলা চলে? অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথও কি নিজের জলন্ত ব্যক্তিসত্তাকে স্তিমিত রেখে দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি, যেখানে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনাই কখনো শান্তভাবে কখনো তীব্র তীক্ষ্ণভাবে তরঙ্গিত হচ্ছে? তাছাড়া, যোগাযোগ কি রবীন্দ্রসাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন? বহু

খ্যাতনামা সমালোচকের মতে যোগাযোগ একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অসাফল্যের স্বীকৃতি। আমার তো মনে হয়, যোগাযোগ রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে 'অ-রাবীন্দ্রিক' রচনার অন্যতম তো বটেই, গল্পগুচ্ছের 'শাস্তি' গল্পটি ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে একহিসেবে হয়তো সবচেয়ে নিষ্ঠুর রচনাও। কিন্তু এমনি সাধারণ সাহিত্য বিচারেও গল্পটি কাটাছেঁড়া, অস্বাভাবিক ও স্বল্পকৌশলী রয়ে গেছে— সুবৃহৎ বিস্তার সত্ত্বেও গল্প দানা বাঁধে নি। নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক একজায়গায় বলছেন, প্রকৃতির প্রতিশোধ পড়বার সময় "মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি ফাউস্ট পড়িয়াছিলেন? আমার বিশ্বাস, নাটকখানি লিখিবার আগে ফাউস্ট পড়িবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ফাউস্ট পড়ে অথবা না পড়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখেছিলেন কি না এই অনুসন্ধান সাহিত্যবিচারে অত্যাবশ্যক তো নয়ই, সম্ভবতঃ অবান্তর— প্রসঙ্গান্তরে বিশী মহাশয়ও সে কথা স্বীকার করেছেন। অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও এইসব প্রশ্ন, এমনকি সাহিত্যবিচারের মূল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তর্কের বীজও বইগুলির মধ্যে রয়ে যায়।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা ঠিক একই ধরনের বা একই দরের বই না হলেও নিঃসন্দেহে একই মেজাজের বই। অর্থাৎ লেখক সিদ্ধান্ত যা-ই করুন না কেন, সে-বিষয়ে পার্থক্য থাকুক না কেন, সাহিত্যের দিকে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা সমগোত্রীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমার আলোচ্য প্রথম খণ্ডটি কেবল রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা। ভূমিকায় লেখক বলছেন, "বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র তীর্থমণ্ডলের পথে পথে আমার দৃষ্টিতে যে দৃশ্য, যে বৈশিষ্ট্য, যে রহস্য ও যে বিস্ময় ধরা পড়িয়াছে, তাহাই অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে গভীর আনন্দের সঙ্গে।" এই হল প্রথম উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে লেখক আরও বলছেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে কবিতার পূর্ণ অর্থবোধই সাধারণ পাঠকের রসোপলব্ধির মূল ভিত্তি। আভাস বা ইঙ্গিত রসিক ও বিদগ্ধজনের পক্ষে পর্যাপ্ত, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সঙ্কেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" এইখানেই তো একটা বড় প্রশ্ন উঠে পড়ে। অস্পষ্টতার অভিযোগের সম্মুখীন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহুবার হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেই ভয়ে সরলার্থ করবার চেষ্টা করেন নি। অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। যেখানে রস ধ্বনি- বা ব্যঞ্জনা-সম্ভূত সেখানে সেই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা উপভোগের ক্ষমতা না থাকলে শুধু ব্যাখ্যা দ্বারা রস উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু বইটির দোষদর্শনের জন্য এ কথাটার উল্লেখ করছি না। বরং যেখানে যেখানে লেখক এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে সে ব্যাখ্যাগুলি সাধারণতঃ রসোত্তীর্ণই হয়েছে এবং রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটিকে উদ্‌ঘাটন করবার সহায়ক হয়েছে। বইটির আগাগোড়া ভাষার প্রসাদ ও চিত্তের আনন্দিত প্রসন্নতা আছে, যা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একেবারে অন্যধরনের সমালোচক, তিনি এসবের ধারে কাছে ঘেঁষেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য হল একটা সূত্র আবিষ্কার, যে সূত্রের বাঁধনে সমস্ত রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা। তিনি এইরকম একটা সূত্র আবিষ্কারও করে ফেলেছেন, সেটা হল ভাব থেকে মহাভাব এবং মহাভাব থেকে আবার ভাবাভাবে বিবর্তন। একটা ভাব থেকে বিবর্তন শুরু হয়ে মহাভাবে উপস্থিত হয়, সেটা ক্রমে ভাবাভাবে পরিণত হয়। আবার সেই ভাবাভাবই একটা নতুন ভাব হিসেবে গণ্য হয়, সেখান থেকে আবার এক নতুন পালার

মহাভাব ও ভাবাভাব চলতে থাকে। এইরকম চক্র অবিরাম চলছে— এই সূত্রেই সমস্ত রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা। বলা বাহুল্য, কোনো সার্থক কাব্যকেই এরকম সূত্রের খাঁচায় আটকানো যায় না, রবীন্দ্রকাব্য তো আরও নয়।

কাব্যের মধ্যে দর্শনের সূত্র আবিষ্কার করবার চেষ্টার এই বিপদ থাকলেও শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রদর্শন এই দোষ থেকে মুক্ত। কারণ, তার মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাব্যকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাই আছে, সূত্র বেঁধে দেবার চেষ্টা নেই। আর এ কথাও নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই সফলতার প্রধানতম কারণ হল যে লেখক প্রথমেই মেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি, তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা করতে হলে দার্শনিকের উচ্চ আসন থেকে মাপবার যন্ত্র নিয়ে এগোলে চলে না, কাব্যে ডুব দিতে হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি রবীন্দ্রদর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদের বাণী কি ভাবে রবীন্দ্রমানসে ছায়াপাত করল, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ হতে উচ্চারিত 'অমৃতের পুত্র' মন্ত্র রবীন্দ্রমানসে কি তরঙ্গ তুলল, সেই প্রাচীন মন্ত্রে তিনি কি নতুন সুর সংযোজনা করলেন, পশ্চিমী দার্শনিকেরা তাঁর মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, উপলব্ধির পদ্ধতি বা বিশ্বের রূপ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবধারা কি ছিল— এসবের স্বচ্ছন্দ সাবলীল এবং সার্থক আলোচনা পাওয়া যায় বইটির মধ্যে।

শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র করের জনগণের রবীন্দ্রনাথ বইটিতে আজকালকার সমাজাশ্রয়ী সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ছায়া ফেলেছে— লেখক প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জনগণের এবং জনমানসের কতখানি যোগ ছিল। 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ,' 'জনগণ ও রবীন্দ্রসংগীত,' 'রবীন্দ্রকাব্যে লোকবাণী,' 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধসাহিত্যে লোকসমাজ,' 'কবির দৃষ্টিতে জনগণ' ইত্যাদি সাতটি প্রবন্ধে বইটি সম্পূর্ণ। সমাজের উচ্চশ্রেণীতে জন্ম ও বিচরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কি করে সেই সংকীর্ণ সিংহাসনের বেড়া ভেঙে ওপারে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই কবিকে যে কৃষাণের জীবনের সত্যকারের শরিক, কি ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সার্বশ্রেণিক সেতুবন্ধন করতে পারে, নবজাগ্রত ভারতবর্ষে সমাজ গ্রাম ও শিল্পব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কি রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর নাটক ও অন্যান্য রচনায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কি রূপ ও কি পদ্ধতির কথা তিনি বলেছেন— সেসমস্ত আলোচনা প্রবন্ধগুলিতে আছে। অনেক সময় দেখা যায়, এইরকম সমাজাশ্রয়ী সমালোচনা তার দৃষ্টিভঙ্গীর একাশ্রয়িতার ঔদ্ধত্যে সাহিত্যের সীমানাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, ফলে অপঘাতমৃত্যু অনিবার্য। বর্তমান লেখক সমাজাশ্রয়ী আলোচনার মধ্যেও সুস্থ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই বইখানি উৎরে গিয়েছে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও রচনার গুণেও তা পাঠকদের আকর্ষণ করে।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বাংলার লেখক। প্রথম খণ্ড। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী। চার টাকা।
সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি। প্রথম পর্যায়। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। গুপ্ত প্রকাশনী। সাড়ে চার টাকা।
সাহিত্য ও আলোচনা। শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স। তুই টাকা।
সাহিত্যপ্রবাহ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ। তিন টাকা।
মনপবনের নাও। রৈবত। দিগন্ত পাবলিশার্স। তু টাকা আট আনা।

বিদ্যাসাগর-মধুস্থদনের সময় থেকে হিসেব করলে বাংলা সাহিত্যের বয়স হল এক শ বছর। এর মধ্যে বাংলায় কোনো সাহিত্যতত্ত্বদর্শীর আবির্ভাব হয় নি এমন নয়। যাঁরা সত্যিকার সাহিত্যস্রষ্টা, তাঁদের শিল্পচিন্তা থাকেই। তবে পৃথিবীর সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে যাঁর পরিচয় অল্প, তাঁর পক্ষে শিল্পভাবনা হয় অনেকটা প্রয়োগিক (empirical)। সমালোচনার রাজ্যে হয়তো তার মূল্য হয় কম, যদিও লেখকের মর্ম উদ্‌ঘাটনে তা সাহায্য করে। মধুস্থদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অনেক পরিমাণে পরিচিত ছিলেন। মধুস্থদনের চিন্তার কিছু আভাস তাঁর কথাবার্তা ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে একটি সেরা critical mind হিসেবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুস্থদনকে সমান স্থান দেওয়া যায় না। তবু আধুনিক বাংলার প্রথম সমালোচক-মন জন্মেছিল মধুস্থদনের মধ্যেই। বাংলা ভাষা ও ভাবের রাজ্যে তাঁর অসমসাহসিক অভিযানের অন্তরিতিহাস লেখা হলে তা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পত্তি হত। কিন্তু সে ইতিহাস লেখা হলেও তখন তার পাঠক মিলত না। বঙ্কিম তাঁর চিন্তাগাঢ় প্রবন্ধেরও পাঠক পেয়েছিলেন, বা বলা যায়, তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি মোটামুটি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের আলোচনা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর সময়েও নজির হিসেবে ব্যবহারযোগ্য কোনো সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার এদেশে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তবু পেয়েছিলেন বঙ্কিমসাহিত্য, মধুস্থদন-বিহারীলাল প্রভৃতির কাব্য। এ ছাড়া তাঁর সময়ে বৈষ্ণবকাব্য, সংস্কৃতকাব্য আবার নেমে এসেছে শিক্ষিত পাঠকের অভিজ্ঞতার কোঠায়। বিদেশী সাহিত্যও অনেক পরিমাণে অনুপ্রবেশ করেছে এদেশের চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ও বিদেশের যখন যে ঐশ্বর্য দেখেছেন, পেয়েছেন, নিজের মূল্যবোধের দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করতে কখনো দ্বিধা করেন নি। শুধু স্রষ্টা নয়, তত্ত্বদ্রষ্টা হিসেবেও যে তিনি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বাংলার সমালোচনাকে তিনি সার্থক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তবু এ কথা বলতে হবে, লেখক ও পাঠকচিত্তের যে রসাস্বাদ ও জিজ্ঞাসার সমবায়ে সমালোচনার আসর প্রস্তুত হয়, তা রবীন্দ্রনাথের যুগেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত তীক্ষ্ণধী সমালোচকের আবির্ভাব আবার কতদিনে সম্ভব হবে জানি না, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে সমালোচনার একটি আসর জ'মে উঠেছে। বহুমনের অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাসা এক খোলা সমিতির বৈঠকে মিলিত হতে চাইছে। দৃষ্টি পড়েছে সমালোচনার পক্ষে ভাষাকে উপযোগী ক'রে তোলার দিকে। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার পরিবেশন আর ভোক্তার অভাবে নিষ্ফল হচ্ছে না। বাংলার এক শ বছরের সাহিত্যের সদর রাস্তায় ও অখ্যাত অঞ্চলে চলেছে অনুসন্ধিৎসুর পরিক্রমা। রবীন্দ্রোত্তর এই যুগে গল্প কবিতা ইত্যাদির সার্থক সৃষ্টি কিছু পরিমাণে হয়ে থাকলেও যুগচিত্তের এমন কিছুকিছু লক্ষণ, এমন-একটি বুদ্ধিপ্রবণ অথচ মজলিশি মেজাজ দেখা যাচ্ছে যে, এ যুগকে বিশেষভাবে

সমালোচনার যুগ আখ্যা দিলে হয়তো তা নিরর্থক হবে না। এবং সমালোচনা এখন আমাদের চাই। সমালোচনাই সাহিত্যের এমন-একটি বিভাগ যেখানে বহু বিভিন্ন মনের সাক্ষ্য, বহু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুধু গ্রাহ্য নয়, আদরণীয়। সাহিত্য-সৃষ্টিলোকের এই অঞ্চলটাতেই লেখক-পাঠকের ভেদরেখাটুকু প্রবল নয়। এখানে লেখক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন পাঠকের ভূমিকা, পাঠক হঠাৎ দখল ক'রে বসেন লেখকের লেখনী।

যে বইগুলির আলোচনা করছি সেগুলির লেখকেরা একজন বাদে সকলেই অধ্যাপনা করেন। যিনি অধ্যাপক নন, তিনিও অধ্যাপক হলেই পারতেন। তা ছাড়া এঁরা সকলেই কাব্য-উপন্যাস ইত্যাদিও রচনা করেন। চিন্তাপ্রবণতা এঁদের কাছে আশা করা যায়; কিন্তু এঁদের কলম যে সেই চিন্তাকে পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব স্বীকার করেছে তার কারণ সাধারণ পাঠক আজ আর শুধু ভাবালুতায় সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, ভাবতে চায়। তাই এই লেখকেরা অগ্রসর হয়েছেন তাদের চিন্তার সেই চাহিদা মেটাতে। তা না হলে এই বাজার-মন্দার দিনে এইসব গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর সাহিত্যনিষ্ঠা, সক্রিয় মন, পরিশ্রমশীলতা ও সাহসের জন্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তিনি শুধু একটি কোনো মহৎ আদর্শকে আশ্রয় করে থাকেন নি, এমনকি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেও না। তাঁর কৌতূহলী চিত্ত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিল্পাদর্শের ধারণা ও উপলব্ধি স্বীকার করেছে। বাংলার লেখক বইখানিতে তিনি বেছে নিয়েছেন বাংলার কয়েকজন গদ্যলেখককে। এই লেখকরা হলেন: শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে, এবং গদ্যলেখক হিসেবে তাঁদের মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে। অপর কয়েকজনের রচনা অনেক আধুনিক পাঠকের কাছেই অজ্ঞাত। এমনকি শিক্ষিত পাঠকেরাও হয়তো এঁদের মধ্যে কোনো কোনো লেখককে একটিমাত্র বই বা বিচ্ছিন্ন রচনাংশের দ্বারা জানেন। শ্রীযুক্ত বিশী চেষ্টা করেছেন এই অন্যায়বিস্মৃতদের তাঁদের যোগ্যস্থানে স্থাপিত করতে, প্রত্যেকের সমগ্র রচনার বিচার করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দানটুকুর মূল্য নির্ণয় করতে। কিন্তু কোনো দানের যথার্থ মূল্য বুঝতে হলে সেই দান স্বীকৃত হয়েছে যে সাহিত্যে তারও প্রকৃতি ও গতির ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর গ্রন্থে শুধু নষ্টকোষ্ঠির উদ্ধারই করেন নি, খ্যাতি-অখ্যাতির যে বণ্টন আগেই হয়ে গেছে সতর্ক সুবিচারের দ্বারা তার সামঞ্জস্যবিধানের মহৎ প্রচেষ্টাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা নয়। তিনি চেয়েছেন বাংলা গদ্যের স্বরূপ স্বভাব ও প্রবণতার কথা ভাবতে। বাংলার গদ্যসাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিভাগ, যথা স্যাটায়ার ও ঐতিহাসিক উপন্যাস কেমনভাবে কোন্ বিশেষ লেখক-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ভূমিষ্ঠ হল, সে বিষয়েও তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রবল। কাজেই এক দিকে তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়েছে লেখকদের মানস-ইতিহাস, অপর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে দ্বন্দ্ব সমস্যা পরীক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রগামী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে। এ কাজ সহজ নয়। মাত্র ১১৪ পাতার একটি গ্রন্থে এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা দুরূহ বলেই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত বিশী এই রচনা-সমস্যার সমাধান করেছেন যেভাবে তা প্রশংসার যোগ্য। লেখকের মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ তিনি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই আরো কিছুকিছু

নমুনার জন্যে পাঠকমনে ঔৎসুক্য থেকে যায়। তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে যে গ্রন্থ বা পূর্বতন সমালোচনা বা জীবনকথার প্রয়োজন, সেইগুলিকেই নিপুণ গার্হস্থ্যে তিনি সাজিয়ে ধরেছেন। লেখকের ঠিক যেখানটিতে বিশেষত্ব, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর যে গুণটুকু মূল্যবান, ঠিক সেইখানেই তিনি তাঁর প্রশস্তির আলোকধারা বর্ষণ করেছেন। এর মধ্যে যখনই সুযোগ এসেছে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মূল সমস্যাগুলির কথা ভাববার তখনি তিনি কখনো-বা তাঁর বিচিত্র ও বিস্তৃত অধ্যয়ন থেকে আহৃত সমালোচনাসূত্রের সহায়তায়, কখনো বা নিজের মননশীলতার দ্বারা সেই সমস্যার মর্মোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্ত বিশী গদ্যরচনায় নৈয়ায়িক মন ও কল্পনাপন্থী মনের ক্রিয়া অনুধাবন করেছেন। তাঁর নিজের রচনায় এই দুই ভঙ্গির একটি সুসামঞ্জস্য ঘটেছে, যা প্রীতিকর। সামগ্রিকভাবে তিনি ফরাসী আদর্শের প্রাঞ্জলতা তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছলতা বজায় রেখেছেন, আবার প্রয়োজনমত কল্পনাসমৃদ্ধির সাহায্য নিতেও দ্বিধা করেন নি। বলেন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে কোনারক মন্দিরের তুলনায়, অবনীন্দ্রনাথের মানস-ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তাঁর এই ভাবময়তার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সমালোচক হিসেবে বিশী মহাশয়ের প্রবণতা সূত্রান্বেষণের দিকে। তাই তাঁর গ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এর দ্বিধাহীন বাচন। এর সুবিধাও যেমন আছে, অসুবিধাও কিছুকিছু থাকা স্বাভাবিক। জনসনীয় সমালোচনারীতি ও ইংরেজি সাহিত্যে তার হ্রাসবৃদ্ধিশীল প্রভাবের কথা ভাবলেই এই রীতির ভালো ও মন্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক রীতি সিদ্ধান্তের দিকে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, কিন্তু তার কাছে সিদ্ধান্তের চেয়ে সন্ধানের সতর্কতাই মূল্যবান।

বাংলার লেখকের মুদ্রণ ও প্রচ্ছাদন চমৎকার। প্রতিটি লেখকের সুন্দর আলোকচিত্রে বইটি শোভিত। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী সকলেই বইটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন সন্দেহ নেই।

সূত্রের দোষে যাই থাক্, বহু বিচ্ছিন্ন তথ্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সূত্র আবিষ্কারের জন্যে যে প্রস্তুতির দরকার তা দুর্লভ। প্রথমে চাই বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, তার পর আলোচ্য বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ। তার পর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সূত্র-আবিষ্কার। সকলের ভাগ্যে ঐ যোগাযোগ সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত বিশী এই গুরুতর দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহসেরও একটা সার্থকতা আছে; তার দ্বারা স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ ফললাভ না হলেও অনেক সময় একটা মহৎ সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত হয়। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র সুসম্বদ্ধতার ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তের দায়স্বীকার করেন নি। অথচ দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-অধ্যয়নে যে রসাস্বাদ, যে তথ্যসম্ভার, যে প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নগুলি তাঁর মনে সঞ্চিত হয়েছে তাদের একটা-কোনো শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করবার তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন। সাহিত্যপাঠকের ডায়ারিতে তিনি তাঁর সাহিত্য স্মৃতি ও চিন্তাকে বিষয়ভেদে আলাদা আলাদা প্রবন্ধে সাজিয়ে দিয়েছেন। বিষয়নির্বাচনে কোনো প্রাসঙ্গিক পূর্বাপরতা রাখবার চেষ্টা নেই। তার ফল ভালোই হয়েছে। এই ধরনের বইয়ে যে স্বাধীনতাবোধ লেখক ও পাঠক দুপক্ষেরই প্রয়োজন তা রক্ষিত হয়েছে। বিষয়সূচীর পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি এই: বীরবলের ভাষা; দৃষ্টিকোণ, প্রকরণ ও পরিভাষা; কৃত্তিবাস; আধুনিক বাংলা গদ্য, পত্র ও পত্রসাহিত্য, সাহিত্যে সংকেতভাষণ, বিবিধ প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। এর থেকেই লেখকের রুচি ও চিন্তার বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে। এইসব প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য বিভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে একত্রিত করাও একটা কাজ। লেখক প্রায় প্রতি প্রবন্ধেই

এই কাজ নিপুণভাবে করেছেন, যদিও তার ফলে তাঁর কোনো কোনো রচনা নামের নামাবলী ও তথ্যের তালিকায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি প্রশ্ন করেছেন, সমস্যাগুলিকে তীক্ষ্ণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র আর পাশ্চাত্য সমালোচনা— এ দুয়ের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে, তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনো অনাবশ্যকভাবে সংস্কারকঠিন হয়ে ওঠে নি। কখনো যে কোনো সিদ্ধান্তই তিনি করেন নি এমন নয়। পরিভাষার নির্বাচনপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর মতামত জানিয়েছেন, এবং তাতে বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছেন। যেমন রচনা ও প্রবন্ধ লেখাটিতে। আর্নল্ড ও বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁর মতামত তাঁর মননশীলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিছু পরিমাণে এবং মাঝেমাঝে জার্নালিজ্‌ম্‌ দোষাক্রান্ত হলেও সাহিত্যপাঠকের ডায়ারির উপভোগ্যতা সকলেই স্বীকার করবেন। লেখকের মনটি দ্রুতচারী ও নিপুণ। তাঁর ভাষাও তাঁর মনের অনুযায়ী। আধুনিক বাংলা গদ্যের যে লক্ষণ তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজের গদ্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। অনেক তথ্যভারকে অবলীলাক্রমে সংযত করে ভাষার দীপ্তি ও গতিশীলতা রক্ষা করা ক্ষমতার কাজ। সে ক্ষমতা হরপ্রসাদ মিত্রের আছে। সাহিত্যপাঠকের ডায়ারির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্যে আমরা উৎসুক রইলুম।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের সাহিত্য ও আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ ও ক্লাসিসিজ্‌ম্‌, বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ, স্টাইল, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের বহু-আলোচিত বিষয়। নতুন ক'রে এই ধরনের বিষয় আলোচনায় গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার প্রয়োজন। তা না হলে অনেকটা প্রচলিত মতামতের পুনরুক্তির মত শোনায়। বইটির দ্বিতীয়ভাগে তিনি বাংলার কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনা বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের উপন্যাসসৃষ্টির মধ্যে নীতি ও হৃদয়, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব কেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের এই অংশ সুখপাঠ্য। লেখকের সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যপ্রবাহে কিছুকিছু সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকলেও প্রধানতঃ বইখানি তাঁর সাহিত্যপাঠের আনন্দের বণ্টন। সমালোচনার ক্ষেত্রে মতামতের তীক্ষ্ণতামুক্ত আনন্দ প্রকাশেরও যে সার্থকতা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বইটির শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রভৃতির উপর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। কিন্তু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতা ও জাপানী কবিতা এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি প্রবন্ধই ভালো লাগল। বাংলা কবিদের অনেকেই আজ অবহেলায় বিস্মৃতপ্রায়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মনে তাঁদের কাব্যের প্রতি যে দরদ সঞ্চিত আছে তার পরিচয় চিত্তাকর্ষক।

সাহিত্যরচনার পর হয় তার প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আবার প্রচারিত করতে হয়। যা ছিল লেখকের নিভৃত কক্ষের প্রয়াস, তা গিয়ে পৌঁছয় সাহিত্যের বাজারে। এই বাজারের হালচাল সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক পাঠক দু পক্ষেরই ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। রৈবত মনপবনের নাও বইটিতে এই মুখরোচক এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সুরটি অন্তরঙ্গ। লেখক কোনো গম্ভীর ভূমিকার অন্তর্বর্তী হয়ে কথা বলেন নি। তাই তাঁর কথা সহজেই মনে পৌঁছয়। তাঁর অনেক মতামতেই পাঠকেরা সানন্দে সায় দিয়েছেন ও দেবেন। বিশেষতঃ তাঁর মাইনর লেখক, মাসিকপত্র, নাট্য ও বেতারনাট্য, আধুনিক গান, সাহিত্য ও প্রচার প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখক পাঠক প্রকাশক, অর্থাৎ

সাহিত্যের বাজারের সকল পক্ষেরই অনুধাবনযোগ্য। রৈবত তাঁর মনপবনের নাও -খানি নিয়ে সাম্প্রতিক বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা ও জনজীবনের বিতর্কমুখর অঞ্চলগুলির মধ্যে দিয়ে বেশ 'এক চক্কর' ঘুরে এসেছেন। এর জন্যে এই 'নাও'এর নেয়েকে কোনো দুঃসাধ্য অধ্যবসায় করতে হয় নি, তিনি শুধু 'সহজবুদ্ধির পালটি' তুলে দিয়েছেন। তাইতেই নৌকো এগিয়েছে তরতর করে। এই সহজবুদ্ধির প্রসাদেই তাঁর দৃষ্টিটিও হয়েছে পরিষ্কার। তাই তিনি সাহিত্য ও শিল্পের সম্যক্ প্রচারকে যেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন, অপর দিকে 'ব্যবসায়ের বশংবদরূপে' তাদের ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি দেখেছেন ও দেখিয়েছেন যে, জনপ্রিয়তাই সাহিত্যের মাপকাঠি নয়, এবং কেবলমাত্র অসাধারণ হবার উৎকট চেষ্টা করলেই অসাধারণত্ব-লাভ হয় না। তিনি মনে করেন, 'সর্বমানবের মনকে যদি সাধারণ বলে অভিহিত করা যায়, তবে সেই সাধারণত্বের স্তরে নিজের মনকে বিচরণ করাতে না পারলে কোনো প্রতিভাই পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে না'। দেশের নেতৃস্থানীয়দের বক্তৃতা ও উপদেশবাহুল্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একমাত্র উৎকৃষ্ট জীবনের পরিবেশ তৈরি করেই উৎকৃষ্ট জীবন তৈরি করা সম্ভব'। রৈবত যে সহজবুদ্ধির জয়গান করেছেন, আজকের দিনের মানুষের বিভ্রান্ত জীবনে তার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। রৈবত আধুনিক গানের 'অর্থহীন আর্তনাদে' বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্তু শুধু গান কেন— আধুনিক মন, আধুনিক জীবনও এক অর্থহীনতার ব্যাধির দ্বারা আজ আক্রান্ত। আজ আবার বিদ্যাসাগরের মত সহজ সতেজ একটি চরিত্রের আবির্ভাব হওয়া দরকার। নানারকমে জীবনের, ললিতকলার যে কেন্দ্রচ্যুতি আজ ঘটছে, তবেই হয়তো তার নিরসন হবে। রৈবতকে ধন্যবাদ, তাঁর আক্ষেপ ও আবেদন হয়তো একটা হাওয়া-বদলেরই সূচনা করছে। মনপবনের নাও -এর ভাষা মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ভাষা। এর একটা সুবিধাও যেমন আছে তেমনি আবার মাঝেমাঝে নিভৃত আলাপের আলস্য সংক্রমিত হয়েছে ভাষার স্পন্দনে। তার গঠন হয়েছে কিছু শিথিল, বেগ হয়েছে মন্থর।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

ভ্রম-সংশোধন

১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। পৃ ৩৫, ছত্র ২৫। 'রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন' স্থলে 'রাধানাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন' হইবে।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান

সংযোজন ও সংশোধন

গত শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ৪৬-৪৮) হিন্দি-ভাঙা গানের যে পরিপূরক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে উল্লেখযোগ্য ছিল —'আনন্দ তুমি স্বামী' ও 'ব্যাকুল প্রাণ কোথা' গান দুটি শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির প্রমাণে হিন্দি-ভাঙা বলিয়া জানা যায়। স্বরলিপি-গীতিমালায় 'ভাসিয়ে দে তরী' গানের স্বরলিপি-শীর্ষে সুরকারের নাম না থাকায় উহা হিন্দি-ভাঙা মনে হয়, বহুশঃ উহার সদৃশ বলিয়া 'কাছে তার যাই যদি' গানটিও হিন্দি-ভাঙা মনে করা হইয়াছে। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' যে হিন্দি-ভাঙা, ইহা শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার রবীন্দ্রসংগীত (সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ ১০৯) পুস্তকে লিখিয়াছেন। বিশ্বভারতী-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় গানের তালিকায় ও প্রথম পাদটীকায় (পৃ ৪৬ ও ৪৭) হিন্দি 'নইরে মা বরণ' গানের সহিত 'একি করুণা করুণাময়' ও 'এই-যে হেরি গো দেবী'র সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত, 'এই-যে হেরি গো দেবী' গানের অধিকতর সাদৃশ্য আছে হিন্দি 'মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ' গানের সহিত, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র -সংখ্যায় ২১০ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখও আছে। 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' গানের সুর গুণী শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে পাওয়া গিয়াছিল, ১৮ মাত্রার 'নবপঞ্চতাল'টি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত— এ তথ্য দিয়াছেন শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পূর্বতালিকাধৃত একটি এবং নূতন চারিটি গানের মূল আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহার মধ্যে হিন্দি গান কয়টির সহিত বাংলা গানের সাদৃশ্যের বিষয় জানাইয়াছেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, আর কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গানটি যে বিলাতি গানের সদৃশ তাহার সন্ধান দিয়াছেন শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী।—

	বাংলা গান	আদর্শ	রাগ-তাল
	আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী-সুরফাঁকতাল
	নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কহোরি	গান্ধারী-ত্রিতাল
	রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	খাম্বাজ-ত্রিতাল
	সখী, আঁধারে একেলা ঘরে	সখি, আওত আঁধেরি ঘটা	
ও	দেখবি রে ভাই	*The Vicar of Bray*	বিলাতি সুর

চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যকার ও বহুভাষাবিৎ অনুবাদক, গীতরচয়িতা ও স্বরলিপিকার রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁহার চিত্রসাধনার সহিত দেশের সম্যক পরিচয় ঘটে নাই।

অতি তরুণ বয়স হইতেই প্রতিকৃতি-চিত্রণে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল,[১] এবং শেষজীবন পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। খ্যাত-অখ্যাত, আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু শত লোকের পেনসিল-স্কেচ তিনি করিয়াছেন— কিন্তু সেগুলি প্রকাশের বিশেষ কোনো আয়োজন করেন নাই, সেগুলি যে বিশেষভাবে প্রকাশযোগ্য এমন কথাই সম্ভবত তাঁহার মনে হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দুই-চারিখানি মাত্র তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা বৈশাখ ১২৯২ বালক পত্রে তাঁহার 'মুখ চেনা' প্রবন্ধের আনুষঙ্গিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর প্রতিকৃতি, ফাল্গুন ১৩১৮ ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবি, বৈশাখ ১৩২০ মানসী পত্রে প্রমথ চৌধুরীর চিত্র। রবীন্দ্রনাথের ছবি-কয়টির প্রতিলিপি দেখিয়া বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়ম রোথেনস্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহার উদ্‌যোগে বিলাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে চিত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়, দুঃখের বিষয়, যোগাযোগের অভাবে তাহাও এদেশে বহুল প্রচারিত হয় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া রোথেনস্টাইন তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া যে চিঠি লেখেন তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

II. Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept. 14. '12.

My dear sir,

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been— and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sisters it has been my privilege to meet— I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us

১ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'। পৃ ৪৪ - ৪৫

here ; there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India— a hope which is very near my heart— the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfully yours
William Rothenstein.

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—
ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist ; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত। যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোথেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত ; এ কথাটা চাপা রাখ্‌লে চল্‌বে না। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি[২]

১৯১৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত পঁচিশখানি প্রতিকৃতির একটি সংগ্রহ[৩] বিলাতে প্রকাশিত হয়—

Twenty-five Collotypes/from the Original Drawings by/Jyotirindra Nath Tagore/Hammersmith/Made & printed by/Emery Walker Limited/1914

রোথেনস্টাইন এই গ্রন্থের ভূমিকায়, Durer, Holbein প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সহিত

২ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য চিঠি, 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

৩ এই গ্রন্থ হইতে কয়েকখানি চিত্র, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্র দুইটিতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০, "অবনীন্দ্রনাথ" ; কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, "সৌদামিনী দেবী" ; VISVA-BHARATI QUARTERLY, November 1910 "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর"।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি তুলনীয় এই কথা বলিয়া, পরিশেষে মন্তব্য করেন—"I know of few modern portrait drawings which show greater beauty and insight." গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এই ভূমিকার অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Two or three years ago I noticed, in a Bengali Review sent me by a friend, some small reproductions of what appeared to me to be remarkable drawings. When Mr. Rabindra Nath Tagore was in England last year I discovered they were done by one of his own brothers. He immediately wrote for some of the originals, and I received from the artist, Mr. Jyotirindra Nath Tagore, the generous loan of a number of his sketch books. Mr. Tagore is not an artist by profession. He has long been in the habit of making drawings of his friends and relations, for his own pleasure and interest, and these drawings seem to me to show just those qualities of concentration and sincerity which we should expect, but so rarely get, from the amateur. The heads show a sensitiveness to form which is unusual. They seem to me also to be drawn with the most perfect naturalness. Here is neither pre-occupation with Western models nor a conscious attempt to follow a Mogul tradition. The drawings of Indian ladies are especially remarkable. The 17th and 18th centuries imposed so weak and characterless a vision of woman on the European artist, that one has almost to go back to Durer and Holbein to find such frank and sincere portraits as these. Seeing the extraordinary variety and interest of the life about them, I have always wondered why the younger Indian painters adopt both the subjects and the formulas of the Mogul and Rajput traditions.

This is probably a momentary phase in the growth of modern Indian painting and is clearly due to a gallant desire to resist the thoughtless adoption of bad European workmanship and trivial and stupid subject matter. But there is good European painting and drawing and no lack of noble vision, and the influence of these would perhaps not be harmful, though probably few, if any, examples of this kind have reached India. If no vital school can be founded on the conscious adoption of an alien style, it is not likely to be brought to life by the practice of conscious archaism. It is not art which produces art, but passion. Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as

infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Jyotirindra Nath Tagore. It is of a simple and modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter.· ·

I know of few modern portrait drawings which show greater beauty and insight.

W. Rothenstein

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইসকল ছবির খাতা ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে দিয়া যান—'নতুন কাকামশায়ের শেষ দান'। বর্তমানে তাহার অধিকাংশ 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সংগ্রহে আছে। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন[8] তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"এই ছবিব খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হল কই আমরাও তো ছবি আঁকি কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র স্থন্দর অস্থন্দর নির্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি। কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর কাছে স্থন্দর হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার স্থষ্টি সবই তাঁর কাছে স্থন্দর ঠেকল কোনো মুখ অস্থন্দর রইল না। রূপবিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না!"

বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর যে একমাত্র ছবিখানি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত— বিহারীলালের আর কোনো ছবি রক্ষিত হয় নাই।

দ্রষ্টব্য ॥ 'রেখা-চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'; মানসী, বৈশাখ ১৩২০; শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" পৃ ১৩৮-৪৬।

---

৪ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর", বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২

স্বরলিপি

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও,ওগো, ধরতে দাও ;
ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল,
হোথায় আমায় ডুবতে দাও,ওগো, মরতে দাও ॥
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ;
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও,ওগো, পরতে দাও ॥
বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও ।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও,ওগো, সরতে দাও ।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন—
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II { র্সা র্সনা -া । নধা পা -া I পমা গা -া । রা গা -া I
মা লা ০ হ তে ০ খ সে ০ প ড়া ০

I গরা গা -মা । পা -া মা I গা -া -া । -া -া -মা I
ফু লে র্ এ ক্ টি দ ০ ০ ০ ০ ল্

I মরা গা -া । মা পা -া I পগা -া -মা । মা -া -পা I
মা থা য়্ আ মা র্ ধ ০ র্ তে ০ ০

I পা -া -া । ধা না -া I নপা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা ০ ও ও গো ০ ধ ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া} I পা -ধা ধা । ধা ধা -না I
দা০ ০ ০ ০ ০ ও ও ই মা ধু রী ০

I নপা -া -ধা । পধা -না না I ধপা -া -া । -া -া -া I
স ০ ০ রো০ ০ ব রে০ ০ ০ ০ ০ র্

I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা -া -া । -া -া -া I
না০ ই যে কো থা ও ত ০ ০ ০ ০ ল্

I পর্সা র্সা -া । র্সা র্সর্রা -র্র্সা I র্সনা -া -া । নর্সা -া -না I
হো০ থা য়্ আ মা০ য়্ ডু ০ ব্ তে০ ০ ০

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I ধপা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা০ ০ ও ও গো ০ ম ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া II
দা০ ০ ০ ০ ০ ও

II { পা -া ধা । ধপা ধা -া I -া -া -া । -া -া -না I
দা ও গো মু ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I নপা পা -র্সা । র্সনা ধপা -া I -া -া -া । -া -া -া } I
আ মা র্ ভা লে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা -া । -া -া -া I
অ প ০ মা নে র্ লি খা ০ ০ ০ ০

I র্রর্জ্ঞা র্রা -া । র্সা র্সা -া I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা I
নি ভৃ ০ তে আ জ্ ব০ ন্ ধু তো মা র্

I র্রনা না -র্রা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -র্রর্সা । -র্সনা -া -া I
আ প ন্ হা তে র্ টি কা ০০ ০ ০ ০

I নর্রা র্সা -া । না না -ধা] পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
ল লা ০ টে মো র্ প ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I ধপা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা০ ০ ও ও গো ০ প ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া II
দা০ ০ ০ ০ ০ ও

II সমা মা -া । মা মা -া I মা পা -া । পা পমা -পা I
ব০ হু ক্ তো মা র্ ঝ ড়ে র্ হাও য়া ০

I পগা গা -া । গা গা -মা I মা পা -া । -া -া -া I
আ মা র্ ফু ল ০ ব নে ০ ০ ০ ০

I (প)দা -া -দা । দা দা -ণা I (ণ)পা পদা -ণা । (ণ)দা পা -া I
শু ক্ নো পা তা ০ ম লিং ন্ কু সু ম্

I (প)মা -া -া । পা -া -ণদা I মপা -া -া । -া -া -া I
ঝ ০ র্ তে ০ ০০ দা ০ ০ ০ ০ ০ ও

I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -র্রর্সা I
পং থ্ জু ড়ে যা ০ প ড়ে ০ আ ছে ০০

I (র্র)না না -র্রা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -র্রর্সা । -না -া -া I
আ মা র্ এ জী ০ ব নে ০০ ০ ০ ০

I (ন)র্রা -া র্সা । (র্স)না না -ধা I পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা ও গো তা দে র্ স ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা ০ ০ ও ও গো ০ স ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া I র্সা র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা (র্জ্ঞ)র্রা -া I
দাং ০ ০ ০ ০ ও তো মা র্ ম হা ০

I র্সা -া -র্রা । র্জ্ঞা া -া I র্সনা -া -া । -া -া -া I
ভা ০ ন্ ডা রে ০ তেং ০ ০ ০ ০ ০

I নর্সা র্সা -না । র্সা [illegible] -র্জ্ঞা I (র্জ্ঞ)র্রা -া -া । -া -া -া I
আং ছে ০ অ নে ক্ ধ ০ ০ ০ ০ ন্

I র্রর্জ্ঞা র্রা র্সা । র্সা র্সা -া I র্সর্রা র্সা -া । (র্স)না না -ধা I
কুং ড়ি য়ে বে ড়া ই মুং ঠা ০ ভ রে ০

I (ধ)পা -া -া । -ধনা -র্সাঃ -নঃ I ধপা -া -া । -া -া -া I
ভ ০ ০ ০০ ০ ০ রেং ০ ০ ০ ০ ০

I সমা মা -া । মা মা -পা I পা -া -া । -া -া -া I
ভং রে ০ না তা য়্ ম ০ ০ ০ ০ ন্

I সমা -া মা । মা মা -পা I পা -া -ধা । পধা -না না I
অং ন্ ত রে তে ০ জী ০ ০ বং ন্ আ

I ধপা -া -া । -া -া -ধপা I মা -া -পা । মপা -ধাঃ -পঃ I
মাং ০ ০ ০ ০ ০র্ ভ ০ র্ তেং ০ ০

I মগা -া -া । -া -া -া II II
দাং ০ ০ ০ ০ ও

'আমাদের যাত্রা হল শুরু ওগো কর্ণধার !'

গোপালপাবেব সমদ · শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এ চিঠিটা নিতান্তই তর্ক করবার জন্যে। এবং সে তর্কটা সম্পূর্ণ অহৈতুক। সুরেন ও মুটুর বিবাহ সম্বন্ধে তুমি যে মন্তব্য প্রকাশ করেচ সেইটেই এর বিষয়। বিবাহ কোন্ হিন্দুমতে হবে সেটা তুমি বুঝতে পারচনা। তার প্রশস্ত উত্তর হচ্চে এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুমতে কায়স্থে বৈদ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে সেই মতে। অপূর্ব্ববঙ্গে এ বিবাহের প্রচলন নেই কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহকে এ অঞ্চলের লোক অবজ্ঞা করলেও অহৈতুক বলেন না, অতএব এ রকম বিবাহ একেবার মূলতই অহিন্দু, যেমন অহিন্দু সগোত্রবিবাহ, একথা ঠিক নয়। যাই হোক্ এটা হোলো ফ্যাক্ট নিয়ে কথা এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু এক জায়গায় তুমি প্রিন্সিপ্‌ল্ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ পথের দোহাই দিয়েচ, সেখানে চুপ করে থাকা অন্যায়। শ্রেয়ঃ কথাটা মস্ত বড়ো কথা, উপনিষদ্ বলেন, শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ। তুমি বলেচ সমাজবিধি শ্রেয়ের বিধি। পত্রাংশ উদ্ধৃত করি :— বিবাহ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা অনুরাগের জিনিষ নয়, সেজন্যে তাকে সংযত করতে সমাজ বিধিনিয়মাদি করেচেন ; কাজেই সমাজানুমোদিত একটা প্রচলিত পথে চলাই শ্রেয়ঃ। আহার সম্বন্ধেও বোধ হয় সে কথা খাটে ; বৈজ্ঞানিক বিধিসঙ্গত স্বাস্থ্যকরতা বা স্বাভাবিক রসনা-তৃপ্তির অনুগত স্বাদুতাকে সমাজ আহার সম্বন্ধে শ্রেয়ের পন্থা বলে গণ্য করে না,— তার বিশেষবিধি প্রাচীনকালীন প্রথা সঙ্গত, সে প্রথার অনুকূল যুক্তি নির্দ্দেশও অনাবশ্যক। শুধু তাই নয় সেই অন্ন কে রেঁধেছে বা কে এনেছে তার নির্ম্মলতা বা শোভনতার দিক থেকে নয়— অবিচারিত প্রথার দিক থেকে তার শ্রেয়স্করতা বিচার করাই সমাজের মতে বিহিত। এক্ষেত্রে অনুসংস্কারের দোহাই দিলে চুপ করে থাকব কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে স্তব্ধ থাকা কঠিন। সহবাসসম্মতি আইন পাস হবার পূর্ব্বে বালিকাবধূ সম্বন্ধে দুরাচার হিন্দুসমাজ স্বীকার করেছিল উক্ত আইনকে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলে তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। সেই রকম বিবাহ হিন্দুসমাজসম্মত একথা মানতে পারি কিন্তু তাই বলেই শ্রেয়স্কর একথা মানতে পারিনে।

সমুদ্রপারে যাওয়া একদা সমাজে অবৈধ ছিল এখনো অনেক পরিমাণে আছে। একথা বলতে দোষ ছিল না যে, সমুদ্রপারে যাত্রা করলে হিন্দুসমাজে বর্জ্জনীয় হবার কারণ ঘটত, কিন্তু সেই জন্যই সেটা শ্রেয় নয় এমন কথা বলা অন্যায় হত। যক্ষ্মারোগে পিতার মৃত্যু হলে সমাজ পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করে; যুক্তি এই যে— পূর্ব্বজন্মে পিতা পাপ করেছিলেন— দুর্ভাগা পিতার এই অপমান হিন্দুসমাজসম্মত কিন্তু সেটা শ্রেয়স্কর এমন কথা স্বীকার করলেও প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে নির্ম্মলস্বভাব বুদ্ধিমান সহৃদয় ও প্রতিভাসম্পন্ন তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্ম্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দুসমাজসম্মত তা মানি কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে— নুটু সমাজনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়— এটা একটা তথ্য মাত্র কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও তার কোনো উত্তর নেই কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্ম্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি কিন্তু সমাজ-কর্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্ম্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা চিরদিন আছি সমাজের বাইরে কিন্তু তবু অত্যাচার দেখলে উদাসীন থাকতে পারিনে, পরসমাজের ব্যূহে অনধিকার প্রবেশ করে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারিনে।

যাই হোক আমার এ চিঠি অহৈতুক তর্ক মাত্র— এর পিছনে কোনো তাগিদ নেই।

তোমার শরীরের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি দুঃসহ চিকিৎসাদুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আমার সামনে আশু একটি দুর্ভোগ আছে, সে হচ্চে আমার জন্মোৎসব। জন্মান্তরের দুষ্কৃতিজনিত এই জন্মের প্রখর রৌদ্রতাপ আমাকে অতিক্রম করে আমার বন্ধুবান্ধবদেরও তাপিত করবে এটা আমি অপরাধের বিষয় বলে মনে করচি— নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু স্নিগ্ধ জনেরা তাপকে তাপ বলে গণ্য করবেন না। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৩৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এই মাত্র পত্রসহ মোরব্বার রসিদ পাওয়া গেল। দানের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হওয়াই মানবধর্ম্ম। দাক্ষিণ্য যাদের স্বাভাবিক তাদেরই স্মৃতিচ্যুতি ঘটে না।

আজ অপরাহ্নে কলকাতায় যাচ্চি। ইতিমধ্যে তোমার আমলক যদি করতলন্যস্ত হয় তাহোলে সমভিব্যাহারেই যাবে— নইলে ফিরে এসে আশীর্ব্বাদসহ ভোগ শুরু করব।

সেই বইটার ব্যবহার শেষ হোলে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো, অনেক পাঠেচ্ছু আছে। অমিয়চন্দ্র বোধ করি অধ্যাপক উইণ্টরনিট্‌স্‌কে শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ শ্লোকটির উল্লেখ করে আমাদের শাস্ত্রে শ্রেয়োনীতির সমর্থন জানিয়েছেন। অধ্যাপক তদুত্তরে প্রাচীন টীকাভাষ্যসহ বুঝিয়েছেন এখানে শ্রেয়ঃশব্দ বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক পন্থা হিসাবেই ব্যবহৃত। যে চারিত্রনীতি একান্ত মানবসমাজের হিতার্থে সেটা ওর লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ এসমস্ত উপদেশ ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের পক্ষেই মুখ্যভাবে খাটে, লোকহিতের পক্ষে নয়। এর থেকে বোঝা যায় লোকহিতকেই চরম করে তার সাধনা আমাদের দেশে ছিল না, এইজন্যে সাধকেরা লোকহিতের প্রতি ঔদাসীন্য করে সমাজের অনেক অনিষ্টকে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি, প্রত্যেক জনসম্প্রদায় আপন আপন আচারকে আপন সংস্কারের মধ্যে বদ্ধ করে সার্ব্বজনিক মানবশ্রেয়কে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করতে পেরেছে এই কারণেই। আমাদের মুক্তি আত্মসম্ভোগেরই বিরাট আদর্শ, জনসেবা তার নেপথ্যে পড়ে গেছে। একথা যদি যথার্থ হয় তবে সত্যের অনুরোধে তা স্বীকার করাই উচিত হবে। মিথ্যা আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় এবং লজ্জাকর।

আশা করি তোমরা সপরিজনে ভালো আছ। রথী বৌমা শরীর শোধনের জন্যে গিয়েছেন গিরিডিতে। সেখানকার জলে অগ্নিবর্দ্ধন করে এমন একটা স্বতোবিরোধী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

এবারকার জলপ্লাবন তোমাদের আক্রমণ করে নি তো? আমার তিরোভাব ঘটবার পূর্ব্বেই একদা এখানে তোমাদের আবির্ভাব হবে এই প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি ভাদ্র ২০, ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার লেখাটি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি। ভালো হয়েছে সন্দেহ মাত্র নেই। কোনো ধর্ম্মকেই শাস্ত্রবচনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তার আত্মিক প্রাণ তার বাক্যদেহকে অতিক্রম করে আপন কাজ করে। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা অনেকদিন প্রবর্ত্তিত ছিল তার মূল প্রেরণা মহাপুরুষদের জীবনের গভীরে ছিল। যদি দেখা যায় আমাদের দেশের জলবায়ুতে তার উদ্যম মিইয়ে আসে সেটা প্রকৃতির ত্রুটি। পশ্চিম দেশে খৃষ্টধর্ম্মের উপদিষ্ট meekness ঐ প্রাকৃতিক কারণে ব্যবহারে পরিণত হোতে পদে পদে বাধা পায়, মূল ধর্ম্মের বাণী সত্ত্বেও। বিষয়টা জটিল— আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন বিচার করবার সময় বিচারকের নিজের সংস্কার তার মধ্যে গ্রন্থি পাকাতে থাকে।

দুই তিন দিনেই যাব কলকাতায়— যাত্রার দলের অধিকারী হয়ে। তদুপলক্ষে রাণুর সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি।

কয়দিন ধরে নিরন্তর দুর্য্যোগ চলেছিল। আজ প্রাতে দেবতার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখা দিয়েছে। তোমাদের ওখানে আকাশের মেজাজ বোধ করি এমন ভ্রূকুটিকুটিল নয়।

সকলে মিলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৭।১০।৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা শ্রীভক্তি দেবীকে লিখিত

ওঁ

Williamstown

Massachusetts

কল্যাণীয়া

ভক্তি, তুমি এসেচ আমাদের আশ্রমে, ভারি খুসি হয়েচি। এই সময়ে আমি আছি বহুদূরে, একটুও ভালো লাগচে না। বর্ষার সমারোহ বনে বনে আকাশে আকাশে জমেছিল, কদম্ববন নতুন করে প্রফুল্ল হোলো। কিন্তু আমি নতুন গানের ডালি নিয়ে দাঁড়ালুম না। শারদোৎসবের সময় হয়েচে— শিউলিতলায় সৌন্দর্য্যের সদাব্রত, আকাশে শুভ্রমেঘের আলস্যমন্থরতা, বাতাসে হিমের আভাস, তালবনের শিখরে শিখরে আলোকের পরশপাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে। আমি শারদার কাছে সঙ্গীতের বায়না নিয়ে বসে আছি অথচ আসরে পৌঁছতে পারলুম না। আমার এক বছরের পার্ব্বণী সব বাদ পড়ে গেল। যদি হত পরের চাকরী, তাহলে চাকরী আটলান্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতেম, কিন্তু নিজের কাজে ছুটি মেলেনা— কড়া মনিব ভিতরে বসে আছে, তার চোখ এড়াব সাধ্য কি। তবুও দিনের পরে দিন যায়— এগিয়ে আসে খালাসের দিন— অবশেষে একদা রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে পৌঁছব শালবনের ছায়া-বীথিকায়। হতভাগা ভিক্ষুকের পথ ক্রমেই যেরকম লম্বা হয়ে চলেচে তাতে বোধ হচ্চে মাঘ মাসের আগে দেশে পৌঁছতে পারব না। অর্থাৎ এখনো প্রায় আড়াই মাস আছে। প্রবাসের পঞ্জিকায় আড়াই মাসের ছন্দটা মন্দাক্রান্তা, হতাশ বিরহীর ছন্দ। এখন শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন, তোমরা কোথায় আছ কে জানে। জনশ্রুতি, তোমার বাবা চলেচেন চীনের মুলুকে। টিকতে পারবেন কী করে বুঝতে পারচিনে। এই কি চীনদেশে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব আলোচনার সময়? আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে সেখানকার নামগুলোর অনুস্বার ছাড়া আর কিছু মিলবে না, যথা সিং, চুং, চ্যাং ইত্যাদি। ১৩ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিকৃতি ও সমালোচনা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

কালিদাসের মত মহাকবিও সমালোচকদের স্থূল হস্তাবলেপের ভয়ে ত্রস্ত ছিলেন। দিঙ্‌নাগদের সযত্নে পরিহার করবার উপদেশই তিনি দিয়ে গিয়েছেন। একেবারে একালের কবি-সমালোচক এলিয়টও সমালোচকদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, দু-চারটি বিদগ্ধ সমালোচকের কথা বাদ দিলে দেখা যায় অধিকাংশ সমালোচকই পার্কে পার্কে রবিবারের জনসভার মত যে যার খুশীমত আবোল-তাবোল বকে যচ্ছেন।[১] বলা বাহুল্য, এই ধরনের সমালোচনার প্রাচুর্য যুগে যুগে থাকলেও তারা সমালোচনার মান নির্ণয় করে না। যাঁরা প্রকৃত সমালোচক তাঁদের হাতে কাব্যের রস আরও পরিস্ফুট হয়, তার বৈচিত্র্য ও তাৎপর্যের আরও গভীর রসোপলব্ধি হয়।

কিন্তু এই হতেই নানা প্রশ্ন উঠে পড়ে। প্রকৃত সমালোচক বলতে কি বোঝায়? এমন কি, ভালো কাব্য বলতেই বা কি বোঝায়? রসপরীক্ষার মানদণ্ড কি? এর সার্বকালিক ও সার্বজনিক মানদণ্ড কিছু আছে কি না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আজ যে কাব্য সর্বজনসমাদৃত, কাল সে কাব্যের আর তেমন আদর নেই। যুগে যুগে রুচি বদলায়, সেই অনুসারে ভালোলাগা-মন্দলাগার তারতম্যও হতে থাকে। একালের সমালোচনার ধারা হতেই দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। জয়দেব বাঙালীর প্রিয় কবি, তাঁর ললিতপদঝংকারে বাঙালীর কান মজে ছিল। এর বিরুদ্ধে বোধ হয় প্রথম প্রতিবাদ তুললেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি লিখলেন, জয়দেব অধিকাংশ কবির চেয়ে কাব্যের বিষয়-নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়েছেন, জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নিতান্তই একঘেয়ে, তাঁর কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, যথার্থ উচ্চ-অঙ্গের কবিতা রচনার অক্ষমতা বশতঃই তিনি লোক-সাধারণের চটক লাগাবার জন্য মিঠে ছন্দের ঝংকার দিয়ে ভাবের অভাব ঢাকতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে নীতির কোপেই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক ভারতচন্দ্র বহুকাল অপেক্ষাকৃত অনাদৃত ছিলেন। একালে বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীই প্রথম কলম ধরলেন ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ, তাঁর মনের আলোর দীপ্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা বলে শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language। বলা বাহুল্য, এটি প্রমথ চৌধুরীর মত বিদগ্ধ সমালোচকের রায় হলেও এ রায় সকলে মেনে নিতে দ্বিধা করবেন। কিন্তু দেখছি, একালের কিছু কিছু সমালোচকও, শুধু ভারতচন্দ্র কেন, অন্য যেসব লেখক যত পরিমাণে প্রাকৃত রস ও প্রাকৃত ভাষা পরিবেশন করেছেন তাঁদেরই তত উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য দিতে চান। ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁদের এইরকম মতবাদের পিছনে একটা ভ্রান্তিবিলাস আছে। আসলে এঁদের দাবী হল 'গণ-সংযোগ' 'গণ-সাহিত্য'।

---

১ "On giving the matter a little attention, we perceive that criticism, far from being a simple and orderly field of beneficient activity, from which imposters can be readily ejected, is no better than a Sunday park of contending and contentious orators, who have not even arrived at the articulation of their differences." T. S. Eliot: *Selected Essays*.

সেইজন্য এঁরা মনে করছেন প্রাকৃত রস ও প্রাকৃত ভাষা থাকলেই বুঝি সে সাহিত্য মাজা-ঘষা তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীগুলির ছোঁয়াচ এড়িয়ে 'গণ-সাহিত্য' হয়ে গেল। এই ভ্রান্তিবিলাস থেকেই এই মতবাদের উৎপত্তি, সেইজন্য এই মত অনুসারে প্রাকৃত রস ও প্রাকৃত ভাষা থাকলেই তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা পায়; তা সাহিত্যের নিরিখে না উৎরে গেলেও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ 'গণ-সাহিত্যে'র মধ্যে 'গণ' কথাটার উপর যত ঝোঁক, 'সাহিত্যে'র উপর ঝোঁক ততটা নয়।

এই রুচিভেদের মধ্যে ব্যক্তিগত তারতম্যের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে মাঝে মাঝে সাহিত্যিক রুচির মৌলিক বদল হয়। অর্থাৎ, এক যুগের সমালোচক কবিদের কাছে যা আশা করেন অন্য যুগের সমালোচকেরা তা করেন না। আর-একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এর পিছনে ব্যক্তিগত রুচিভেদের উপরেও আছে কবিকৃতি সম্বন্ধেই ধারণা-বদল। সার্থক কবিকৃতি সম্বন্ধে একযুগে যে ধারণা থাকে অপর যুগে সে ধারণা থাকে না। সেইজন্য একযুগের বিদগ্ধ সমালোচক যা পড়ে খুশী হন অন্যযুগের সমালোচকেরা তা পড়ে খুশী হন না। এলিয়টের ভাষায় সমালোচকের কাজ হল রসবৈচিত্র্যের প্রকাশ ও রুচিনির্ধারণ।[২] কিন্তু রস বলতে কি বুঝি? সকল রস তো সব সময় সকলের আদরণীয় হয় না। নিশ্চয়ই এক সময় ছিল যে সময় ভারতচন্দ্রের প্রাকৃত রস পাঠক-সাধারণের আনন্দ দিত, তা না হলে তাঁর এত প্রসিদ্ধি হত না। এককালে সমাদৃত হাফ্-আখড়াই বা আলকাপ আজ অচল। কাজেই মানসিক হাওয়া-বদলের সঙ্গেসঙ্গে রসবোধের বদল হয়। এ বদল ব্যক্তিগত রুচিভেদের চেয়ে বড়। আজ সেইজন্যই মহাকাব্যের যুগ গত। মাইকেল নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র পর্যন্ত মহাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মহাসাগর রচনা করলেও মহাকাব্য রচনার কোনো তাগিদ অনুভব করেন নি।

সমালোচনার ব্যাপক ক্ষেত্রে রুচিভেদের এই যে তারতম্য, আসলে এ হল কবিকৃতির ধারণা সম্বন্ধেই তারতম্য। এলিয়টরই কথায় criticism is that department of thought which either seeks to find out what poetry is, what its use is, what desires it satisfies, why it is written and why read, or recited; or which, making some conscious or unconscious assumption that we do not know these things, assesses actual poetry. We may find that good criticism has other designs than these; but these are the ones which it is allowed to profess.[৩]। সমালোচনার এই সংজ্ঞা থেকেই কবিকৃতির সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে পড়ে। সুতরাং প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন কবিকৃতি কি।

২

কবিকৃতি কি, এই প্রশ্ন বড় কঠিন প্রশ্ন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন চুলচেরা আইন সম্ভব চিত্তরাজ্যে তা সম্ভব নয়, এখানে স্বারাজ্য অনেক বেশি। ভালো কবিতা পড়লে আমাদের ভালো লাগে। কেন তা ভালো লাগে তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা অনেকদূর এগোতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়। এই

২ "Criticism must always profess an end in view, which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and correction of taste."—*Selected Essays.*

৩ T. S. Eliot: *The Use of Poetry and the Use of Criticism.*

অনুসন্ধান উপলক্ষ্যেই যেমন সমালোচনার সূত্র নির্ধারিত হয়েছে তেমনি কবিকৃতির স্বরূপ নির্ধারণেরও চেষ্টা হয়েছে। যুগে যুগে তা এক নয়।

লৌকিক আলংকারিকদের কাব্যতত্ত্ব আলোচনার আগে একবার প্রাক্-ইতিহাসের গহন অরণ্যে প্রবেশ করা যাক। পাণিনি বললেন, কূ ধাতু শব্দে, তার সঙ্গে ইন্ প্রত্যয় করে কবি নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যিনি কবি হবেন তাঁর শব্দ করা চাই, মনে মনে অনুভব করে যদি তা শব্দে প্রকাশ করা না হয় তা হলে তা ঋষিকৃতি হতে পারে, কিন্তু কবিকৃতি হবে না। বেদে কবি কথাটির নানাস্থানে উল্লেখ আছে। সায়ন সেই প্রসঙ্গে বললেন যে, মেধাবীনামসু পঠিতম্ ; অর্থাৎ কবি কথাটি মেধাবীদের পর্যায়ে ফেলতে হবে। যাস্ক নিরুক্তে বললেন, মেধাবী কি করে হয়? মেধাবী কস্মাৎ? মেধা থাকলে মেধাবী হয়—মেধয়া তদ্বান্ ভবতি (নিঃ ৩. ১৮)। দুর্গাচার্য আরও ব্যাখ্যা করে বললেন মেধা থাকলে তো মেধাবী হয়, কিন্তু মেধা জিনিসটা কি? দুর্গাচার্য বললেন মতিঃ বুদ্ধিঃ। তস্যাং যা পুরুষশক্তিঃ ধীয়তে অভিব্যজ্যতে ধারণানাম সা এব মেধা। অর্থাৎ মতি (মননক্রিয়া) বা বুদ্ধিতে যে পুরুষশক্তি ধীয়মান হন বা অভিব্যক্ত হন সেইরকম মতি বা বুদ্ধির নামই মেধা। কিন্তু পুরুষশক্তি কি? আম্নায়গত অর্থে পুরুষশক্তি হল সেই শক্তি যা পুরে বসবাস করেন, যাকে মূল energy বলা যায়। সেই শক্তি কি ভাবে অভিব্যক্ত হন? চেষ্টায় যত্নে? না, তিনি স্বয়ম্ অভিব্যক্ত হন, অভিব্যজ্যতে শব্দটির সেইজন্য কর্মকর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। এইসমস্ত কথা একত্র করলে মোটামুটি যা অর্থ দাঁড়ায় সেটা হল এই যে, শুধু মননক্রিয়া বা নিছক বুদ্ধির মারপ্যাঁচে কাব্য হয় না। মননক্রিয়া বা বুদ্ধি থাকা চাই, কিন্তু তার মধ্যে ঐ প্রকার পুরুষশক্তির আবির্ভাব থাকা চাই। মেধাবীর মানসভূমি হল এইপ্রকার। কিন্তু যে মেধাবী কেবল সেই জিনিস উপলব্ধি করবেন অথচ প্রকাশ করবেন না তিনি ঋষি হতে পারেন, কিন্তু কবি নন। যে মেধাবী কূজন করেন তিনিই কবি। এ হতে বোঝা যাচ্ছে যে কবিকৃতির মধ্যে মননশীলতা বা বুদ্ধি থাকা চাই, কিন্তু তাতে স্বয়ম্ভু পুরুষশক্তির অভিব্যক্তি না হলে কিছু হয় না। সেই সঙ্গে প্রকাশও হওয়া চাই। এই হল কবিকৃতির মূল কথা।

ধর্মশাস্ত্র, বিশেষতঃ অপৌরুষেয় শাস্ত্র, আলোচনার বিপদ এই যে, সেগুলি টীকা-ব্যাখ্যার জালে এমনই জড়িয়ে আছে যে, সে জাল ভেদ করে সহজবুদ্ধির প্রবেশ অনেক সময়ই নিষিদ্ধ। তবু সহজ বুদ্ধিতে সে আমলের কবিকৃতি-তত্ত্বের যেটুকু আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী সংস্কৃত আলংকারিকদের আলোচনাতেও তার আভাস মেলে। অবশ্য পরবর্তীকালের সকল আলংকারিকই যে এক কথা বলেছেন তা নয়, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একেবারে মৌলিক পার্থক্যও আছে। তবু দেখা যায়, বিভিন্ন আলংকারিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সব-ক'টি উপাদানের কথাই উল্লেখ করেছেন, যদি চ সকলে সব-ক'টির উপর সমান জোরও দেন নি, সমান তাৎপর্যও আরোপ করেন নি। তার মধ্যেই মানসিক হাওয়া-বদলের একটা আভাস মেলে। দু-চারজন আলংকারিকের কথা আলোচনা করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রথম যুগে যে কাব্যতত্ত্বের সন্ধান পাই সে তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। যেমন, কাব্যাদর্শে দণ্ডী বললেন কবিতা লেখবার প্রেরণা তিনরকম—

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥ ১।১০৩

অর্থাৎ, কাব্যসম্পদের কারণ হল তিনটি। প্রথমতঃ নৈসর্গিকী বা স্বভাবজাত প্রতিভা। দ্বিতীয়, বহুনির্মল

শ্রুত ; শ্রুত মানে এখানে শোনা কথা নয়, শ্রুত মানে শাস্ত্রজ্ঞান ; গুরুর উপদেশ সহ প্রাপ্ত হলে সেই শ্রুত নির্মল হয়, সেইরকম শ্রুত। তৃতীয় কারণ হল অমন্দ অভিযোগ অর্থাৎ বারবার চেষ্টা। এই তিনটি হল কাব্যসম্পদের কারণ। ব্যাখ্যাকারেরা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে, দণ্ডী একবচনান্ত কারণ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কারণানি তো বলেলন নি। তার অর্থ হল যে কারণ তিনটি থাকতে পারে বটে, কিন্তু ঐ তিনটিই যুগপৎ থাকা চাই, এক-একটা থাকলে কাব্য হয় না। মম্মটও কাব্যপ্রকাশে অনুরূপ কথা বলেছেন—

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে॥

এখানেও বলা হয়েছে হেতুঃ, হেতবঃ নয়। কিন্তু দণ্ডী আর-এক ধাপ এগিয়েছেন। উপরি উক্ত কারণত্রয় নির্দেশ করবার পরই তিনি বলছেন—

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা গুণানুবন্ধিপ্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগ্ উপাসিতা ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥১।১০১

অর্থাৎ পূর্ববাসনা বা সহজাত সংস্কার ও অদ্ভুত প্রতিভা না থাকলেও শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে খেটে খুটে কবিতা লিখলেও বাগ্‌দেবী কাউকে কাউকে নিশ্চয় অনুগ্রহ করে থাকেন। কবিপ্রতিভা না থাকলেও কেবল লেখাপড়ার সাহায্যে খেটে খুটে ঘষে-মেজেও তাহলে কাব্য দাঁড় করানো চলে!

বস্তুতঃ দণ্ডীর পক্ষে এইরকম কথা বলা কঠিন ছিল না। সে আমলে কাব্য—অন্ততঃ কবিকৃতির ধারণা—খুব সাধাসিধে ছিল, তার মধ্যে খুব বেশি জটিলতা প্রবেশ করে নি। দণ্ডী রসের কথা নিয়ে মাথা ঘামান নি, দু-চারবার সাধারণভাবে রসের কথা বলা ছাড়া এবং রসবদ্ অলংকারের উল্লেখ ছাড়া এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো আলোচনাই দেখতে পাওয়া যায় না। শব্দের স্থান সংস্কৃত আলংকারিকদের রচনায় সবসময়ই বড়, কিন্তু দণ্ডীর মধ্যে তা খুবই বড়। গোড়াতেই তিনি বলছেন—

ইদমন্ধন্তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥১।৪

এ যেন একেবারে শাব্দিকের কথা। যেমন ভর্তৃহরি, সম্ভবতঃ বাক্যপদীয়ে, বলেছেন—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদ্ ঋতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব শব্দেন ভাসতে॥

সেইজন্য দণ্ডী বলেছেন, কাব্যের শরীর নির্দোষ করে রচনা করবে, কেননা সুন্দর শরীরও বিন্দুমাত্র শ্বেতিতে দুর্ভগ হয়ে ওঠে—স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্। কিন্তু কাব্যের শরীর কি? দণ্ডীর মতে কাব্যের শরীর হল ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্নপদাবলী। সেই শরীর রচনা করে তাকে অংলকারে সাজাতে হবে। পদ্যে গদ্যে ছন্দোবৈচিত্র্যে সর্গবন্ধে সেই কাব্য রমণীয় হয়ে উঠবে। মহাকাব্যের লক্ষণও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নায়কের লক্ষণ ও গুণের হিসেব কষে দেওয়া হয়েছে, এমনকি বর্ণনার বিষয়বস্তুও স্থিরীকৃত। গুণ দোষ রীতি ভাষা ও অলংকারের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সেই ছকে ফেলে কাব্যরচনা করে গেলেই হল।

যে যুগে কাব্যের এইরকম সাদামাটা বাঁধাধরা ছক ছিল সহজেই বোঝা যায় সে যুগে ব্যক্তিমনের লীলা তেমন প্রবল হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য একদিকে যেমন সহজাত প্রতিভা না থাকলেও কেবল ঘষে-মেজে খেটেখুটে কাব্য লেখাটা নেহাত অসম্ভব ছিল না, অন্য দিকে তেমনি সমালোচকের দাবীও ছিল

নেহাত স্বল্প। তাঁরা কেবল দেখে নিতে চাইতেন মোটামুটি লক্ষণ মিলিয়ে কাব্যরচনা হয়েছে কি না। তাতে কাব্য ভালো উৎরে গেলে খুবই ভালো, সেটা উপরি পাওনা, কিন্তু এইসব সদয় পরীক্ষকের হাতে পাশমার্ক পাওয়া খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এ অবস্থা আর রইল না। বিরাট্ বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে এই মানসিক হাওয়া-বদলের বিস্তারিত আলোচনা এই উপলক্ষ্যে সম্ভব নয়। সেইজন্য দু-একটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকব। ধ্বনিকারেরা কথা তুললেন শুধু ভালো শরীর গঠন করে তাকে অলংকারে ভূষিত করলেই তো ভালো কাব্য হল না, তার চেয়ে আরও বেশি কিছু চাই। সুন্দরী নারীর অবয়বগুলিই যে সুন্দর তাই নয়, ওসব জড়িয়ে তার উপরও একটা লাবণ্য থাকে। তেমনি কাব্যের শরীর ও ভূষণ সুন্দর হলেই হল না, তার উপর ঐরকম লাবণ্য থাকা চাই। ধ্বনিই হল সেই লাবণ্য।

> প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
> যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥—ধ্বন্যালোক, ১।৪

এই যে বাচ্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে ধ্বনির প্রকাশ সে জিনিস শব্দের হিসেবে পাওয়া যায় না। সেইজন্য যাঁদের জ্ঞান শব্দার্থশাসনজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ তাঁরা ও জিনিস বুঝতে পারবেন না। যাঁরা কাব্যের প্রকৃত সমঝদার তাঁরাই কেবল সে জিনিস বুঝতে পারেন।

> শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
> বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্।—ধ্বন্যালোক, ১।৭

দেখা যাচ্ছে, শব্দ ও বহিরঙ্গ হতে কবিকৃতির দাবী ক্রমশঃই অন্তরঙ্গ ও সহৃদয়হৃদয়বেদিতার দিকে ঝুঁকেছে। কাটা-ছাঁটা ছকে ফেলে পুঁথিতে লেখা লক্ষণ মিলিয়ে কবিকৃতি যাচাই করার যুগ ক্রমশঃই চলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের পরাকাষ্ঠা হল রসবাদীদের মধ্যে। পূর্বে যেমন ব্যক্তিমানসের কোনো লীলাই ছিল না এইসব রসবাদীদের তত্ত্বে ব্যক্তিমানসের লীলাই পরিপূর্ণ প্রবল হয়ে উঠল। এমনকি, সেই ব্যক্তিমানসের অনুভূতি মিস্‌টিক বা দার্শনিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তার বিচারই শেষ কথা, তার রায়ই চরম রায়। সাহিত্যদর্পণকার বলছেন কাব্য হল রসাত্মক বাক্য; কিন্তু রস বলতে এমন-একটি জিনিস বোঝায় যে জিনিস পাঠক বা দর্শকের সত্ত্বোদ্রেকের ফলেই অনুভূত হয়, যা অখণ্ড, যা আনন্দচিন্ময়, যা বিষয়ান্তরের স্পর্শশূন্য, যা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। যে জিনিস পরিমিতির বাঁধনে বাঁধা অর্থাৎ দেশ-কালের সীমা প্রভৃতি নানা সীমায় খণ্ডিত এবং যে জিনিস লৌকিক সে জিনিস ঐসব অন্তরায়ের ফলে রসে পরিণত হয় না। অর্থাৎ রস যখন প্রকাশিত হয় তখন তা দেশ-কালের সীমানাকে অতিক্রম করে যায়, লৌকিকতা ছাড়িয়ে অলৌকিকত্বের পর্যায়ে পৌঁছয়। তা না হলে সেই প্রাচীন কালে মুনি মুনিকন্যা আর রাজাকে নিয়ে লেখা নাটক শকুন্তলার রস আমরা আজও অনুভব করি কি করে? বা শেক্‌স্‌পীয়রের ডাইনীদের কথা? আর জগতের লৌকিক কাজ যতক্ষণ লৌকিকত্বের সীমানা ছাড়াতে পারে না ততক্ষণ তারা ঘৃণা হাস প্রভৃতি কার্যই থাকে কিন্তু রসে পরিণত হয় না। ক্রৌঞ্চহনন কার্যটা শোকবহ। কিন্তু কবিকৃতির মধ্য দিয়ে সে ঘটনাটি যখন সকলের হৃদয়ে বেজে উঠল তখন ব্যক্তিগত শোকের ব্যাপার সার্বজনীন করুণ রসে পরিণত হল। এরই নাম অলৌকিকত্ব। তখন সেই ক্রৌঞ্চ সেই ব্যাধ কোথায় রইল পড়ে, সে সব উপলক্ষ্য দূরে চলে গেল, যা রইল

সে হল অলৌকিক রস—যে রস শুধু সেই ক্রৌঞ্চ সেই ব্যাধ বা সেই ঘটনার চতুষ্কোণেই আবদ্ধ নয়। সেইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বলছেন—

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্যস্য রত্যাদেরুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ॥ ৩।১৭
রত্যাদিজ্ঞাততাদাত্ম্যাদেব যস্মাদ্ রসো ভবেৎ।
ততোঽস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি॥৩।২৮
সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎপ্রমাতৃভিঃ।
সাকারবদভিন্নত্বেনায়মাসাদ্যতে রসঃ॥—৩।২-৩

রসের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁরা কবিকৃতির সমস্ত চেহারাটাই বদলে দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্যের কাজ হল দর্শক ও পাঠকদের মনে সত্ত্বের যে বীজ লুকিয়ে আছে—যাকে বলা হয় স্থায়ী ভাব—সেই বীজগুলিকে অঙ্কুরিত করা। এই বীজগুলি বিভাবের অলৌকিকতার সংশ্রয়ে এসে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বীজগুলি কখনোই তিরোহিত হতে পারে না—অন্ততঃ বীজ অবস্থায় সেগুলি থাকবেই।

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৪

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভাবগুলি লৌকিক হলেও অলৌকিক বিভাবের সংস্পর্শে এসে তারা যখন রসে পরিণত হয় তখন তারা লৌকিকত্বের সকল সীমানা ছাড়িয়ে পুরোপুরি অলৌকিকত্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তখন আর তাতে লৌকিক জগতের কোনো ছোঁওয়া থাকে না। বিশ্বনাথের মতে এই অঘটন ঘটে বলেই দুঃখ আর তখন দুঃখ থাকে না, করুণরসে পর্যবসিত হয়। কথং দুঃখকারণেভ্যঃ সুখোৎপত্তিঃ? তার জবাব এইখানে। কিন্তু প্রশ্ন করা যায়, যার মনে সত্ত্বের বীজ নেই তাদের তাহলে কি করে রস অনুভব হবে? সাহিত্য-দর্পণকারের তত্ত্ব মেনে নিলে বলতে হয় তাদের তাহলে রস অনুভব হবে না, কেননা সেখানে সচেতস্-দের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৪

রস সেইজন্য কেবল সহৃদয়হৃদয়সংবাদী। যাঁরা সহৃদয় নন তাঁদের তাহলে রস আস্বাদন করবার চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ একমাত্র সচেতস্-দের স্থায়ীভাবই ঐকারণে রসে পরিণত হয় (দর্পণ, ৩।৯)।

রসগঙ্গাধর আরও একটু এগিয়ে বললেন কাব্য হল রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দ। রমণীয়তার অর্থ হল লোকোত্তর-আহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা। আবার সেই অলৌকিকত্বের কথা। জগন্নাথ বলছেন, 'তোমার পুত্র জাত হয়েছে' 'তোমায় ধন দেব' ইত্যাদি বাক্যে যে আহ্লাদ আছে সেটি লোকোত্তর নয়, সেইজন্য তাতে কাব্য হয় না। কাব্যের হেতু তাহলে কি? পূর্বে বামনাচার্য বলেছিলেন কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং, জন্মান্তরাগত-সংস্কারবিশেষাঃ। জগন্নাথের মতে সে হেতু হল 'কবিগতা কেবলা প্রতিভা'। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন তদ্গতং চ প্রতিভাত্বং কাব্যকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতিবিশেষ উপাধিরূপং বাখণ্ডম্। প্রতিভার একটি অখণ্ড রূপ আছে, যাকে খণ্ড খণ্ড করে বোঝা যায় না। কিন্তু এই প্রতিভার

হেতু কি? জগন্নাথ তিনটি হেতু নির্দেশ করেছেন: তস্যাশ্চ হেতুঃ ক্বচিদ্দেবতামহাপুরুষপ্রসাদাদিজন্মমদৃষ্টম্, ক্বচিচ্চ বিলক্ষণব্যুৎপত্তিকাব্যকরণাভ্যাসৌ। ন তু ত্রয়মেব। অর্থাৎ, ওর হেতু হল কখনও দেবতা বা মহাপুরুষের প্রসাদে লব্ধ অদৃষ্ট, কখনও-বা বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি কখনও বা কাব্যকরণাভ্যাস। তিনটি থাকলে তো খুবই ভালো, কিন্তু তিনটিই থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। এইসমস্ত কথা বলে জগন্নাথ এক দীর্ঘ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন রসের—

> সমুচিতললিতসন্নিবেশচারুণা কাব্যেন সমর্পিতৈঃ সহৃদয়হৃদয়ং প্রবিষ্টৈস্তদীয়সহৃদয়তাসহকৃতেন ভাবনাবিশেষমহিম্না বিগলিতদুষ্যন্তরমণীত্বাদিভির্ অলৌকিককবিভাবানুভাবব্যভিচারিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ শকুন্তলাদিরালম্বনকারণৈঃ, চন্দ্রিকাদিরুদ্দীপনকারণৈঃ, অশ্রুপাতাদিভিঃ কার্যৈঃ, চিন্তাদিভিঃ সহ-কারিভিশ্চ, সংভূয় প্রাদুর্ভাবিতেনালৌকিকেন ব্যাপারেণ তৎকালনিবর্তিতানন্দাংশাবরণাজ্ঞানেনাত এব প্রমুষ্টপরিমিত প্রমাতৃত্বাদিনিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরী-ক্রিয়মাণঃ প্রাগ্‌বিনিবিষ্টবাসনারূপো রত্যাদিরেব রসঃ॥

অর্থাৎ, পূর্ব হতেই বাসনারূপে যেসব স্থায়ী ভাব বিনিবিষ্ট হয়ে আছে তাই অবস্থা বিশেষে রসে পরিণত হয়। কোন অবস্থায় কি কি জিনিসের সাহায্যে কিভাবে তা রসে পরিণত হয় তারই দীর্ঘ তালিকা ঐ সংজ্ঞাটিতে পাওয়া যাবে। অভিনব গুপ্ত বলেছিলেন রস হল নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার।[৪] মানুষের চিৎশক্তি যখন নানা লৌকিক আবরণে আবৃত থাকে তখন সেই রস উপলব্ধি হয় না, কিন্তু চিৎশক্তির সেই আবরণ ভগ্ন হয়ে গেলেই রস সম্ভব হয়। জগন্নাথ এ মতের অবশ্য সম্পূর্ণ পোষকতা করেন নি।

কিন্তু এইসব কূটতর্ক ছেড়ে দিয়ে যদি এইসব তত্ত্বকথার পিছনে কবিকৃতি সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে কালক্রমে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর খুব বড়-একটা বদল ঘটে গিয়েছে। পূর্বেই বলেছি, দণ্ডীর সময়ে পরীক্ষার পাশমার্ক খুব ছিল না। কবিরা ঐসব লক্ষণ মিলিয়ে কাব্য লিখলেই চলত, এমন কি প্রতিভা না থাকলেও খেটে-খুটে কাব্য দাঁড় করানো অসম্ভব ছিল না। ব্যক্তিমনের লীলা তখন প্রবল হয়ে ওঠে নি বলেই সে যুগে এমন কথা শোনা যায় নি যে অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ। সুতরাং এ কথা স্বাভাবিক যে, দণ্ডী বলবেন কাব্যে নগরার্ণব বর্ণন থাকবে, পাহাড়-ঋতু-সূর্যচন্দ্রোদয় বর্ণন থাকবে, উদ্যান-সলিলক্রীড়া-মধুপানের কথা থাকবে। সেইজন্যই দণ্ডীর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল, বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ (কাব্যাদর্শ, ১।৫১)। কিন্তু কবি যখন ঐসব

৪ শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যজিজ্ঞাসা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। অভিনবগুপ্তের কথা হল, 'শব্দসমর্পমানহৃদয়-সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ।' শ্রীযুত গুপ্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'লৌকিক ভাব-এর কারণ ও কার্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে।' জগন্নাথ অভিনব গুপ্তের এই কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ইত্থং চাভিনবগুপ্তমম্মটভট্টাদিগ্রন্থস্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্‌বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্।' ভগ্নাবরণ চিৎ বলতে কি বোঝায়? জগন্নাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যেমন শরা-চাপা দীপের শরা সরিয়ে নিলে সেই দীপ কাছের সকল জিনিসকে প্রকাশিত করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয় ভগ্নাবরণা চিৎ ঠিক তেমনই।—'যথা হি শরাবাদিনা পিহিতো দীপস্তন্নিবৃত্তৌ সংনিহিতান্ পদার্থান্ প্রকাশয়তি, স্বয়ং চ প্রকাশতে, এবম্ আত্মচৈতন্যং বিভাবাদিসংবলিতান্ রত্যাদীন্।'

ব্যাপারের কাব্যিক রিপোর্টারের রূপ ছেড়ে কাব্যসংসারে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন তখন কাব্যের স্বরূপই গেল বদলে। কবিকৃতির স্বরূপ দাঁড়াল সম্পূর্ণ তফাত। কাব্যরস লৌকিক বস্তুকে উপলক্ষ্য করে শুরু হল বটে, কিন্তু যতক্ষণ সে লৌকিকত্বের সকল সীমানা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক হতে না পারছে ততক্ষণ সে রসের পর্যায়ে পৌছতে পারছে না। এ তত্ত্ব অনুসারে বস্তুতে রসস্থিতি হতেই পারে না। বস্তু হল লৌকিক, তার ছোঁয়া গেলে থাকলে স্থায়ীভাবে তো ব্যক্তিক অনুভূতির সীমানা পার হতে পারবে না, সার্বজনিক অখণ্ড রসে পরিণত হতেই পারবে না। এইজন্যই প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে যে কার্য ও কারণের যুগপৎ উপস্থিতি হতে পারে না। যখন কার্য আরম্ভ হয় তখন কারণ দূরে সরে যায়। এইজন্যই গোড়ায় লৌকিক বস্তুর সংস্পর্শ থাকলেও একবার রসসৃষ্টির কার্য শুরু হলে সে কারণ দূরে সরে যায়, তখন আর রাম-সীতার প্রেম বা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় তাঁদের কাহিনী থাকে না, এক অনির্বচনীয় প্রেমরসে পরিণত হয়ে সকলের হৃদয়ে সমান সুরে বাজতে থাকে। মনে হয়, এ কাহিনী অপরের, না, আমারই।

> পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
> তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১২

সেইজন্য এই সম্প্রদায় কাব্যে দণ্ডী-কথিত উপবন-মধুপান ইত্যাদির বর্ণনাকে তার স্বকীয় জোরে স্থান দিতে নারাজ। দণ্ডী যেমন বললেন যে কাব্যে ঐসব জিনিস লিখতেই হবে এঁরা সে কথা মেনে নিতে পারেন নি। এঁদের কথা হল, কাব্যে ওসব জিনিস আসতে পারে যদি তারা মূল রস সৃষ্টির সহায়তা করে। সেইজন্য ধ্বন্যালোক বললেন কাব্যপ্রবন্ধে অনেক রস আসতে পারে বটে, কিন্তু একটি রসকে স্বীকার করে নিয়ে তারই উৎকর্ষসাধন কর্তব্য। বাকীগুলি যদি আসেও তাহলেও তারা সঞ্চারী বা ব্যভিচারী রস হিসেবে আসবে, অর্থাৎ মূল রস জমাতে সাহায্য করবে।

> প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
> একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা॥—ধ্বন্যালোক, ৩।১২

তারা পরস্পরের পরিপোষক না হলে রস হয় না—পরিপোষরসহিতস্য কথং রসত্বম্। সেইজন্যই ধ্বনিকার আবার বলেছেন যে কবিরা সব বিষয়ই বর্ণনা করতে পারেন বটে, কিন্তু দেখতে হবে তা রসসৃষ্টির সহায়ক কিনা—

> বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
> রসাদিবিষয়েণৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ॥—ধ্বন্যালোক, ৩।৩২

সাহিত্যদর্পণকার তো এ বিষয়ে চরম কথা বলে ছেড়ে দিয়েছেন। জগন্নাথের কথায়, বিশ্বনাথের মত হল যা রসবান্ নয় তা কাব্যই নয়—রসবদেব কাব্যম্ ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্। জগন্নাথ অবশ্য অতখানি চরম কথা বলেন নি। বরং ঐ মত খণ্ডন করে বলেছেন যে কবিরা অনেক সময় জলপ্রবাহ-বেগ-নিপতন-উৎপতন-ভ্রমণ ইত্যাদি বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু অনেক সময়ই তাতে রসের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু এগুলিকে কাব্য থেকে একেবারে বাদ দিতে গেলে মহাকবিসম্প্রদায়ও আকুল হবেন। 'তথা চ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎ-পতন-ভ্রমণানি কবিভির্বর্ণিতানি· ·ন চ তত্রাপি যথাকথঞ্চিৎ পরম্পরয়া রসস্পর্শোঽস্তি এবেতি বাচ্যম্।' কিন্তু তবুও 'ন চেষ্টাপত্তিঃ, মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ।' অর্থাৎ তিনি কোনোরকমে এগুলিকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তাদের রসের মর্যাদা দেন নি।

৩

একালের কাব্যদর্শে এই কথাগুলির পুনর্বিচার করলে একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। যেসমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটিতেই তিনটি জিনিস আছে। বস্তুতঃ তা থাকতে বাধ্য, কেননা তা ছাড়া সাহিত্যরচনা হতেই পারে না। সেই জিনিস তিনটির প্রথমটি হল বাইরের সমাজ। এর থেকেই কবি তাঁর অভিজ্ঞতা আহরণ করেন, জোগাড় করেন কাব্যের মালমসলা। দ্বিতীয় বস্তু হলেন কবি নিজে; বাইরের মালমসলা তাঁর হাতে কাব্যের রূপ পায়। তৃতীয় জিনিস হল কাব্যটি। অর্থাৎ বাইরের উপকরণ এইভাবে কবিকৃতির মাধ্যমে কাব্যে রূপান্তরিত হয়। এ হল সমাজতন্ত্র ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রের সংযোগ ও বিপ্রয়োগ। সামাজিক উপকরণ কবির ভাবনায় রূপ পরিগ্রহ করে, এই হল কবিকৃতির স্বরূপ। ঐতিহ্য ব্যক্তিত্ব ও কবিতার এই হল পারস্পরিক সম্বন্ধ। দেখা যাবে, যুগে যুগে যে কাব্যতত্ত্বই রচিত হোক না কেন, এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। দণ্ডীর কাব্যতত্ত্বের মধ্যেও যেমন এই বিষয়-ক'টির উল্লেখ আছে জগন্নাথের কাব্যতত্ত্বের মধ্যেও তার উল্লেখ আছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে যায় ঐ তিনটি জিনিসের পারস্পরিক গুরুত্ব নিয়ে। একজন বাইরের দিকে যতটা ঝোঁক দেন অপরজন ততটা দেন না; একজন যতখানি সমাজাশ্রয়ী অপরজন ততখানি ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী; একজন বলছেন সমাজের এইসব চিত্র বর্ণনা কাব্যে অপরিহার্য অঙ্গ, আর-একজন বলছেন যে সমাজ কিছুটা উপলক্ষ্য মাত্র, তার বেশি নয়। একবার রসের ক্রিয়া শুরু হলে উপলক্ষ্যটা দূরে সরে যায়। সুতরাং ঐ তিনটি জিনিসের মধ্যে সংযোগ কতখানি আর বিপ্রয়োগ কতখানি, কিভাবে কাব্য রচিত হয়—এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই।

বস্তুতঃ এ তর্ক সংস্কৃত সাহিত্যেরই একমাত্র তর্ক নয়। প্রত্যেক সাহিত্যেই এই তর্ক দেখা দিয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিহিত। সেই কারণে প্রত্যেক সাহিত্যেই এর ছায়া পড়ে, প্রত্যেক সাহিত্যেই এই তর্ক ওঠে। আরিস্ততল যে যুগে ও যে পরিবেশে কাব্যতত্ত্ব রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে অন্য যুগ ও অন্য পরিবেশের কিছুই মিল নেই। কিন্তু তবু একটা প্রাচীন যুগের ছলাকলাবিহীন সরল দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর মতে কাব্যকারণ হল ছু'টি: এক, অনুকরণস্পৃহা; দ্বিতীয়, হার্মনি ও ছন্দের প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাত। রস আনন্দ দেয় মানুষের মনের জমে-থাকা ভাবের মুক্তিপথের সন্ধান দিয়ে, পুরোৎপীড়ের পরীবাহপথ নির্ণয় করে—যাকে আরিস্ততল বলেছেন ক্যাথারসিস। সেই রসসৃষ্টির উপকরণও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন, প্লট, চরিত্র, রীতি, চিন্তার বিষয়বস্তু, দৃশ্য, গান। ফলশ্রুতির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ফাইন আর্ট দৈনন্দিন জীবন-ধারণের সঞ্চয় হতে পারে বটে, কিন্তু সেটা তার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে কবিকৃতির যে চিত্রটি পাই সে চিত্র স্পষ্টতঃই প্রথম যুগের চিত্র। তার তুলনায় যত একালে এগিয়ে আসা যাবে ততই দেখা যাবে যে ব্যক্তিমনের লীলা ক্রমেই প্রবল হয়েছে। কবিরা সমাজ থেকে উপকরণ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করছেন, কিন্তু তাঁদের চিত্ত সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সেখানে তাঁদের মনের ক্রিয়াটা খুব বড়। সেইজন্যই ওয়র্ডসওয়র্থ বলেছেন নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন ছাড়া কাব্যোৎপত্তি হয় না। কিন্তু ক্রমে কবিরা আরও সুদূরে সরে যেতে লাগলেন। কাব্য যখন গজমোতিমিনারে আশ্রয় গ্রহণ করল তখন তার পিছনে কবিদের মানসিক হাওয়াবদল না থাকলে তা সম্ভব হয় নি। ফলে একেবারে একালে ক্রোচের মধ্যে

আমরা এমন কাব্যতত্ত্বও পেলাম যেখানে বলা হয়েছে To intuite is to express; and nothing less (nothing more, but nothing less) than express.· ·Intuitive activity possesses intuitions to the extent that it expresses them। ইনি এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে ভাবনাটাই যথেষ্ট, প্রকাশের কথাটা বড় নয়। রাফায়েল ম্যাডোনা আঁকতে পেরেছিলেন বলে বড় শিল্পী তা নয়। People believe that any one could have imagined a Madonna of Raphael, but that Raphael was Raphael owing to his technical ability in putting the Madonna upon canvas. Nothing can be more false than this viw। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে শুধু ছবি আঁকার দক্ষতা থাকলেই বড় শিল্পী হওয়া যায় না। বড় কল্পনা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে সে কল্পনা যদি সুষ্ঠ আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ না পায় তাহলে খর্ব হয়। রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি ছন্দ ঝংকার ও ভাষা তাঁর ভাবকে নিশ্চয়ই আরও সাজিয়েছে। ধ্বনিকার বলেছেন, প্রতিভাবান্ কবির রস-সমাহিত চিত্ত হতে রচনাভঙ্গী ও অলংকার প্রয়োগের কৌশল ভীড় করে ঠেলাঠেলি বেরিয়ে আসে—রস-সমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি। কাজেই সেখানে সমাজতন্ত্র ভাবতন্ত্র ও রূপতন্ত্রের সংযোগ ও বিপ্রয়োগের অপূর্ব মিশ্রণ আপনা-আপনিই হতে থাকে। কিন্তু যাঁরা ভাবনার উপর অতখানি জোর দেন তাঁরা এ কথার সঙ্গে একমত নন। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, যখন কবিদের চোখের সামনে যে কারণেই হোক আশার নবীন উষা স্বর্ণ বিকিরণ করছিল, প্রবল সমারোহে বান ডেকে এসেছিল নবজীবনের আশ্বাস, সে সময় কবিরা ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী হয়েও তূর্যধ্বনিতে নবজীবনের আহ্বান ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, নিজেদের unacknowledged legislators of the world মনে করতে ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সকল আশা-ভরসা ক্ষয়িষ্ণুতার পঙ্কশয্যায় মিশে গেল তখন কবি হিসেবে যিনি বললেন we are the hollow men, বললেন এ জগৎটা হল cactus land, কবিকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে কবিকৃতির স্বরূপই হল ক্রমাগত আত্মবিলোপ— The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality। এই কথাটারই একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি অন্যত্র লিখেছেন—

> When two gases previously mentioned (i.e. oxygen and sulphur dioxide) are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulphuric acid. This combination takes place only if platinum is present; nevertheless the newly-formed acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected; has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of the platinum. It may partly or exclusively operate upon the experience of the man himself; but the more perfect the artist, the more completely the separate in him will be the man who suffers and the mind which creates; the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material.

এ মত অনুসারে ভালো কাব্যে কবির ছাপ খুব কমই থাকবে। বাইরের উপকরণ হতে যে আবেগ সংগৃহীত হবে কবিতায় তা সঞ্চারিত হবার সময় কবিমনের ছাপ না পড়াই ভালো। বলা বাহুল্য, যে মানসিক হাওয়া হতে 'আমি'ময় কাব্য রচিত হত, কবিরা লিখতেন—

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.

অথবা দুঃসহ আবেগে বলে উঠতেন—

I pant, I sink, I tremble, I expire!

সে ধরনের কাব্য এই তত্ত্ব অনুসারে চলবে না, কেননা এগুলির রসধর্মিতা হচ্ছে 'আমি'ময়ত্বে, কবিহৃদয়ের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে। বাস্তবিক যে কবি বলেন আমরা সবাই ফাঁপা মানুষ, জগৎটা হল অবাস্তব, তাঁর কাছে 'আমি'ময় কাব্যের দুরন্ত উচ্ছ্বাস আশা করাই অন্যায়। কাজেই তাঁর ধারণায় কবিকৃতি যে কবির ক্রমাগত আত্মবিলোপই হবে এ কথা অস্বাভাবিক নয়। যদি ভৌতিক প্রক্রিয়ায় কবিতা লেখা সম্ভব হত, medium হিসেবে জীবন্ত কবির পরিবর্তে যদি আধিদৈবিক আত্মাতেই কাজ চলত তাহলে হয়তো কবির দরকারই হত না। কবি এ মতে একেবারে চরম neutral—একেবারে বিকারলেশহীন, পরিবর্তনশূন্য। সমাজতন্ত্র হতে রূপতন্ত্রে যাবার পথে ভাবতন্ত্রের কোনো ছায়াই পড়ছে না। আর-এক ধাপ এগোলেই বলতে হয় কবির ব্যক্তিক সত্তা বলে কিছু নেই, অন্যান্য সকলের মত তিনিও সমাজের সৈনিক এবং Art is a class weapon· ·artists are to abandon 'individualism'· ·as petty bourgeois attitude। একজন সাধারণ সৈনিক হতে কবির তফাত এইমাত্র যে একজনের হাতে রাইফেল আর একজনের হাতে কলম।

৪

এইসব তর্ক হতে আপাততঃ বিভ্রান্ত হতে হয় বটে, কিন্তু আরও একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে এর একটা সমন্বয় সাধন করা কঠিন নয়। আসল সমস্যাটা হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোগ নিয়ে। রোজার ফ্রাই বলেছেন মহৎ আর্ট সামাজিক। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে what the history of art definitely elucidates is that the greatest art has always been communal, the expression—in highly individual ways, no doubt—of common aspiration and ideals। যে সময় সমষ্টি ও ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে সে সময় সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই ব্যক্তিমনের স্ফুরণে সহায়তা করে। কিন্তু যখন চারপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে কবিমনের সংঘাত বাধে তখন দু'টি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এমন ঘটনা দেখা গিয়েছে যে সময় বর্তমান পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কবিমনের সংঘাত বেধেছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা একটা নতুন আশার সন্ধান পেয়েছেন। যেমন, ইংরাজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে ঘটেছিল। সে সময় চারপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে কবিমনের মিল না থাকলেও ভবিষ্যতের আশায় কবিমন উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য তখন 'আমি'ময় কাব্য সৃষ্টি হতে থাকলেও তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। কিন্তু যে সময় দেখা যায় চারপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে কবিমনের মিল নেই অথচ নতুন কোনো আশার সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না, সে সময় কবিমন স্বতঃই ম্রিয়মান হয়ে থাকে। বাহ্যিক উপকরণকে সানন্দে আত্মসাৎ করে নবীন রূপতন্ত্র সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, কোনো নতুন আশার সঞ্জীবনী মন্ত্রও কাব্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে না। এই সময়ই কবি গজমোতিমিনারে পালিয়ে যেতে চান, কাব্যের সৃষ্টিক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্ব বিলোপে তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই অস্বস্তিকর পরিবেশ বেশি দিন চলা সম্ভব নয়। সেইজন্যই কালক্রমে দাবী ওঠে যে সমাজের

পরিবর্তন দরকার। এমন সমাজ চাই যাতে আশার বাণী শুনতে পাওয়া যায়, যাতে কবির মন উজ্জীবিত হতে পারে। এমন কি, এই দাবী সময় সময় এত প্রবল হয়ে ওঠে যে কবিরা কবিকর্ম ভুলে সমাজ নিয়েই মাতামাতি শুরু করেন, কাব্যরচনা পিছনে পড়ে থাকে।

এই বিবর্তনধারা শুধু যে সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায় তা নয়, সমাজেও এর প্রতিফলন আছে। বরং বলা যায়, সমাজে এর প্রতিফলন আছে বলেই সাহিত্যেও এ রকম হাওয়া-বদল হয়। আদিম যুগে সমাজের প্রাধান্য খুব বেশি। ব্যক্তিমানুষের মনটাও সেইভাবে স্ফুরিত হয়, সেইজন্য আদিম কাব্য অনেক সময়েই কৌম সংগীতের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে ভাবের আদানপ্রদান ও রস-উদ্দীপন খুব প্রত্যক্ষ। ঘরের কোণে বসে সুদূরকালের পাঠকের জন্য কবি কাব্যরচনা করছেন, ব্যাপারটা এ রকম নয়। ক্রমশঃ যেমন সমাজের বিকাশ হতে থাকে তেমনই কাব্যের চেহারাও বদলায়, কবির দৃষ্টিভঙ্গীও বদলায়। এ কথা সত্য যে সমাজ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হতে থাকে কবির অনুভূতির সার্বজনীনতাও অনেক সময়ই সেই পরিমাণে খণ্ডিত হয়। সেইজন্য নাটকই বেশির ভাগ কাব্যের আদি রূপ। অর্থাৎ সে জিনিসটি শুধু পঠ্য নয়, দৃশ্যও বটে। ভাবের সংক্রমণ সেখানে খুব প্রত্যক্ষ, দর্শকসমাজও সেখানে খুব ব্যাপক। কিন্তু সমাজ যত শ্রেণীবিন্যস্ত হয়ে যায়, কবির অনুভূতি ও উপকরণ তখন তাঁর শ্রেণী থেকেই বেশির ভাগ আহরিত হতে থাকে। চারপাশে যে জীবনযাত্রা তিনি দেখেন, ঠিক চারপাশের যেসব সমস্যা তাঁর মনে ছায়াপাত করে, সেগুলিই তাঁর কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠে। তবু প্রাচীনকালে কাব্যকে বহু দাবী পরিপূরণ করতে হত। কবিতার দাবী, গল্পের দাবী, ঘটনা-সংস্থানের দাবী ইত্যাদি নানাপ্রকার দাবী। শেক্‌সপীয়ারের নাটকে এ সবগুলিই ভীড় করে আসে— সেসবগুলিরই অপূর্ব সমন্বয় মহাকবির হাতে হয়েছে। কিন্তু সমাজবিবর্তনের সঙ্গে এবং শ্রেণীবিন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গেসঙ্গে একই কাব্যকে এতগুলি দাবী মেটাতে হয় না—অন্ততঃ তা সম্ভব হয় না। তখন বিভিন্ন আঙ্গিকের উদ্ভব হয়। উপন্যাস যে দাবী মেটাতে অগ্রসর হয় ছোটগল্প তা হয় না। গীতিকবিতা আবার অন্যরকম দাবী মেটাতে অগ্রসর হয়। এ সবই হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুভূতির খণ্ডীভবনের লক্ষণ। তবু যখন বড় একটা আবেগে সমাজ নাড়া খেতে থাকে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধ থাকে না, তখনই মহৎ কাব্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন রিচার্ডস্‌এর কথায় কবিরা থাকেন at the most conscious point of the age। যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের সময় ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের যুগে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরোধ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তিনি লোকোত্তর প্রতিভার বলে তা অতিক্রমণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই সে বিরোধ তাঁর মহৎ কাব্য রচনার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে সে বাধা অনেক সময় অলঙ্ঘনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বৃদ্ধবয়স সম্বন্ধে ভিক্‌টোরীয় যুগ পর্যন্ত কবিরা দুর্মর— অবশ্য সহজ— আশাবাদ পোষণ করে গিয়েছেন। বলতে পেরেছেন,[৫]—

Grow old along with me
The best is yet to be
The last of life for which the first was made.

কিন্তু এ যুগের কবিরা এ আশাবাদে আশ্রয় পেলেন না। তাই তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন,[৬]—

৫ ব্রাউনিঙ্‌এর *Rabbi Ben Ezra.*

৬ এলিয়ট

I grow old . . I grow old
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

কাব্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের প্রতিফলনও খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কথায়[৭] 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিংশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।' অর্থাৎ কবি নিজের কথা না বলে বিষয়েরই কথা বলেন। কবির ক্রমাগত আত্ম-বিলোপের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ক্রমশঃ চেষ্টা হয় বলার জোরে নয়, বিষয়ের জোরে কাব্যকে কাব্যপদবীতে দাঁড় করাবার। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রিয়ালিটির কারি-পাউডর। ওর মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের কথায়,[৮] একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম। যেন, ঐ দুটি বিষয়বস্তু থাকলেই কাব্য উৎরে গেল, তাতে কবিকৃতির কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এসব তর্কের মধ্য দিয়ে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল এই যে, সমাজবিবর্তনের ধারায় কখনও ঝোঁক পড়ে ব্যষ্টির উপরে, কখনও বা সমষ্টির উপরে—কিন্তু তাতে কবিকৃতির আসল তত্ত্বটির বদল হয় না। সমাজে বা রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এরকম টানাটানির পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি, কখনও দেখি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান, কখনও দেখি সমাজকল্যাণের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিসত্তার অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে। সাহিত্যেও তারই প্রতিফলন হবে, এর মধ্যে অস্বভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এই ঝোঁকবদলের জন্য কবিকৃতির বদল হয় না। আসল কথাটা হল কাব্যরচনায় ঐ তিনটি পক্ষ আছে। বাইরের দিকে আছে সমাজ। তার আবহাওয়া কবির মনকে প্রত্যক্ষভাবে হোক পরোক্ষভাবে হোক গড়ে দেয়, তাঁর কাব্যরচনার মালমশলা জোগায়, তাঁর অনুভূতির ক্ষেত্র নির্দেশ করে। মধ্যেখানে আছেন কবি। তিনি সেই অনুভূতির সাহায্যে সেইসব মালমসলা নিয়ে কাব্যরচনা করেন, সেইসব মালমসলা কাব্যে রূপান্তরিত হয় কবিকৃতির মধ্য দিয়ে। অপর দিকে হল পরিণত কাব্য, যার মধ্যে বাহ্য উপকরণ কবিকৃতির মাধ্যমে কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইজন্য ভালো করে ভেবে দেখলে নিঃসংকোচেই বলা যেতে পারে যে কবির কাব্য ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী হবে কি সমাজাশ্রয়ী হবে কাব্যের বিচারে এ প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক। কবির মন যদি সমাজাশ্রয়িতায় স্ফুরিত হয় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সেই ধরনেরই কাব্য লিখবেন। অথবা, ঘটনা-সংস্থানের বৈশিষ্ট্যে বা সামাজিক আবহাওয়ার জন্য কবির মন যদি ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী হয়ে উঠেও সার্থকভাবে স্ফুরিত হতে পারে তাহলে সে কবি ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী কাব্যই লিখবেন এবং তা নিয়ে সার্থক ও মহৎ কাব্যও রচিত হতে পারে। আসল প্রশ্নটা হল, কবিকৃতি সার্থক হয়েছে কি না। অর্থাৎ বাহ্য মালমসলার কাব্যে সার্থক রূপান্তরণ হয়েছে কি না।

সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার এই কথাটাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,[৯] "আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ কথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নেই— কেবলমাত্র কবি— বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নেই।· ·স্কুল থেকে এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ীর উর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা

৭ সাহিত্যের পথে। রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড

৮ ঐ

৯ 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮

আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায়নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে বৃটিশ সবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল, কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একা কাজ করেন।" এই হল সাহিত্যরচনার ক্রিয়া। কবিমনের সূচীমুখে বাস্তবজগৎ ও কল্পনাজগতের যোগসূত্র রচিত হয়। তার মধ্যে বাস্তবজগৎ থেকে আলো না এলে যেমন কবিমনের কমলহীরে দ্যুতিবিকিরণ করতে পারে না, তেমনি কমলহীরের স্পর্শ পেয়ে বাস্তবজগতের সাদা আলো কাব্যলোকে যে হাজার দ্যুতিতে ঝলকিত হয়ে ওঠে বা নয়নলোভন বর্ণসুষমায় ছড়িয়ে যায়, সেই দ্যুতি বা বর্ণসুষমা সাদা আলো নিশ্চয়ই নয়। মধ্যেখানে কমলহীরের স্পর্শ চাই এবং তা কমলহীরেই হওয়া চাই, প্লাটিনম খণ্ড হলে চলবে না। কবিকৃতির মূল এইখানে।

৫

সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে টানাপোড়েনের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি, তা হতে কবিকৃতির অনেকরকম হাওয়াবদল যেমন ঘটতে থাকে তেমনই সমালোচকের দাবীরও বদল হতে থাকে। সমাজের বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সহজ সামাজিক কাব্যতত্ত্ব হতে ক্রমশঃ অখণ্ডরসবাদী ব্রহ্মাস্বাদসহোদর কাব্য রচনার দাবী আসে। আবার কালক্রমে সে দাবী বদলে গিয়ে কথা ওঠে কবি ও সৈনিকে কোনো তফাত নেই। সমালোচনার তত্ত্বেও কালে কালে ঠিক তেমনই বদল ঘটে থাকে। বস্তুতঃ এরকম ঘটাই স্বাভাবিক। যে কারণে কাব্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ওরকম বদলায় ঠিক সেই কারণেই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীও সেইরকম বদলায়। ইংরাজী সাহিত্যে এই বদলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন—[১০]

> There are several forms which criticism may take . . Our earliest criticism under the influence of classical studies and of Italian critics, made very large assumptions about the nature and function of literature. Poetry was a decorative art, an art for which sometimes extravagant claims are made, but an art in which the same principles seemed to hold good for every civilisation and for every society. . . In an age in which the use of poetry is something agreed upon, you are more likely to get that minute and scrupulous examination of felicity and blemish, line by line, which is conspicuously absent from our time, a criticism which seems to demand of poetry, not that it should be well-written, but that it shall be 'representative of its age'. . . Wordworth and Coleridge are not merely demolishing a debased tradition, but revolting against a social order; and they begin to make claims for poetry which reach their highest point of exaggeration in Shelley's famous phrase, "poets are the unacknowledged legislators of the mankind". . . For a long time the poet is the priest. . . But the next stage is best exemplified by

১০ Eliot; *The Use of Poetry and the Use of Criticism.*

Mathew Arnold . . he discovered a new formula: poetry is not religion, but it is a capital substitute for religion. The doctrine of Arnold was extended, if also somewhat travestied, in the doctrine of 'art for art's sake'. . In our time we have moved, under various impulsions, to new positions. On the one hand the study of psychology has impelled men not only to investigate the mind of the poet with a confident ease which has led to some fantastic excesses and aberrant criticism, but also to investigate the mind of the reader and the problem of 'communication'. . . On the other hand the study of history has shown us the relation of both form and content of poetry to the conditions of its time and place. The psychological and the sociological are probably the two best advertised varieties of modern criticism; but the number of ways in which the problem of criticism are approached was never before so great or so confusing. Never were there fewer settled assumptions as to what poetry is, or why it comes about, or what it is for. Criticism seems to have separated into several diverse kinds.

আজকের দিনে সমালোচনা-ক্ষেত্রে যে এই অবস্থার উদ্ভব হবে, এ কথা বিচিত্র নয়। প্রথমতঃ, মানুষের মন নানাকারণে সমাজাশ্রয়ী হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ আজকে শ্রেণীবদ্ধ সমাজে আদিম সার্বজনিক অনুভূতি নেই সত্য, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান যানবাহন ইত্যাদির উন্নতির ফলে অভিজ্ঞতা ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। যে যুগে কয়লাখনি ছিল না সে যুগে কয়লাখনির জীবনও সামাজিক সত্য ছিল না, সে জীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা মিলনবিরহ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু আজ সে অবস্থা নয়। ল্যাপল্যাণ্ডের এস্‌কিমোর জীবনযাত্রাও যেমন আমাদের অনুভূতির অঙ্গীকৃত হয়েছে, আকাশপথে যাত্রাও তেমনি, অ্যাটম্‌ বোমার বিভীষিকাও তেমনি। তৃতীয়তঃ, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উন্নততর হবার সঙ্গে কোন সামাজিক আবহাওয়ায় কি রমক সাহিত্য রচিত হয় তার একটা মোটামুটি নিয়মও আমরা তৈরী করতে পেরেছি। চতুর্থতঃ, আমাদের সমাজ এখন এমনই নাড়া খাচ্ছে যে সত্যিই বাঁধাধরা নিয়ম বলে কিছু নেই। যে সময় সমাজজীবন নিস্তরঙ্গ থাকে, অর্থাৎ সমাজের মোটামুটি কাঠামো সম্বন্ধে কারও বিশেষ কোনো অভিযোগ থাকে না তখন সমাজ নিয়ে মারামারি না করে তর্ক চলতে থাকে ব্যক্তি নিয়ে, খুঁটিনাটি বিচার হয় কাব্যের পংক্তি উপমা অলংকার অনুপ্রাস সম্বন্ধে। কিন্তু যখন সমাজে প্রবল আলোড়ন চলতে থাকে তখন ঝোঁকটা পড়ে সেইদিকেই বেশি, দাবী ওঠে যে কবিতা সুলিখিত না হলেও চলে কিন্তু যুগধর্মী হওয়া চাই। এমন কি ক্রমে দাবী আরও বেশি এগিয়ে যায়; তখন সমালোচক বলে বসেন যে কাব্য শুধু যুগধর্মী হলে চলবে না, তাকে নবযুগ সৃষ্টির কাজে নামতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাবল্যে অনেক সময় নিছক প্রচারধর্মী রচনাও যখন গায়ের জোরে সাহিত্যের দরবারে আসন পাবার জন্য কোলাহল করতে থাকে তখন সমালোচকেরা তার জন্য সে দরবারের দেউড়ি খুলে দিতে ইতস্ততঃ করেন না।

বাংলা সমালোচনার ইতিহাসেও এই ধারার ব্যতিক্রম হয়নি।[১১] এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালি সাহিত্যিকের মন কি ভাষার ক্ষেত্রে কি রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দুরাতিদূর অনুকরণ ছাড়া কিছু করত না। এই যুগের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল,

---

১১ বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যেও এর চিহ্ন আছে। সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে কর্তব্য।

সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। ·বাঙ্গালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন।· ·এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।"[১২] কাজেই এ যুগে সমালোচনা যে সংস্কৃত নিয়মাবলীর উচ্ছিষ্টাবশেষের সঙ্গে মিলিয়ে কাব্য-বিচারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কথা বিচিত্র নয়। তার পরের যুগে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুত্থানের পর এ ধারা স্বভাবতঃই বদলে গেল। বঙ্কিম নিজে সমাজে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের কথা হল, "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ·সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেইসকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই।· ·তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যেসকল নিয়মানুসারে দেশভেদ, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেইসকল কারণেই ঘটে।"[১৩] বঙ্কিমচন্দ্রের সময় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখনকার মত উৎকর্ষলাভ করে নি, তাছাড়া সমাজ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত খুব সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শে কাব্য যাচাই করে দেখেছেন। আমরা সে সামাজিক আদর্শ এখন মেনে না নিতে পারি, কিন্তু তখনকার লেখকেরা সেই আদর্শে কাব্য পরীক্ষা করেছেন বলে তাঁদের দোষ দিতে পারি না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করব না। কারণ, তাঁর কাব্য-সমালোচনা হল মহাকবির কাব্য-সমালোচনা। তাতে আছে মহাকবির বাগ্‌বৈভব, মহাকবির ভাবৈশ্বর্য। সে হল একটা কাব্যকে উপলক্ষ্য করে আরও একখানি কাব্য রচনা করা—এই নতুন কাব্যের আলোয় পুরোনো কাব্য নতুন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং এই অনন্য সমালোচনাকে এই ধারার অঙ্গীভূত করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও দেখা যায় বঙ্কিমের অনেক কাল পরেও সমালোচনার যে স্রোত চলে আসছিল তাতে দুটি ধারার সংঘর্ষ ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারা যায় যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত পত্রিকা 'সাহিত্যে' যে সমালোচনার ধারা খুব প্রবল ছিল তাতে সাহিত্য হিসেবে সাহিত্য বিচার করা হত না, সাহিত্য বিচার করা হত সমাজের কতকগুলি নীতির দিক থেকে, না হয়তো সংস্কৃতঘেঁষা কতকগুলি অবান্তর ও অবাস্তব সূত্রের মানদণ্ডে। দু-একটি নমুনা দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ভাবধারা 'সাহিত্য'-কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখতেন না। তাই লেখা হল: "যে কবি 'কামিনীকে' 'শিথিল সাজে' সাজাইয়া,

---

১২ বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা। "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।"

১৩ ঐ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা। "মানস-বিকাশ।"

শেফালিকে 'আলোর পরশে মরমে মারিয়া' সেই ভাবের লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির প্রভাবে পাঠকের চিত্ত হরণ করিবার প্রয়াসী,—যিনি পসারিণীকে নির্জন বৃক্ষচ্ছায়ায় আঁচল পাতিয়া শোয়াইয়া তাহারই নগ্ন সৌন্দর্যে যুবকযুবতীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছুটাইয়া দিয়া আপনার কবিত্বশক্তিকে সফল করিতে চাহেন, তাঁহার কল্পনা এই শ্রেণীর কল্পনার অপচারমাত্র।"[১৪] ঐ পত্রিকায় আরও লেখা হয়েছিল, "'যামিনী না যেতে জাগালে না' সম্বন্ধে রসিকতাটি ভাল হয় নাই। ও গানটিতে বঙ্গসাহিত্যের কি অনিষ্ট হইয়াছে···বুঝাইয়া দিতেছি। এ দেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও, অভিসার জিনিসটা খারাপ।···অতএব ইহা পুরাকালে থাকিলেও immoral, না থাকিলেও immoral. পূর্ববর্তী কবিগণ সাময়িক নীতি ও রুচির বাতাসের মধ্যে লালিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ মার্জনা করা যায়। কিন্তু এখন রুচি হিসাবে বিশুদ্ধতর বাতাস সেবন করিয়া কেহ সেরূপ লিখিলে মার্জনা করিব কেন?"[১৫] এ ধরনের সমালোচনা আজ কল্পনার অতীত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে সাহিত্যের বিচার সাহিত্যিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের মানদণ্ডে হচ্ছে না, হচ্ছে সামাজিক নীতির আদর্শে। সমালোচকের মতে সামাজিক নীতির যে আদর্শ হওয়া উচিত সেই আদর্শ উক্ত কবিতায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। পক্ষান্তরে যাঁরা সাহিত্যেই সাহিত্যের শেষ এই চরম রসবাদী কথা তুললেন তাঁরাও, অন্ততঃ প্রথম যুগে, আহা মরি ইত্যাদি উচ্ছ্বাস দিয়েই ভালোলাগা মন্দ-লাগার বিচার শেষ করতেন। এমন কি প্রিয়নাথ সেনের মত গভীর সমালোচকের রচনাতেও এরকম নিদর্শন মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—"'উচ্ছৃঙ্খল' নামক কবিতাটীর ভিতর কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।···ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা। ভাষায় কি তরঙ্গ! এমন সুন্দর কবিতা কখনও পড়ি নাই।"[১৬]

এই দোটানার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বাংলা সাহিত্য এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে ইংরেজি সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও সমাজের দাবীর জোর হাওয়া উঠেছে। সেদিন কোনো মাসিক পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে কোনও সমালোচক লিখেছেন, "জীবন মানে একটা ভাব-শক্তি নয়; দেশকালে বিধৃত জীবদের জীবলীলা। অর্থাৎ 'জীবন-সত্য' মানে শুধু মানবিক সত্যও নয়, সমাজ সত্য। ···সমাজ যদি শ্রেণীবিভক্ত হয়, এ সমাজসত্যের উদ্‌ঘাটন মানে হল— সমাজের অন্তর্নিহিত উৎপাদনশক্তির যা প্রয়োজন তা উদ্‌ঘাটন।" বিষয়ীর মানদণ্ডকে, অর্থাৎ আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক নামক তত্ত্বটিকে, কডওয়েল আখ্যা দিয়েছেন commodity fetishism বা art for my sake। এ কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড সত্য নিহিত আছে। মন্ময়তা কাব্যের মানদণ্ড নিশ্চয়ই নয়, আমি যা বলব তাই কাব্য বলে গ্রহণ করতে হবে এ কথা একেবারেই অচল। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না যে মন্ময়তা যদি ঐ কারণে দূষণীয় হয় তাহলে তন্ময়তাও ঠিক ঐ কারণেই দূষণীয়। কারণ কাব্য শুধু বিষয়ের জোরে হয় না। বঙ্কিমী যুগে যেসব সমালোচক অবান্তর নীতির দোহাই দিয়ে সাহিত্যের বিচার করতেন আজ যদি তাঁদের নিন্দায় আমরা মুখর হয়ে থাকি তাহলে এ কথাও বলতে হবে যে যাঁরা প্রলেটারিয়াট সাহিত্যের ধ্বজা

---

১৪ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, ১৬৭ পৃষ্ঠা

১৫ ঐ, ফাল্গুন ১৩১৯, ৯০২ পৃষ্ঠা

১৬ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, ৪৫ পৃষ্ঠা।

আস্ফালন করে কাস্তের মত চাঁদ আর বেয়নেটের মত বিদ্যুৎ না দেখলেই সকল কাব্যকে বিনিপাত বলে ধিক্কার দিতে সমুৎসুক তাঁরাও আসলে ঐ গোত্রীয়। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছিলেন পুত্রস্তে সংজাতঃ বা ধনং তে দাস্যামি প্রভৃতি কথায় আনন্দ হতে পারে বটে, কিন্তু কাব্য হয় না, কেননা ওতে রস নেই। তেমনি যদি কেউ শুধু বলেন 'কুলীরা বস্তীতে থাকে' তাহলে সে কথাটা প্রলেটারিয়াট্ ভঙ্গীর হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হয় না। আসল কথাটা ভুললে চলবে না। কবিকৃতির বেলায় যে কথাটি বলবার চেষ্টা করেছি সমালোচনার বেলাও সে কথাটি মনে রাখতে হবে। আজ প্রলেটারিয়ট্ সজীব সত্য। তার দুঃখ কষ্ট বেদনার স্পন্দন সাহিত্যে আসন দাবী স্বচ্ছন্দেই করতে পারে তার মানবিক সত্যের জোরে। বরং একালের কবিদের সৌভাগ্য যে তাঁদের মালমসলা সংগ্রহের ক্ষেত্র আর রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরদের সংকীর্ণ পরিধিতেই আবদ্ধ নেই— নতুনতর স্পন্দন, নতুনতর সংঘাত, মানবচরিত্রের নব নব দিক্ তাঁদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রভুক্ত হয়েছে। কিন্তু কবি যখন কাব্য রচনা করবেন তখন আসল পরীক্ষা হল তাঁর রচনায় ঐসব অভিজ্ঞতা কাব্যে রূপান্তরিত হতে পেরেছে অথবা শৌখিন মজদুরিতেই শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ কবিকৃতি হয়েছে কিনা— সেই কমলহীরের দ্যুতি আছে কিনা। যিনি ও বিষয়ে যত পাকা জহুরী তিনি তত পাকা সমালোচক।

পরিশেষে আর একটা কথা। এখনও অনেক বিশিষ্ট সমালোচকের রচনায় দেখতে পাই সমালোচনা কেবল বাহ্য তুলনাতেই নিঃশেষিত। কোনও লেখকের রচনায় দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ একাধারে কালিদাস, শেলি, কীট্স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিঙ্, এমন কি টেনিসনের মত। আমার মতে এ সমালোচনা কবিকৃতির আসল স্বরূপ হতে বঞ্চিত। জীবনস্মৃতিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এ ধরনের সমালোচনা নিরস্ত করে গিয়েছেন।*

---

* এই প্রবন্ধের কিছু অংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে পঠিত।

রবীন্দ্র-রচনায় সত্য ও তত্ত্ব

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-রচনায় তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে একটি বিষয় স্মরণে রাখা কর্তব্য। মহাকবির রচনায় তত্ত্বের কোনো ভার থাকে না, অথচ তাঁহার সৃষ্টিতে সত্যের ও আনন্দের প্রকাশ হয় বলিয়া তত্ত্বের অভাবও থাকে না। তত্ত্ব আছে, কিন্তু তাহার কোনো পীড়া নাই; এ যেন স্রোতস্বিনীর অপরিমেয় জলরাশির অনায়াসে বহিয়া যাওয়া। অপরিমিত জল-ভার তাহার আপন বেগে যেমন ভারমুক্ত হইতে থাকে, মহাকবির আনন্দ-প্রবাহে অসংখ্য তত্ত্ব তেমনি হাল্কা হইয়া যায়। যাহার সামর্থ্য আছে সে নদীর জলে আপনার তৃষিত ক্ষেত্র সিঞ্চিত করিয়া লয়, উৎপাদিকা শক্তিকে আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করে; যাহার দৃষ্টি আছে, প্রেরণা আছে সে মহাকবির সৃষ্টি-প্রবাহে আপন চিত্তকে আনন্দিত করিতে পারে; আপন প্রয়োজনে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে পারে; ব্যর্থ হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তত্ত্বের ভার সহিত না। তাঁহার রচনা তত্ত্বের পর তত্ত্ব দিয়া পাকা করিয়া বাঁধানো কোনো পথ নহে। তিনি তত্ত্ব লিখিব বলিয়া কোনো কিছু লেখেন নাই; অন্তত তিনি যখন কবি, আপন কবিধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন তত্ত্বের দায় তাঁহার কিছুমাত্র নাই। তাঁহার চিত্ত স্ব-ভাবে সত্যকে স্পর্শ করিয়াছে, আনন্দকে আস্বাদ করিয়াছে; তাহারই পরিচয় তাঁহার রচনায়, প্রকাশ তাঁহার সৃষ্টিতে। তত্ত্ব অবলম্বনের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের নাই; কিন্তু অন্যের আছে। তাঁহার রচনায় বুদ্ধি দিয়া ধরা যায় এরূপ বস্তুর সন্ধান করা অপরের দায়, অ-কবিদের একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেকে সার্থক হইয়াছেন, অনেকে রবীন্দ্র-রচনায় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, অনেকে ভবিষ্যতে করিবেনও— সুদূর ভবিষ্যতেও রবীন্দ্র-রচনায় এ অন্বেষণ ব্যর্থ হইবে না। অথচ কবি রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতসারে কখনো তত্ত্ব দিতে চাহেন নাই।

এইখানে একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্' সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি-স্বরূপ। সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁহার কোনো রচনায় বা বক্তৃতায় ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া ও বিশেষ করিয়া কিছু প্রকাশ করেন নাই। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নেতার এইরূপ প্রকাশহীনতা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সাম্যবাদী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার উত্তরে অপর এক নেতা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ নেতা ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কোনো কিছু বলেন নাই বটে, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক মতামতে ডায়ালেক্‌টিক্‌সের বিচার রহিয়াছে, কেবল বুঝিবার শক্তি থাকা চাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্ব দেন নাই, তবে চোখ থাকিলে আবরণের অন্তরালে আমরা যাহা চাই, যেভাবে চাই, তাহার সন্ধান মিলিবে। কবিবর কোনো বিষয়ে তত্ত্বের আকারে কিছু বলেন নাই, তাই বলিয়া তাঁহার কোনো বাণীই তত্ত্বহীন নহে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্ব দেন নাই, বরং তিনি তত্ত্বকে একটু দূরে দূরে রাখিয়াই চলিতেন। ইহার কারণ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস নহে, ইহার কারণ অন্যত্র বর্তমান। কবিগুরু বিজ্ঞানকে সত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত নহেন। বিজ্ঞানের পথ বিশ্লেষণের পথ, পরিমাপের পথ, বাহির হইতে ভিতরকে হিসাবে

আনিবার পথ। পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা, বহু দিকে তথ্য-সংগ্রহ, তাহার পর বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে বুদ্ধির আলোকে ঐক্য আবিষ্কার করিয়া তত্ত্বগঠন— বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি যে সত্যমুখী হইতে পারে না এরূপ মত রবীন্দ্রনাথ কখনো পোষণ করেন নাই। যুক্তিকে, গণিতকে অস্বীকার করার ভাব রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তত্ত্ব, যুক্তি, গণিত প্রভৃতির প্রতি কবি যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা রস-স্রষ্টাদের পক্ষে সাধারণ নহে। সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য এবং সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য বিজ্ঞানের বা দর্শনের তত্ত্ব-পথ যে কত মূল্যবান্ তাহা তাঁহার রচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 'বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়।'[১]

বিজ্ঞানের সাধনা ও মঙ্গলের সাধনার মর্যাদা একই। বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অন্ধতা ঘুচাইয়া কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া সত্য-পথে আনিয়া দেয়, মঙ্গলসাধনা প্রেমকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডি হইতে মুক্তি দেয়। বিজ্ঞান মানুষের এক দিকে মুক্তির উপায়।

'বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত।'[২]

যাহা মানুষের বন্ধন মোচন করে, অনন্তের সহিত যুক্ত করে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণই তো থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নিকট বিজ্ঞান যে মর্যাদা লাভ করিয়াছে কোনো বিজ্ঞানীর নিকট তদপেক্ষা বেশী পায় নাই। বিজ্ঞানের ঐক্য-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্য দিয়াছেন দর্শনের অভিপ্রায়কেও সে মূল্য দিতে হইবে। বিজ্ঞান বহুবিধ তথ্য-সঞ্চয়ের পর তাহাদের অন্তঃস্থিত ঐক্য অনুমান করিয়া বৃহত্তর ঐক্যের ইঙ্গিত দেয়, দর্শনও তেমনি যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বের পর তত্ত্ব গাঁথিয়া বৃহত্তর ভূমিকায় বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা খুঁজিতে থাকে। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করে; উভয়েই ঐক্যসন্ধানী। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'আমাদের জানা দু রকমের— জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা'[৩] তখন বুঝি জ্ঞানে জানা বলিতে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়কেই বুঝাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞান হউক আর দর্শনই হউক, অনন্তের এবং অনন্ত আনন্দের ভূমিকায় দেখিতে চাহিয়াছেন; এইজন্য ইহাদিগকে সত্যাভিমুখী বলিতে পারিয়াছেন।

তত্ত্ব ও তথ্যাবলী, বিজ্ঞানেই হউক আর দর্শনেই হউক, সত্যকে স্বীকার করিবার এবং সত্যকে জানাইবার একটি প্রকৃষ্ট পথ; রবীন্দ্রনাথ ইহাকে প্রশস্ত বলিয়াই মানেন। এইখানে সহজেই প্রশ্ন ওঠে, তত্ত্ব ও তথ্য-শ্রেণী যদি তাঁহার নিকটেও সত্য-স্বীকারের সার্থক পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে কবিগুরু স্বয়ং কেন তত্ত্বকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। যাহা সত্যকে প্রকাশ করে তাহাই সত্যদ্রষ্টার গ্রহণীয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখি কেন; তত্ত্বকে মানিতে প্রস্তুত, অথচ তাহাকে দূরে রাখিতেও উৎসুক— এ যেন পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস।

কবিগুরুর রচনা হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।—

'আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ, তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।'[৪]

যেমনটি আছে তেমনটির ভাব— ইহা টুক্‌রা ব্যাপার, ইহা খণ্ডিত স্বতন্ত্র পরিচয়। ইহার পরিচয় নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নিজেকে অতিক্রম করিয়া কোনো বৃহতের দিকে ইহার ইঙ্গিত নাই। তথ্যের সঞ্চয় যখন অসংখ্য, তখনো তাহারা সত্য নহে, কারণ তখনো তাহারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন খণ্ডিত 'যেমনটি আছে তেমনটি'। সত্যকে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিতে গেলে বা বুঝাইতে গেলে যাহা পাওয়া যায় তাহা সত্য নহে, তাহা তথ্য। একাধিক তথ্যের যান্ত্রিক সমাবেশে বা কেবলমাত্র সংখাধিক্যে সত্য-সৃষ্টি হয় না, সত্যের স্বরূপ জানা যায় না। সত্য ও তথ্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য তাহাই সত্যদ্রষ্টা কবিকে তথ্য হইতে দূরে রাখিয়া দিয়াছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সত্যানুভূতিকে তথ্যের প্রমাণের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে নারাজ ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে তথ্যবিমুখ বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে।

সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের একটি নেশা আছে, একটি মায়া আছে। তথ্যসন্ধানীরাও এই নেশায় পড়েন, মায়ার জালে পড়েন। তথ্যের পর তথ্য সংগৃহীত হইতে থাকে, প্রত্যেকটি অদ্ভুত সম্পদ্ জ্ঞানে সঞ্চিত হইতে থাকে, একটিকেও পরিত্যাগ করিতে মন চাহে না। সাধারণ বিজ্ঞানে ও দর্শনে তাই দেখি একান্ত তথ্যপ্রীতি, প্রত্যেকটিকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা, নিতান্ত ভ্রান্তি বা অসম্পূর্ণতার অপরাধে বহিষ্কৃত না হইলে আবশ্যক-অনাবশ্যক-নির্বিচারে সস্নেহে স্থান দেওয়া। তথ্যের সংখ্যা যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে সত্যও যেন তত দৃঢ়তর হইবে, বিজ্ঞানের ইহা রীতি। কোনো তথ্য বাহুল্য হইতে পারে— ইহা বিজ্ঞানরীতি-বিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টিতে সকল তথ্য আবশ্যক না হইতেও পারে, কখনো কখনো তথ্যাধিক্য সত্য-প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, সত্যের স্বরূপটি প্রকাশের জন্য তথ্যাবলী আবশ্যক হইলেও অনেক বর্জন করিতে হয়। তথ্যসন্ধানী মন এইরূপ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত নহে বলিয়া তাহার সিদ্ধান্তে সত্য বহু ক্ষেত্রেই মোহাবৃত হইয়া যায়। এই স্থানে কবিগুরুর রচনা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা যায়।—

'যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা -সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।'[৫]

সাধারণ বিজ্ঞান ও দর্শন এইরূপ তথ্য-বর্জন সহ্য করিতে পারে না, তথ্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া সার্থক হয় সেই সত্য অপেক্ষা উহাকে সম্মান বেশী দিয়া বসে। কবিগুরু যে তথ্যবিমুখ হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

ইহা ছাড়া তথ্যের অপরিণত অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথ্য প্রায়ই চরম-রূপে আবিষ্কৃত হয়— আবিষ্কর্তা আপন সংগ্রহকে চরম বলিয়া মনে করেন, মোহমায়া প্রতি তথ্যকে সম্পূর্ণ ও শেষ সত্যের রূপে দাঁড় করাইয়া দেয়। এক একটি তথ্য সত্যবিচারের মাপকাঠি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যায় এবং যখন ইহার জন্ম হয় নাই তাহার বহু পূর্বে শৈশব কৈশোর যৌবন প্রভৃতি লইয়া অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এপর্যন্ত যতগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়টি আজ টিকিয়া আছে? অধিকাংশ তথ্য আজ কোথায়? সেগুলিকে বলপূর্বক বহিষ্কার করা হইয়াছে, নহিলে তাহাদের ভিড়ে সত্য সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির আড়ালে গিয়া পড়িত। কিন্তু আবিষ্কারের প্রথম অবস্থায় সেই তথ্যগুলি বহুকাল ধরিয়া বহু দিকে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাহারা চরম ছিল ; পরিণত বুদ্ধিরও বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছিল, শ্রদ্ধা পাইয়াছিল। পরকালের বৃহত্তর ভূমিকায় তাহারা অত্যন্ত অপরিণত বোধ হওয়ায় বর্জিত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যকে অগ্রাধিকার দেন তাঁহাদের কাছে অপরিণত তথ্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ শৈশব কৈশোর যৌবনের তথ্যাবলী চরম বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শৈশব কৈশোর ও যৌবনের অন্তঃস্থলে যে ঐক্য নিহিত আছে, যে ক্রমপরিণতির রহস্য রহিয়াছে, যে জীবনধর্ম আছে তাহাকে সমগ্রভাবে সত্যরূপে বুঝিয়াছেন, তথ্যাবলী স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার মনে প্রভাব স্থাপন করে নাই। তিনি সমগ্র পদ্মাকে দেখিয়াছিলেন, তরঙ্গগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই, তরঙ্গের দ্বারা সমগ্র নদীকে বোঝেন নাই, বোঝাইতে চাহেনও নাই।

এই তো গেল তথ্যের কথা। তথ্যশ্রেণীর অন্তরে যে ঐক্যভাবটি, যাহাকে 'তত্ত্ব' বলিয়া বোঝানো হয়, তাহার সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা কম নয়। কারণ সেই একই, সেই স্বতন্ত্র খণ্ডিত অবস্থা, মোহমায়া ও অপরিণতির অনিশ্চয়তা। কবিগুরু তত্ত্বকেও অসংকোচে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ইহা ব্যতীত তত্ত্ব সম্বন্ধে আরো একটি সংশয়ের কারণ আছে। তত্ত্ব বিজ্ঞানেই হউক আর দর্শনেই হউক, প্রধানতঃ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির শক্তিতেই এক তত্ত্ব হইতে অন্য তত্ত্বে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, গণ্ডি হইতে গণ্ডির বাহিরে অগ্রগতি সম্ভব হয়। ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর ঐক্যের দিকে বুদ্ধির এই গতিকে কবি সত্যপথযাত্রা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন। তথ্য হইতে তত্ত্বে, তত্ত্ব হইতে সত্যে, অনন্তে, আনন্দে অভিযান বুদ্ধিশক্তিরই পরিচয়, বুদ্ধিরই জয়যাত্রা। তথাপি শেষ জয় তাহার নয়, সত্যে নিঃসংশয়ভাবে পৌঁছিতে ও বিরাজ করিতে বুদ্ধি অপারগ। কোনো কোনো পথে বুদ্ধি চরম সত্যকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া দেয়, সত্যকে দেখাইয়া দেয়, এমনকি সত্যকে একভাবে জানাইয়া বুঝাইয়াও দেয়। বুদ্ধি তত্ত্বের পথ দিয়া মানুষকে সত্যে আনিয়া দেয়, মানুষ স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে বুঝিয়াছি। কিন্তু সত্যকে স্বীকার ও সত্যের উপলব্ধি এক নহে। বুদ্ধি সত্যের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়, তাই বলিয়া উপলব্ধিসাধন তাহার সীমার বাহিরে। যেখানে তত্ত্ববুদ্ধি প্রধান সম্বল সেখানে অত্যন্ত নৈকট্য-সত্ত্বেও সত্যের ব্যবধান অসীম, বুঝিয়াছি বলিলেও বোঝা হয় না। তত্ত্বের ভিতর দিয়া সত্যকে বোঝা বা বোঝানোর মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়। এ কথা ঠিক নহে যে তত্ত্বের পথে সত্যকে বুঝিয়াছি ; বলা উচিত তত্ত্ব-দ্বারা সত্যকে অনুমান করিয়াছি, প্রমাণ করিয়াছি, দেখি নাই, স্পর্শ করি নাই, সত্যে বিরাজ করি নাই ; বুদ্ধির প্রভাবে অপরকে বুঝাইয়াছি না বলিয়া অপরের স্বীকৃতি আদায় করিয়াছি বলাই ভালো। এই স্থানে জনৈক বিজ্ঞানীর উক্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে—

Take mathematics for a start, the clearest thing there is. And there is no need to be highbrow ; let us think of some definite elementary theorem, say that which asserts that the perpendiculars drawn from the vertices of a triangle on the opposite sides meet in a point. This is proved by a series of logical steps, each very simple in itself, and when you have gone through them you have to admit that the thing is proved. But do you *understand* it ?

Descartes described how he would go over and over the separate logical

steps in a proposition until the whole thing appeared in his imagination as a single idea, only then did he claim to understand it. This seems to be the essence of understanding the fusion of a number of separate details into a single whole, in which the details form a pattern, essentially present but not obtruding themselves.

Our task in understanding is to form in our minds this elusive unity, this concept of a single whole.[৬]

বিজ্ঞানীর মতে তত্ত্ব ও যুক্তির পথে যাহা পাই আমরা তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য; তাই বলিয়া যুক্তির পাওয়া ও সত্যকে পাওয়া এক নহে। সত্যকে স্বীকার করানো পর্যন্তই যুক্তির সীমা; উপলব্ধির জন্য বুদ্ধির অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ যুক্তিগুলি যুক্তি হিসাবেই মনে অবস্থান করে ততক্ষণ সত্যের অনুভূতি ঘটে না। সমস্ত যুক্তি সকল স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষে ঘুচাইয়া এক বৃহৎ ঐক্যে লীন হইবামাত্র চিত্তে সত্যের স্পর্শ জাগে, তখনই বলা যায় 'বুঝিয়াছি'। ইহাই অনন্তের সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ-মুহূর্ত; এইভাবেই প্রেমের ন্যায় বিজ্ঞান্ মানুষের বন্ধন মোচন করে।

রবীন্দ্রনাথের দুই প্রকার জানার অর্থ এখন পরিষ্কার হইয়া আসে। 'আমাদের জানা দু রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা।'[৭] জ্ঞানে যাহা জানি তাহা সীমিত; অনুভবে আমরা অনন্তের সঙ্গে যোগ-স্পর্শ পাইতে পারি। তত্ত্ব দিয়া, বুদ্ধি দিয়া যে জানা তাহা জ্ঞানে জানা। তাহা অনুভবের স্পর্শকে, সত্যকে, অনন্ত আনন্দকে আয়ত্তে আনিতে পারে না। নিছক তত্ত্বের জানা রবীন্দ্রনাথের কাছে যথেষ্ট নহে। তত্ত্বপারের উপলব্ধিকে তত্ত্বের ছকে বুঝিতে গেলে বিভ্রাটই ঘটে, ছায়াকে কায়া বলিয়া ভ্রান্তি হয়। কবিগুরু এই কারণে বুদ্ধিনির্ভর তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার নিকট তত্ত্ব সত্যাভিমুখী হইতে পারে, কিন্তু চরমতার পুরস্কার তত্ত্বের নহে। তাঁহার অনুভূত সত্যকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করা এবং বুদ্ধিগম্য করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ শুধু নহে, ইহা ত্রুটিসংকুল তাহা তিনি জানিতেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শনের ও সত্যজ্ঞাপনের পথ কী তাহার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। জানার দ্বিতীয় পন্থাটি তাঁহার, অনুভবের জানাকেই তিনি তাঁহার জীবনে মানিয়াছেন। দর্শনসম্মত যুক্তির পর যুক্তি সাজাইয়া ধাপে ধাপে সত্যের দ্বারে আসা রবীন্দ্রনাথের নহে। সত্য-উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন তাঁহার অনুভূতি।

'অনুভব' কথাটির একটু ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ অনুভব ও অনুভূতির অর্থ হৃদয় দিয়া কোনো রস উপভোগ করা। অপরের দুঃখ দেখিলাম, মনে বেদনাবোধ করিলাম, চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল; অপরে বলিল: ইনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি, তাই অপরের দুঃখ অনুভব করিতে পারিলেন। অন্যের সুখ দেখিয়া হৃদয়ে সুখের ভাব সৃষ্ট হইল, হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছি বলিয়াই অন্যের সুখে সুখী হইলাম। গান ভালোবাসি, প্রভাতের আলো ভালো লাগে, সন্ধ্যার নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রাণে অব্যক্ত বেদনার উত্তেজনা আনিয়া দেয়— ইহা আমার হৃদয়ানুভূতির দান, হৃদয়ের একপ্রকার ভোগ। হৃদয়ের রসভোগকেই সচরাচর অনুভব বা অনুভূতি বলা হইয়া থাকে।

ইহার আর-একটি অর্থ আছে; কবিগুরুর উক্তি হইতেই ইহা বোঝা ভালো।—

'মন দিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।
জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।
ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।'[৮]

'অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।'[৯]

এখানে অনুভবের অর্থ জানা এবং আপন করিয়া জানা, অর্থাৎ আপনাকেই জানা। অনুভবে যে আপনাকে জানা তাহা অন্য কিছুর যোগে আপনাকে জানা। যেখানে আমি যেমন আছি তেমনি নিজেকে জানিতেছি সেখানে অনুভবের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। অপর কিছুকে অনুভবে জানিতে গেলে অপর কিছুর মতো আপনাকে পরিণত করিতে হয়, অপর কিছুর মতো নিজে হইয়া উঠিতে হয়, তখন এই হইয়া-ওঠা আপনাকে অনুভব করিয়া সত্যকে পাইতে পারা যায়। যাহা জানিতে চাহি, যাহার সত্যস্বরূপ বুঝিতে চাহি, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া তাহাকে অথবা একাত্মতায় নূতন নিজেকে জানিতে হইবে; তবেই হইবে অনুভবের জানা। ইহাই হইবে চরম জানা।

অনুভূতি হৃদয়ের ধর্ম, বুদ্ধির নহে। হৃদয়ের ধর্ম রসাস্বাদ করা— অনুভূতির সকল ক্ষেত্রেই রসাস্বাদ ঘটে। তথাপি হৃদয়ানুভূতির দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে শুধু রসভোগ, ভোগই লক্ষ্য, ভোগেই অনুভূতির সমাপ্তি। সেখানে অনুভূতি ক্ষণিক, খণ্ডিত এবং পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র। তথ্যের ন্যায় ইহা টুক্‌রা টুক্‌রা; ইহাদের সমাবেশে কোনো ঐক্যের সৃষ্টি হয় না, আনন্দের স্পর্শ ইহাতে থাকে না। টুক্‌রা অনুভূতি ব্যক্তিগত সম্পদের ন্যায় সংকীর্ণ, ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যে যেমনভাবে রসভোগ করিতে পারে খণ্ডিত অনুভূতি তাহার কাছে সেইরূপ। ইহাতে রসভোগীর নিজের মধ্যে কোনো নূতনত্ব জন্মলাভ করে না, ভোগের বস্তু বা বিষয় যেমন আছে তেমনিই থাকে, বাহির হইতে দেখার ন্যায় ও সংবাদ-গ্রহণের ন্যায় হৃদয়ের বাহিরেই থাকিয়া যায়। খণ্ডিত অনুভূতি ও তাহার বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে যে রসসম্বন্ধ থাকে তাহা ছায়ার ন্যায় পরিবর্তনশীল, রসভোগী ও রসকেন্দ্রর যে কোনোটির পরিবর্তনে রসাস্বাদও পৃথক হইয়া যায়; আজ যাহা ভালো লাগে কাল তাহা নিষ্ফল হইতে পারে, আমার কন্যার ব্যথিত দৃষ্টি আমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত করিলেও প্রতিবেশী-কন্যার আর্তনাদ আমার হৃদয় স্পর্শ না করিতেও পারে। ইহাই হইল টুক্‌রা অনুভূতি, হৃদয়ের প্রথম স্তর, অনুভবের অতি সাধারণ অর্থ।

হৃদয়ের দ্বিতীয় স্তরে ভোগ লক্ষ্য নহে, ভোগ অতিক্রম করিয়া আনন্দের অনন্ত প্রবাহে যুক্ত হওয়াই ইহার পরিণতি। সেখানে অনুভূতি বিশেষিত নহে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে, সকল বিশেষের মধ্যে যে ঐক্যটি রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শ করে, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যায়। ইহা নৈর্ব্যক্তিক পরিণতি। ইহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে, অনুভবকারী ও তাহার বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে সকল ব্যবধান অন্তর্হিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।'[১০] অনুভবের পূর্ব মুহূর্তেও যাহা বাহিরের পদার্থ, গভীর ও ব্যাপক অনুভূতির যোগে তাহার 'বাহির' ঘুচিয়া যায়। বাহিরের দৃষ্টিতে কেবল স্বাতন্ত্র্যই দেখা যায়; একটি ফুল অপরটি হইতে পৃথক্‌— পাপড়িতে, রঙে, গন্ধে, শোভায় নানাভাবে পৃথক্‌। তথাপি বাহিরের এই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সকল ফুলের অন্তরে যে প্রাণাবেগের ও আনন্দের প্রকাশটি রহিয়াছে তাহা

জানিবার জন্য বাহিরের দৃষ্টি যথেষ্ট নহে, তাহার জন্য সেই নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী অনুভূতির প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নিকট অনুভব-যোগই একমাত্র উপায়।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে খণ্ড অনুভূতি ও তাঁহার অনুভূতির তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার 'ডাকঘর' নাটিকাটি (ইহাকে কাব্য বলিলেই বা কী ক্ষতি) হৃদয়স্পর্শী ছবির মালা। ইহাতে কত ছবি— অমল ও মাধবদত্ত, অমল ও দইওয়ালা, অমল ও মোড়ল, অমল ও সুধা, অমল ও ঠাকুরদা। ইহাদের প্রত্যেকটি রসিকচিত্তে বিবিধ রসের অনুভূতি জাগায়, হৃদয় যেন আর সব ভুলিয়া এক একটি দৃশ্য হইতে আকণ্ঠ রস পান করিতে থাকে। কিন্তু এই অনুভূতি, এই রসপান ভোগেই সীমাবদ্ধ, একটি ছবি অপরটি হইতে ভোগের দিক দিয়া স্বতন্ত্র, ছবিগুলি নিছক এক-একটি ছবি, বিভিন্ন রসের আধার মাত্র। খণ্ডিত অনুভূতিতে ইহার বেশী পাইবার কিছু নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অন্য কিছু লাভ করিয়াছে এবং তাহারই প্রকাশের রূপ এই 'ডাকঘর'। সমস্ত দেশ ও সমস্ত কাল জুড়িয়া মানবচিত্তে মুক্তির একটি অব্যক্ত ক্রন্দন রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভবে তাহার সুরটি বাজিতেছে, জাগতিক ভাষার সকল ব্যর্থতা সত্ত্বেও ডাকঘরে তদনুসারে একটি মূল সুর রহিয়াছে। সেই সুরে সত্যের স্পর্শ আছে। ডাকঘরের সকল ছবির অন্তরে এই সুরটি, এই সত্যটি বর্তমান; ছবির স্বতন্ত্র রস এখানে গভীর আনন্দরূপে বিরাজিত, ঐক্যবদ্ধ। ছবিগুলির স্বাতন্ত্র্য নাই, সব মিলিত হইয়া একটি ঐক্যকে প্রকাশ করিতেছে, ভোগস্পৃহা পার করিয়া সত্য-উপলব্ধিতে পৌঁছিয়া দিতেছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের অনুভব ও তাহার ভাষাগত প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিত অনুভূতিকে সত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন না, ইহাকে তথ্যজাতীয় বলিয়া জানিতেন। জীবনের স্বতন্ত্র স্মৃতি লইয়া ও তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি আত্মজীবনী লিখিতে রাজী হন নাই। আত্মজীবনীতে তাঁহার সমগ্রতার পরিচয় থাকা প্রয়োজন, অথচ স্বতন্ত্র টুকরা স্মৃতি দিয়া কোনো সমগ্রভাব প্রকাশ করা যায় না। জীবনস্মৃতির এক স্থলে অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়াবেগের উল্লেখ করিয়া এরূপ উত্তেজনা সম্পর্কে কবি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। ... সত্য-উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই, যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বাধা ছিল না।'[১১]

জানা গেল রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন অখণ্ড অনুভূতি, একাত্মানুভূতি। এই পথের দৈর্ঘ্য নাই, ইহা যখন সত্যে পৌঁছায়, তখন একেবারেই পৌঁছায়। ধাপে ধাপে মই বাহিয়া ওঠা ইহাতে নাই, ইহা যেন একেবারে নীলাকাশেই জন্মলাভ। কোনো শিশুতত্ত্ব বা শারীর তত্ত্ব মায়ের আয়ত্তে নাই, অথচ আপন সন্তানের তুচ্ছতম অসুস্থতা তাঁহার চোখে কেমন করিয়া ধরা পড়ে। কোনো যুক্তির সম্বল না লইয়াই মাতা পুত্রকে জানিতে পারেন, তিনি উপলব্ধি করেন। সন্তানের স্বাস্থ্য অনুভব করিয়া মা তিরস্কার করেন, সতর্ক করেন, নানারূপ দৈহিক লক্ষণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া আপন অভিজ্ঞতা-অনুসারে বর্ণনা করেন, বিবিধ প্রমাণে ও যুক্তিতে পুত্রের অসুস্থ অবস্থাটি প্রকাশ করিতে চান। মায়ের অনুভূতি প্রথম, পরে আসে প্রকাশের চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ অনুভূতি-যোগে প্রথমেই সত্যকে উপলব্ধি করিতেন, তাহার পর আপনাকে প্রকাশ করিতেন

কাব্যে, প্রবন্ধে, সংগীতে। প্রথমেই সত্যের উদ্‌ভাস, পরে আত্ম-প্রকাশ।— 'অধিকাংশ সত্যই আমরা মনের মধ্যে আভাসরূপে পাই, এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ করে গড়ে পিটে তার একটা আগাগোড়া খাড়া ক'রে তুলতে চেষ্টা করি।'[১২] সত্যের স্পর্শ বা আভাস যখন পাওয়া যায় তখন সোজাসুজি মনের মধ্যে অকস্মাৎ পাওয়া যায়, কোনো পথ বাহিয়া নহে। আভাসের প্রকাশ তখন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আভাসকে আপনার কাছে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ করিবার প্রেরণা বোধ হয়, তখনই প্রকাশের নানারূপ সাধনা চলিতে থাকে। আভাস নহে, ইঙ্গিত নহে, সত্য তাহার সম্পূর্ণ মহিমায় যখন উপলব্ধিতে আসে তখন সমাধি ঘটে, তখন তাহা প্রকাশের অতীত। সত্যকে যখন আভাসে উদ্‌ভাসে পাওয়া যায় তখনই তাহার প্রকাশ সম্ভব, নতুবা পূর্ণজ্যোতিঃ সত্য সকল প্রকাশের বাহিরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যের আভাসই সম্ভব, সেইজন্য তাহার প্রকাশের চেষ্টাও সম্ভব।

প্রথমেই সত্যানুভূতি— ইহা কবিজনেচিত বা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহা যেমন বিজ্ঞানীদের সাধনাতেও তেমনি। যে-সকল বিজ্ঞানী যুগান্তর রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সত্যকে আকস্মিক উদ্‌ভাসেই পাইয়াছেন, যুক্তির পথে পান নাই। পাওয়া-সত্যকে যুক্তির দ্বারা নূতন করিয়া স্বীকার করিতে ও করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সত্যের উপলব্ধি ঘটিয়াছে এ-সকল চেষ্টার পূর্বে। এ যুগের বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইন এই ভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য নূতন গণিত-পদ্ধতির আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে পরে। সত্যোপলব্ধিতে কবি ও বিজ্ঞানীর ভেদ নাই, সত্যের সাক্ষাতে উভয়েই আত্মনিবেদিত।

সত্যকে প্রকাশের প্রেরণা মানবচিত্তের একটি বিশেষত্ব। সত্যের মধ্যেই প্রকাশের বেগ নিহিত আছে, প্রকাশ-ব্যতীত সত্য যেন পূর্ণ হয় না। মানবচিত্ত তাই প্রকাশের প্রেরণায় অস্থির। সত্য যেখানে প্রকাশের অতীত সেখানে চিত্ত এক অব্যক্ত 'বেদনা' অনুভব করিতে থাকে। প্রকাশের চেষ্টা আছে, সিদ্ধি নাই, এরূপ অবস্থায় অবর্ণনীয় এক 'বেদনা' কাব্যে চিত্রে সংগীতে ঝরিয়া পড়িতে থাকে— 'বেদনা কী ভাষায় রে মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে!' সত্যের প্রকাশ যেখানে ঘটে, সে যে ভাবেই ঘটুক, সেখানে তত্ত্বের দানা-বাঁধা সম্ভব। কাব্যে, চিত্রে, সংগীতে, দর্শনে, গণিতে, সকল-রূপ প্রকাশে নানাভাবে তত্ত্ব থাকিতে পারে।

বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রকাশের প্রেরণায় কত গণিত কত যুক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। মহাকবি ও মহাশিল্পীদের সৃষ্টি আজিও থামে নাই। বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মানুষকে তত্ত্ব দান করেন, তত্ত্বের পথে সত্যকে স্বীকার করিবার আহ্বান জানান। মহাকবির পথ ভিন্ন, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভিন্ন। তিনি তত্ত্বের পথে মানুষকে ডাকেন নাই; তিনি কাব্য, চিত্র, সংগীত সৃষ্টি করিয়াছেন কোনো দার্শনিক তত্ত্বের জন্য নহে। তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার প্রকাশ অনুভবে। যদি তিনি মানুষকে ডাক দিয়া থাকেন তিনি ডাকিয়াছেন সত্যকে কেবলমাত্র স্বীকার করিবার জন্য নহে, সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য। তাঁহার আহ্বান অনুভূতির আহ্বান, কারণ তিনি অনুভবযোগী।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের একাধিক শুভ মুহূর্তে সত্যের স্পর্শ-লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রকাশের পীড়াও অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে, সংগীতে, চিত্রে নানা বেশে তত্ত্ব থাকিবেই। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিতে যে একটি অব্যক্ত বেদনার সুর লাগিয়া আছে, যে সুরে প্রকাশাতীত সত্যোপলব্ধি পথ

খুঁজিতেছে, তাহাতে বুদ্ধিজীবীর কিছু পাইবার নাই ; কারণ সেখানে সীমাবদ্ধ প্রকাশ নাই, তত্ত্বও নাই। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব লিখিবার জন্যই কিছু লেখেন নাই। তথাপি সত্যকে ভাষায় যেখানে প্রকাশ করিবার সাধনা করিয়াছেন তত্ত্বসন্ধানীরা সেখানে বহুকাল ধরিয়া বহু অমূল্য মণিরত্নের অন্বেষণ করিতে পারেন, আশাভঙ্গের আশঙ্কা নাই।

১,২ শান্তিনিকেতন (১৩৫৬) প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৯০

৩,৭,৯,১০ সাহিত্যের পথে (১৩৫৬) পৃ ১২৫

৪,৫ সাহিত্যের পথে (১৩৫৬) পৃ ৫৪, ৫৬

৬ Science : Sense of Nonsense (1951) by Synge, P 111

৮ সাহিত্যের পথে (১৩৫৬) পৃ ৭

১১ জীবনস্মৃতি (১৩৫৪) পৃ ১২৫

১২ লোকেন পালিতকে লেখা চিঠি (১২৯৮) : সাহিত্যের পথে (১৩৪৩) পৃ ১৫৭

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

১। রামায়ণ

কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ-বালকে।

—নগরসংগীত, চিত্রা

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আধুনিক ও প্রাচীন উভয় কালের পক্ষেই সত্য, এটা কবিকল্পনামাত্র নয়। 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনায় রামায়ণের গূঢ়ার্থনির্ণয়-প্রসঙ্গ তিনি বলেছেন, 'কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে'। মায়াবী স্বর্ণমৃগের এই গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং বাল্মীকিও যে সচেতন ছিলেন তার আভাস আছে রামায়ণেই। সীতাহরণের কাল হচ্ছে হেমন্ত ঋতু ; তখন চতুর্দিকের বনভূমি শিশিরাচ্ছন্ন ও যবগোধূমমণ্ডিত, আর পূর্ণতণ্ডুল ধান্যশীর্ষের সোনার আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত। সংবৎসরের মধ্যে এই হেমন্ত ঋতুটাই ছিল রামের প্রিয় ঋতু, অথচ এই ঋতুতেই সীতাহরণ ঘটল প্রবলপ্রতাপ রাবণের হাতে। এ ব্যাপারটা তাৎপর্যহীন নয় বলেই মনে হয়। আর এই দুর্ঘটনা হল স্বর্ণময় মায়ামৃগের লোভে, এটাও সম্ভবতঃ নিরর্থক নয়। এই স্বর্ণমৃগ যে মরীচিকাময়, তাও একটি নিত্য সত্য। এই স্বর্ণমরীচিকাকেই আধুনিক কবি বলেছেন 'স্বর্ণঝলক'। প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, যখনই ধনের লোভে ধান্য অভিভূত হয়েছে, যখনই ধানের স্বর্ণকান্তি ধনের স্বর্ণকান্তির কাছে হার মেনেছে, তখনই ঘটেছে অকল্যাণ। স্বর্ণ-মৃগরূপী মারীচ যে স্বর্ণময় ধনসম্পদেরই প্রতীক, তার আভাস পাওয়া যায় মায়ামৃগের বর্ণনাতেই। রাবণ মারীচকে বলছেন,—

সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি॥ —আরণ্যকাণ্ড ৪০।১৭-১৮

'রজতবিন্দুচিত্রিত সোনার মৃগ হয়ে তুমি রামের আশ্রমে গিয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। অতঃপর সীতাকে প্রলুব্ধ করে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।'

এই বর্ণনার মধ্যেই স্বর্ণরৌপ্যের লোভের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই বর্ণনাটা আরণ্যকাণ্ডের অন্যত্রও (৩৬।১৮) পাওয়া যায়। এই কাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গে 'রত্নময় মৃগ' সম্পর্কে 'রূপ্যধাতু'র উল্লেখও আছে। তা ছাড়া আছে,—

মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।
রৌপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রো ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ॥ —আরণ্যকাণ্ড ৪২।১৯,২২

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী শ্রীরামকিংকর

পরবর্তী সর্গে 'হেমরাজতবর্ণে'র কথা আছে। বোঝা যাচ্ছে,—পরিপূর্ণ হেমন্তের পক্বশস্যের সোনার পরিবেশের মধ্যে ধনরত্ন-সোনারূপার লোভেই অকল্যাণ ঘটেছিল, রামায়ণের এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

২। অশোক

১৯১২ সালে লিখিত 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে (পথের সঞ্চয়) রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে (অর্থাৎ অশোকের সময়ে) এবং তৎপরবর্তী যুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের ত্যাগ-ধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করে ভারতীয় ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হয়ে মানবকল্যাণের জন্যে অকাতরে দুঃখ বহন করেছেন এবং ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করেই ভক্তগণকে 'বীর্যবান্ মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা' দান করেছিল। বুদ্ধদেব ও অশোকের ধর্মপ্রেরণার প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত দীর্ঘকাল পরেও নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৩৫ সালে (বাংলা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৪, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি) কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধজন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তাতেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। ভাষণটি 'বুদ্ধদেব' নামে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায়; এটি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। তাতে তিনি বলেন—

ভগবান্ বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে।· · তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান্ পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি,— শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়।

এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান্ বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড় রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে? সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয়নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। —প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়

এই যে সকল কালের সকল মানুষের কল্যাণসাধনের প্রেরণা, অশোকের অনুশাসনেও তার প্রকাশ ঘটেছে বার বার। যেমন— নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা (ষষ্ঠ পর্বতলিপি), অর্থাৎ 'সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নেই'। বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এই যে,— এ ধর্ম দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাতে বীর্যের স্থান নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কঠিন বীর্যের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। যে প্রেমময় ত্যাগের আবেগ মানুষকে মানবকল্যাণের জন্য দেশে দেশান্তরে দুর্গমে দুস্তরে অভিযান করতে প্রেরণা দেয়, নিজের প্রাণ ও আরামকে তুচ্ছ করে দুঃখের মহত্ত্বকে বরণ করতে শিক্ষা দেয়, সেই ত্যাগপ্রতিষ্ঠ প্রেমের বীর্যবত্তার তুলনা কোথায়? এই প্রেমের বীর্যই দুঃসাধ্যসাধনে, সংগ্রামজয়ে ও সমস্ত বন্ধন ছেদনে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। এই 'অমেয় প্রেমের মন্ত্র' হচ্ছে 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'। এই মহামন্ত্রের প্রভাব ও

প্রেরণা কতখানি, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর বোরোবুদুর ও সিয়াম কবিতায় (পরিশেষ কাব্যে)। এই দ্বিতীয় কবিতাটি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে শৈলতটে সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার যবে দিল খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে ॥

—পরিশেষ, সিয়াম— প্রথম দর্শনে (১৯২৭)

ত্রিশরণ মন্ত্রের প্রেরণায় এই যে মানুষ মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে সমুদ্রের কূলে উপকূলে দেশে দেশে বিচিত্র কর্মে, মন্দিরে মূর্তিতে চিত্রপটে, দুঃসাধ্য কীর্তির অর্ঘ্য ভগবান্ বুদ্ধকে নিবেদন করেছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে তার চেয়েও মহত্তর অর্ঘ্য রচনা করেছিলেন রাজাধিরাজ অশোক। অশোক নিজের অন্তরের হিংসাকে দমন করে সর্বজগতে অহিংসা প্রেম ও কল্যাণের ধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্রত ধারণ করলেন। বুদ্ধের চরণে এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য আর কি হতে পারে? মরুপ্রান্তরে শৈলশিখরে সমুদ্রকূলে বিচিত্র কর্মকীর্তি প্রতিষ্ঠার চেয়েও এই চিত্তমার্জনার ব্রত যে মহত্তর দুঃসাধ্যতর এবং অধিকতর ত্যাগ ও বীর্যবত্তার পরিচায়ক, তাতে কি সন্দেহ আছে?

১৯৪০ সালে হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা ভারতবর্ষের মৌর্যরাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। বইটির নাম *When Peacocks Called*। রবীন্দ্রনাথ এটির একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখে দেন মৃত্যুর অল্পকালমাত্র পূর্বে (১৯৪০)। ওই ভূমিকাটিতেও অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত অভিমতই সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃঢ় ভাষায় পুনঃপ্রকাশ পেয়েছে।—

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book

to reveal the organisation side of *a great humanism* which came with king Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a *perennially modern* significance.

বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথাগুলি বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম। ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবের মধ্যেও অশোক যে মহৎ মানবিক আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আজও তা জগতের অভীষ্টস্থানীয় হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎকালে অশোকের কর্মপ্রেরণা বিশ্ববাসীকে যে বীর্যবান্ 'মহৎ মনুষ্যত্বের' দীক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান করেছিল, আজকের দিনেও তার মহনীয়তা কিছুমাত্র কমেনি; কারণ বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অশোকের সাধনাপুষ্ট ওই মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ 'চিরকালের আধুনিক' অর্থাৎ চিরন্তন। তাই দেখি মহৎ মনুষ্যত্বের প্রেরণাদাতা হিসাবে অশোকের সম্বন্ধে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৯৪০ সালেও তাঁর সে শ্রদ্ধা সমভাবেই উজ্জ্বল ছিল।

৩। শিবাজী

শরৎকুমার রায়-প্রণীত 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি'-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।··তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ হয় না।··কি নিয়মে কিসের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়া যদি কেহ সেই তত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়, তবে কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।' বলা বাহুল্য মারাঠা-ইতিহাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শিবাজী। শিবাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি অভিমত পোষণ করতেন, তাঁর মতে শিবাজীর ইতিহাস আমাদের জন্যে কি শিক্ষা বহন করে, তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন। তাই এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের মূল্য কতখানি তাও দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তাই দু-একটি মাত্র দিকের আলোচনা করেই নিরস্ত হব।

শিবাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে ঔৎসুক্য অনুভব করেন বলতে পারি না। তাঁর 'গুরু গোবিন্দ' কবিতার (মানসী কাব্য) রচনাকাল ১৮৮৮ সাল। সুতরাং তার কাছাকাছি সময়েই তিনি ভারত-ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক শিবাজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত 'প্রতিনিধি' (১৮৯৭) কবিতার পূর্বে তাঁর কোনো রচনাতেই শিবাজীর কথা পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। ওই কবিতাটিতে শিবাজীকে ধর্মগুরু রামদাসের (১৬০৮-৮১) প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। রাজশিষ্যের প্রতি গুরুর নির্দেশ এই—

তোমারে করিল বিধি
ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;

পালিবে যে রাজধর্ম
জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

আচার্য যদুনাথও এই কাহিনীটিকে অনৈতিহাসিক বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর বাংলা শিবাজী গ্রন্থে (ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ ২৪০) আছে—

রাজ্যের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যখন এক সন্ন্যাসী, তখন সেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বস্ত্র শিবাজীর রাজপতাকা হইল— ইহার নাম 'ভাগবে ঝাণ্ডা'।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি যা-ই হক, এর দ্বারা রাজাহিসাবেও শিবাজীর ধর্মনিষ্ঠতা সূচিত হচ্ছে সন্দেহাতীতরূপে। রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই ধর্মনিষ্ঠতার দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁর পরবর্তী রচনাতেও তার প্রমাণ আছে।

'প্রতিনিধি' কবিতাটি যে সময়ে রচিত হয় তার কাছাকাছি সময়েই মহারাষ্ট্র দেশে 'শিবাজী-উৎসব' অনুষ্ঠানের রীতি প্রবর্তিত হয়। তার অল্পকাল পরেই সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্‌যোগে বাংলা দেশেও শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠানের আগ্রহ দেখা দেয়। বাংলা দেশে প্রথম শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। রবীন্দ্রনাথও অচিরেই এই উৎসবের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯০৪ সালের উৎসব উপলক্ষ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং এটি শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এই পুস্তিকারই ভূমিকা-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী-উৎসব' নামক বিখ্যাত কবিতাটি লিখে দেন। এই কবিতাটিতেও তিনি শিবাজীর বীর্যময় ধর্মনিষ্ঠতার উপরেই জোর দিলেন; তাঁর কর্মকীর্তিকে তিনি 'পুণ্যচেষ্টা' ও 'সত্যসাধন' বলে বর্ণনা করলেন, তাঁকে আখ্যা দিলেন 'রাজতপস্বী বীর' ও 'ধর্মরাজ'। আর, ঘোষণা করলেন শিবাজীর আদর্শ স্বীকারের সংকল্পবচন।—

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল॥

এখানেও 'ভাগবে ঝাণ্ডা', ভাগবত পতাকা, উন্নয়নের কথা পাচ্ছি, আর পাচ্ছি সমগ্র ভারতে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ। এই কবিতা রচনার কয়েক মাস পরে লিখিত 'ধর্ম্মপদং' প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ) দেখি রবীন্দ্রনাথ ধর্মনিষ্ঠাকেই শিবাজীর কর্মসাধনার মূলকথা বলে স্বীকার করেছেন।—

আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।

—ধম্মপদং (১৯০৫), ভারতবর্ষ

এই যে ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র, তাকেই শিবাজী-উৎসব কবিতায় বলা হয়েছে 'ধর্মরাজ্য' এবং এইজন্যই শিবাজীকে বলা হয়েছে 'ধর্মরাজ'। প্রশ্ন হতে পারে— শিবাজীর ধর্ম কি সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম নয়, এবং তাঁর ধর্মরাজ্য কি হিন্দুস্বরাজ্য নয়? যদি তাই হয়, তবে শিবাজীকে আধুনিক কালেও আদর্শ বলে স্বীকার করা যায় কিরূপে? বস্তুতঃ 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটির জন্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও হিন্দুসাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা প্রভাতকুমারও সাম্প্রদায়িকতার বিচারে এই কবিতাটির মধ্যে 'দুর্বলতা' আছে বলে মনে করেন। অহিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিবাজী তথা শিবাজী-উৎসব কবিতা সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করেন বা করতে পারেন তা আমাদের বিচার্য নয়। ইতিহাস শিবাজী সম্বন্ধে কি বলে দেখা প্রয়োজন।

যদুনাথ-কৃত শিবাজী গ্রন্থে (ত্রয়োদশ অধ্যায়) আছে রামদাস এক পত্রে শিবাজীকে সম্বোধন করে বলেন,—'হে ধার্মিক বীর,· · পৃথিবী তোলপাড় হইয়াছে; ধর্ম লোপ পাইয়াছে।· · ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নিজ কীর্তি অমর রাখিও।' অতঃপর যদুনাথ নিজে বলছেন,—

শিবাজী শেষবয়সে রাজকার্যে সর্বদা স্বামীর উপদেশ লইতেন। রামদাসের শিক্ষায় ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের অনির্বচনীয় সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত এবং জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় শিবাজীর প্রতি উপদেশ মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার সাধনাকে সিদ্ধির সহজ পথে আনিয়া দেয়। রামদাসের ধর্মশিক্ষাকে 'ফলিত ভগবদ্‌গীতা' বলা যাইতে পারে; তাঁহার শিষ্য গীতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

—শিবাজী, ত্রয়োদশ অধ্যায়

'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় (১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
.তামার লিখন 'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি॥

এই উক্তি কবিমনের উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ যে এ কথাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করতেন তার প্রমাণ আছে। পূর্বোক্ত 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯০৮) তিনি এক স্থানে বলেছেন,—

মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন

হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্বোধনের সহিত জড়িত, এইজন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

যদি এ কথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যুমাত্র, তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন,— তবে তাঁহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন করিয়া কখনই সমস্ত মারাঠাজাতি এক হইয়া উঠিত না। বিশেষতঃ শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল, তখনও যে তাঁহার কীর্তি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশের ধর্মবুদ্ধির সহিত তাঁহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল, লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া ক্ষমতার ভাগ লইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই। —শিবাজী ও মারাঠাজাতি, ভূমিকা

এর থেকে বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে 'ধর্মরাজ' ও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যকে 'ধর্মরাজ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। শিবাজীর ধর্ম ও ধর্মরাজ্যের আদর্শে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল কি না তাও দেখা দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'ধর্ম' কথার দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই মারাঠাশক্তির উত্থান-পতনের কারণ বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে তিনি বলেন,—

অবশেষে যখন একদিন এই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল, যখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের শিকড়জালের মত মারাঠা-প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণবিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে,— ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস। · · ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। —শিবাজী ও মারাঠাজাতি, ভূমিকা

অর্থাৎ 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ, হত এব হন্তি'। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। এই ধর্ম হচ্ছে নিত্য ধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম; এ ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগে প্রণোদনা দেয়, সমস্ত ভেদবিভেদ লঙ্ঘনে সহায়তা করে, তাকেই তিনি বলেন ধর্মবুদ্ধি। এই ধর্মের বিপরীত 'বিধর্ম' নয়, এর বিপরীত 'অধর্ম'।

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

এটি হচ্ছে রবীন্দ্রদর্শনের একটি গোড়ার তত্ত্ব, এ কথা আজ সুবিদিত। মারাঠা-ইতিহাস থেকেও তিনি এই তত্ত্বের শিক্ষাই পেয়েছেন। যতদিন মারাঠাশক্তি ধর্মাশ্রয়ী ছিল ততদিন অকল্যাণ দেখা দেয়নি, আর যখন সে শক্তি ধর্মকে ছেড়ে অধর্মকে আশ্রয় করল তখনই ঘটল পতন। শিবাজীকে আশ্রয় করেই ধর্মের প্রভাব মারাঠা-জাতিকে অভ্যুদয়ের পথে প্রেরণা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এর দ্বারা কোনো সম্প্রদায়সেবিত বিশেষ ধর্মের কথা বলেননি, বিশ্বজনীন ও চিরন্তন মানবিক ধর্মের কথাই তিনি বলেছেন। সুতরাং ধর্মরাজ্য বলতেও তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মরাজ্যের কথা ভাবেননি।

'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি', এত বড় ভাবনা শিবাজীর মনে দেখা দিয়েছিল কিনা জানি না ; রবীন্দ্রনাথের মনে যে দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যে শক্তি স্বার্থকে সংযত ও অনৈক্যকে নিরস্ত করে সকলকে একই কল্যাণক্ষেত্রে মিলিত করে তারই নাম ধর্ম। এই ধর্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে রাজ্য, সেই ধর্মরাজ্যই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। কোনো সাম্প্রদায়িক রাজ্য তা পারে না, রবীন্দ্রনাথ যে এ কথা বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ আছে।

সমস্ত অনৈক্য ও ভেদবিচ্ছেদকে নিরাকৃত করে সমগ্র ভারতে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে পরবর্তী কালেও প্রদীপ্ত করে রেখেছিল। তার প্রমাণ 'ভারততীর্থ' কবিতা (১৯১০) ও 'ভারত-বিধাতা' গান (১৯১১)।

এস হে আর্য, এস অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ, এস এস খ্রীস্টান।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই আদর্শ বস্তুতঃ খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মশক্তিপাশে বেঁধে দেওয়ারই প্রকারভেদ এবং স্পষ্টতর রূপ মাত্র। জনগণের 'ঐক্যবিধায়ক' ভারতবিধাতাকে সম্বোধন করে যখন কবি বললেন,—

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা॥

তখন কি 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় নি ? বলতে গেলে ভারততীর্থ ও ভারত-বিধাতা রচনা-দুটি এই উক্তিরই মহাভাষ্যমাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিবাজীর অভ্যুদয়ের মূলে ছিল 'ধর্মের উদার ঐক্য' ; এই ধর্মগত উদার ঐক্যই ছিল তাঁর ধর্মরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি। ভারত-বিধাতা গানের দ্বিতীয় স্তবকটিও 'ধর্মের উদার ঐক্য' কথার বিশদ ব্যাখ্যা বললে অন্যায় হয় না।

এখন দেখা যাক শিবাজী যে ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা বস্তুতঃই অসাম্প্রদায়িক ও খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেঁধে দেবার পরিপোষক ছিল কি না। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আচার্য যদুনাথের অভিমতই উদ্ধৃত করছি।—

তিনি [শিবাজী] নিজে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।· · অথচ যুদ্ধযাত্রায় কোথাও একখানি কোরান পাইলে

তাহা নষ্ট বা অপবিত্র না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং পরে কোনো মুসলমানকে তাহা দান করিতেন ; মসজিদ ও ইসলামী মঠ দেখিলে তাহা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজীর মৃত্যুর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 'কাফির জেহান্নমে গেল' ; কিন্তু তিনিও শিবাজীর সৎ চরিত্র, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সর্বধর্মে সমান সম্মান প্রভৃতি দুর্লভ গুণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। শিবাজীর রাজ্য ছিল 'হিন্দবী স্বরাজ', অথচ অনেক মুসলমান তাঁহার অধীনে চাকরি পাইয়াছিল, উচ্চপদে উঠিয়াছিল।

—শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

মুসলমান পীরের আস্তানা ও মসজিদে প্রদীপ ও শিরণী সেই সেই স্থানের নিয়ম অনুসারে রাখিবার জন্য অর্থসাহায্য দিতেন। বাবা ইয়াকুৎ নামক পীরকে ভক্তি করিয়া কেলশী-নামক শহরে বসাইয়া জমি দান করিলেন। —শিবাজী, ত্রয়োদশ অধ্যায়

অতঃপর শিবাজী সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথের শেষ সিদ্ধান্ত এই।—

সর্ব জাতি, সর্ব ধর্মসম্প্রদায় তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান। ভারতবর্ষের মত নানা বর্ণ ও ধর্মের লোক লইয়া গঠিত দেশে শিবাজীর অনুসৃত এই রাজনীতি অপেক্ষা অধিক উদার ও শ্রেয়ঃ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। —শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

অতঃপর বোধ করি এ কথা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ শিবাজী সম্বন্ধে 'ধর্মের উদার ঐক্য' ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ আরোপ করে অপাত্রে প্রশস্তি বর্ষণ করেননি, এবং পরোক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি।

খাফি খাঁর ন্যায় ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও শিবাজীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। শিবাজীকে তিনি robber, wicked, treacherous ইত্যাদি বিশেষণেই ভূষিত করেছেন। এই স্মিথও লিখতে বাধ্য হয়েছেন,—

Sivaji possessed and practised certain special virtues which nobody would have expected to find in a man occupying his position in his time and surroundings. It is a curious fact that the fullest account of those special virtues is to be found in the pages of the Muhammadan historian, Khafi Khan, who ordinarily writes of Sivaji as 'the reprobater', 'a sharp son of the devil', 'a father of fraud' and so forth. An author who habitually applies such terms of abuse to his subject cannot be suspected of undue partiality towards him. Nevertheless Khafi Khan honours himself as well as Sivaji by the following passage:

··He made it a rule that wherever his followers went plundering, they should do no harm to the mosque, the Book of God, or the women of any one. Whenever a copy of the Kuran came into his hands, he treated it with respect, and gave it to some of his Musalman followers.···

—*Oxford History of India, pp. 432-33*

দেখা যাচ্ছে শিবাজীর মুসলমান অনুচরও ছিল, অথচ তিনি ছিলেন দিল্লি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার মুসলমান রাজাদেরই শত্রু। যে সময়ে তাঁর পরমশত্রু ঔরঙ্গজীব মন্দির ধ্বংস ও জিজিয়া কর স্থাপনের দ্বারা হিন্দুদের ঐকান্তিক বিরাগভাজন হয়েছিলেন, সে সময়েই হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু শিবাজী কোরান-মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মুসলমান পীর কর্মচারী ও সৈনিক অনুচরদের আস্থাভাজন ছিলেন। এর চেয়ে মহত্তর আদর্শ আর কি হতে পারে? শিবাজীর অনুসৃত ধর্মনীতিকে যদি অসাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ইতিহাস অশুদ্ধ হবে না। ব্যক্তি হিসাবে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হলেও রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন সম্প্রদায়নিরপেক্ষ নিত্যধর্মের উপরে নির্ভরশীল।

শিবাজীর ধর্মগত উদারতা সম্বন্ধে যদুনাথ তাঁর ইংরেজি শিবাজী গ্রন্থে বলেছেন,—

Religion remained with him an ever fresh fountain of right conduct and generosity; it did not obsess his mind nor harden him into a bigot. The sincerity of his faith is proved by ***his impartial respect for holy men of all sects (Muslim as much as Hindu) and toleration of all creeds.*** His chivalry to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in that age and extorted the admiration of hostile critics like Khafi Khan· · How well he deserved to be king is proved by his equal treatment and justice to all men within his realm, ***his protection and endowment of all religions,*** his care for the peasantry.(বক্রলিপি লেখককৃত।) —*Shivaji, Chapter xvi*

তবে কেন শিবাজীর ধর্মরাজ্য স্থায়ী হল না? তবে কেন মারাঠারা শেষ পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা নেশনে পরিণত হতে পারল না? 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' গ্রন্থের (১৯০৮) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে, ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।' শিবাজীর 'ধর্মসাধনা' একদিন তাঁর উত্তরাধিকারীদের 'স্বার্থসাধনে' বিকৃত হয়ে গেল এবং ঈর্ষা অবিশ্বাস ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় মারাঠাপ্রতাপের হর্ম্য দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল। এই ব্যাখ্যাও যথেষ্ট নয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ মারাঠাদের পতনের কারণ আরও গভীরতরভাবে নির্ণয় করেন। তাঁর সে অভিমত পাওয়া যায় শরৎকুমার রায়-প্রণীত 'শিখগুরু ও শিখজাতি' পুস্তকের ভূমিকায় (১৯১১)। এই প্রবন্ধে শিখ-ইতিহাসের তুলনায় মারাঠাশক্তির উত্থানপতনের কারণও আলোচিত হয়েছে। শিবাজীর অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি তাতে বলেন,—

শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠাজাতির অবতারণ করিয়াছিলেন; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ রাজ্যবিস্তার যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল। · ·

শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে মুসলমান শাসন হইতে মুক্তিদান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন

তাহা আয়তনে· · ব্যাপক ; সুতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই ।· ·

শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপানপরম্পরার মত ; তাহা রাগারাগি-লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল। তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি অভিপ্রায় সাধনের উদ্‌যোগ। —শিখগুরু ও শিখজাতি, ভূমিকা

এই মহৎ অভিপ্রায় ও বৃহৎ আয়োজন শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে ও সুদূরকালে ব্যাপ্ত না হয়ে অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই 'শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশোয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতারূপে কলুষিত হইয়া উঠিল।' তারই বা কারণ কি? কারণ এই।— 'শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এইজন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক না কেন, তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টারূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই; এইজন্যই মারাঠার এই উদ্‌যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গির উপদ্রবরূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।'

শিবাজীর অভিপ্রায় ও চেষ্টা যে সমস্ত দেশের অভিপ্রায় ও চেষ্টা হয়ে উঠতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের মতে তার কারণ আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্নতা। ঐক্যই ভাবকে ধারণ করে রাখতে পারে। আমাদের সমাজে সমস্ত মহৎ ভাব তার বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এইজন্য 'আমাদের দেশে শক্তির উদ্‌ভব হয়, কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান, তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।· · এইজন্য মহৎচেষ্টা বৃহৎচেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।'

এখানেই শিবাজীর রাষ্ট্রসাধনার দুর্বলতা। যে হিন্দুসমাজকে তিনি রাষ্ট্রসাধনায় প্রবর্তনা দিলেন তাকেই তিনি ওই সাধনার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হননি। এটাই হচ্ছে মারাঠাসাধনার ব্যর্থতার গোড়ার কথা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষভাবে চিন্তনীয়।—

শিবাজী সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দুসমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমনকি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড় বড় ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।· · শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগবিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা,—ইহাই অসাধ্যসাধন।

শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।· · সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। —শিখগুরু ও শিখজাতি, ভূমিকা

শিবাজী সমস্ত ভেদবিভাগ দূর করে বৃহৎ হিন্দুসমাজকে স্বরাজসাধনার যোগ্য করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হননি, ফলে তাঁর মহৎ সংকল্প ও অভিপ্রায় ওই সমাজের ছিদ্রপথেই নির্গত হয়ে যায়, মারাঠাশক্তির ব্যর্থতা সম্বন্ধে এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত অভিমত। ইদানীংকালে মহাত্মাজির স্বরাজসাধনা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা ছিল। তাই তাঁকে পুনঃপুনঃ সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিল।

শিবাজীর ব্যর্থতা ও মারাঠাশক্তির পতন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আচার্য যদুনাথের কাছেও পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। মারাঠা রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে জাতিভেদকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়েছেন। 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের পূর্বোক্ত ভূমিকাটি যদুনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করে *The Rise and Fall of the Sikh Power* নামে মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৯১১ এপ্রিল)। যদুনাথের ইংরেজি শিবাজী গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। তাতে দেখা যায় তিনি শিবাজীর ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে তাঁর উক্তি উদ্‌ধৃত করেন। এ প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন—

Why did Shivaji fail to create an enduring state ?· · An obvious cause was, no doubt, the shortness of his reign, barely ten years after the final rupture with the Mughals in 1670. But this does not furnish the true explanation of his failure. It is doubtful if with a very much longer time at his disposal he could have averted the ruin which befell the Maratha State under the Peshwas, for the same moral canker was at work among the people in the 17th century as in the 18th. The first danger of the new Hindu kingdom established by him in the Deccan lay in the fact that the national glory and prosperity resulting from the victories of Shivaji and Baji Rao I created a reaction in favour of Hindu orthodoxy ; it accentuated caste distinction which ran counter to the homogeneity and simplicity of the poor and politically depressed early Maratha society. Thus, his political success sapped the main foundation of that success.

In the security, power and wealth engendered by their independence, the Marathas of the 18th century forgot the past record of Muslim persecution ;· · the social grades turned against each other.· · We have unmistakable traces of it as early as the reign of Shivaji. Caste grows by fission. It is antagonistic to national union. In proportion as Shivaji's ideal of a Hindu *swaraj* was based on orthodoxy, it contained within itself the seed of its own death.

—*Shivaji, Chapter xvi*

বাংলা শিবাজী গ্রন্থে যদুনাথ এই কথাই অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তাও এস্থলে উদ্‌ধৃত করা অনুচিত হবে না।—

মারাঠারা যখন শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের জন্য খাড়া হয় তখন তাহারা বিজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন তাহারা গরিব ও পরিশ্রমী ছিল, সাদাসিদে ভাবে সংসার চালাইত, তখন তাহাদের সমাজে একতা ছিল, জাত বা শ্রেণীর বিশেষ পার্থক্য বা বিবাদ ছিল না। কিন্তু শিবাজীর অনুগ্রহে রাজত্ব পাইয়া, বিদেশ লুঠের অর্থে ধনবান্ হইয়া, তাহাদের মন হইতে সেই অত্যাচারস্মৃতি এবং তাহাদের সমাজ হইতে সেই সরলতা ও একতা দূর হইল; সাহসের সঙ্গে সঙ্গে অহংকার ও স্বার্থপরতা বাড়িল। ক্রমশঃ সমাজে জাতিভেদের বিবাদ উপস্থিত হইল।· · জাতের সঙ্গে জাত, এমন কি, একই জাতের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে অপর শাখা, বিবাদ করিতে লাগিল। সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, রাষ্ট্রীয় একতা লোপ পাইল, শিবাজীর অনুষ্ঠান ধূলিসাৎ হইল।· · জাতিভেদের বিষ এতই ভীষণ। —শিবাজী, চতুর্দশ অধ্যায়

মারাঠাশক্তির উত্থান ও পতনের ইতিহাসে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইদানীং মহাত্মাজির সাধনায় আমরা স্বরাজ লাভ করেছি। কিন্তু সে স্বরাজকে ধারণ করে রাখবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি না, যে-সব ছিদ্রপথে ওই দুঃখলব্ধ সম্পদ্ অন্তর্হিত হবার আশঙ্কা আছে সে-সব ছিদ্রকে রুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনোযোগ গিয়েছে কি না, ভেবে দেখা দরকার, এবং অবিলম্বে ওই ছিদ্র নিরসন করে স্বরাজকে ধারণ ও পোষণ করবার যোগ্যতা অর্জনের কাজে উদ্যম সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। তা করতে গেলে মারাঠা-ইতিহাসের কাছ থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

'শ্যামা-জাতক' ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা

'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত বহু কবিতা বৌদ্ধ জাতক ও কথা-সাহিত্যের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধ যুগ, উপনিষদ্ যুগ এবং শিখ ও মারাঠার জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উপর এক অদ্ভুত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার উপাদান ঐসকল অতীত যুগের বিস্মৃত কাহিনীসমূহ। বিশেষতঃ, বুদ্ধের দেশনা ও বৌদ্ধসাহিত্যের বিশ্বজনীনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যেন একটি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত ইহার মহিমা ও গভীরতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এবং রবীন্দ্র-প্রতিভা যখনই শ্রদ্ধা প্রীতি ও বিস্ময় ভরে কোনো বৌদ্ধ কাহিনীর কাব্যরূপ দান করিয়াছে, তখনই তাহা শব্দার্থগৌরবে এক সর্বতোভদ্র রমণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে বৌদ্ধকাহিনীর প্রতি তাঁহার কবিচিত্তের এই স্বাভাবিক ও অনন্যসাধারণ প্রবণতা নিজেই স্পষ্ট রূপে বিবৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য[১]—

অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্সিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এইসকল ইতিবৃত্ত জানবার

১ 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা': সাহিত্যের স্বরূপ

অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এসকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে।

উপনিষদ ও বৌদ্ধ যুগের ভারতীয় সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা তাঁহার বিভিন্ন রচনায় এমনি প্রকট যে বিদেশী সমালোচকের দৃষ্টিতেও ইহা ধরা না পড়িয়া পারে নাই। অধ্যাপক ই. জে. টম্‌সন্ এক স্থানে বলিতেছেন[২]—

From the *Upanishads* he learnt that life should be lived as closely to Nature as possible. Hence, his days have been cool with the breezes that make their way under boughs and through blossoms and his nights have been gentle with moonlight. ··These things have become the very warp and texture of his spirit. To them he has added the teaching of Buddha, for whom he has boundless reverence. Buddha's compassion for all living things, and the wonder of his renunciation, have cast a golden splendour about man's history ; and in Rabindranath's thought they have shone again, making his speech glow. He is almost more Buddhist than he is in sympathy with many forms of Hinduism that are most popular in his native Bengal.

বস্তুতই, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত যেন বর্তমান যুগের সংকীর্ণ সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশের মধ্যে আপনাকে প্রবাসী বলিয়া কল্পনা করিত ; সেইজন্যই তিনি ঔপনিষদ ও বৌদ্ধ যুগের ভারতবর্ষের দিকে বারংবার ব্যাকুল আগ্রহভরে তদ্‌গতপ্রাণ হইয়া ফিরিয়া তাকাইয়াছেন—ইংরেজি সমালোচনার ভাষায় ইহাকে romantic nostalgia বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এবং যখনই তিনি এই দুই যুগের আখ্যান বা বিষয়বস্তু লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখনই তিনি বর্ণনীয় বিষয় ও নায়কনায়িকার সহিত যেন সম্পূর্ণভাবে ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; তাঁহার কবিচিত্তে যেন এক অপূর্ব প্রশান্তি ও প্রসন্নতার স্পর্শ লাগিয়াছে। কবিমানসের এই 'সমাধি' বা সমাহিত অবস্থাই যথার্থ কাব্যসৃষ্টির নিদান—

কাব্যকর্মণি কবেঃ সমাধিঃ পরং ব্যাপ্রিয়তে।

কবি তাঁহার কাব্যের উপাদান অনেকাংশে প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসাদি হইতেই আহরণ করিয়া থাকেন, ইহা চিরন্তন সত্য বটে। কিন্তু একই উপাদান বিভিন্ন কবিপ্রতিভার স্পর্শে কিরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, এবং এই রূপান্তরসাধনের দ্বারা কবিপ্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি-ভাবেই বা ব্যঞ্জিত হইয়া থাকে, এই আলোচনার অবশ্যই একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কোনও একটি পুরাবৃত্তের অংশ-বিশেষের নির্বাচন বর্জন সংযোজন পরিবর্ধন ও সামগ্রিক বিন্যাসভঙ্গীর দ্বারা কবিপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট

২ *Rabindranath Tagore : His life and work*

রূপ ফুটিয়া উঠে। সুতরাং মূল ইতিবৃত্তের বা আখ্যানের পরিসংস্কৃত কাব্যরূপ কবিরই স্বকীয় সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতাটির সহিত উহার মূলীভূত কাহিনীটির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও কল্পনা কি বিশিষ্ট প্রকারে ইহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

২

'পরিশোধ' কবিতাটির মূল মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের অবদান গ্রন্থ 'মহাবস্তু'র অন্তর্গত 'শ্যামা-জাতক'। গ্রন্থখানি মিশ্রভাষায় রচিত—১৮৯০ খৃস্টাব্দে সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Emile Senart এমিল্ সেনার্ট কর্তৃক তিন খণ্ডে প্যারী নগরী হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। 'শ্যামা-জাতক'টি দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৬-১৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। নিম্নে সংক্ষেপে শ্যামা-জাতকের গল্পাংশ বর্ণিত হইল, রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' কবিতায় উহার কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কতটুকুই বা বর্জন করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে :

বজ্রসেন নামক এক শ্রেষ্ঠিপুত্র তক্ষশিলা হইতে বারাণসী অভিমুখে অশ্ববাণিজ্যার্থে যাত্রা করিয়াছিল—বারাণসীগামী অন্যান্য সার্থবাহও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সেই বণিক্‌সার্থ তস্করকর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, বণিক্‌গণ হত-বিহত হয়, অশ্বসমূহও হৃত হয়। বজ্রসেন মৃতপুরুষের কন্থায় নিজশরীর আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া থাকায় দস্যুগণের কবল হইতে রক্ষা পায়।—

সো দানি সার্থবাহো মৃতকেন পুরুষকুণপেন আত্মানং প্রতিচ্ছাদেত্বা শয়িতো এবং ন হতো।

ভ্রমণ করিতে করিতে বজ্রসেন একাকী বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে নগরীর এক 'শূন্যাগারে' আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই রাত্রিতেই রাজকুলে চৌরকর্তৃক বহুধন অপহৃত হয়। রাজার আজ্ঞায় প্রভাতকালে রক্ষিগণ তস্কর অন্বেষণে বাহির হইয়া শূন্যাগারে নিদ্রিত, শ্রান্ত-ক্লান্ত, রাত্রিজাগরক্লিষ্ট, 'অশ্ববাণিজক' বজ্রসেনকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকেই চোর মনে করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করে—

অয়ং চৌরো রাজকুলমোষকো।

চণ্ড, উগ্রশাসন রাজার আজ্ঞায় বজ্রসেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়—

তেন আণত্তং। গচ্ছথ নং অতিমুক্তকশ্মশানে নেত্বা জীবশূলকং করোথ।

বজ্রসেন যখন রাজপুরুষগণকর্তৃক গণিকাবীথির মধ্য দিয়া অতিমুক্তকশ্মশানে নীত হইতেছিল, তখন শ্যামানাম্নী অগ্রগণিকা দর্শনমাত্রই তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়ে—

স হ দর্শনমাত্রেণ গণিকায়ে তস্মিং সার্থবাহে প্রেম্নং নিপতিতং। যথোক্তং ভগবতা—

পূর্বং বাসনিবাসেন প্রত্যুৎপন্নে হিতেন বা।
এবং সংজায়তে প্রেম্নং উৎপলং বা যথোদকে॥
সংবাসেন নিবাসেন প্রেক্ষিতেন স্মিতেন বা।
এবং সংজায়তে প্রেম্নং মানুষাণং মৃগাণ চ॥
যত্র মনং প্রবিশতি চিত্তং বাপি প্রসীদতি।
সর্বত্র পণ্ডিতো গচ্ছে সংস্তবো বৈ পুরে ভবেৎ॥

শ্যামা ও বজ্রসেন যেন সহস্র জন্ম পরস্পর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিল, দর্শনমাত্রেই শ্যামার চিত্তে এমনই প্রেমের উদয় হইল—

সা দানি গণিকা তহিং অশ্ববাণিজকে জাতীসহস্রাণি প্রেম্নানুবদ্ধা। তস্যা তহিং অত্যর্থং প্রেম্নং উৎপন্নং।

শ্যামা ভাবিল—এই পুরুষকে যদি না লাভ করিতে পারি, তবে মরিব। চেটীকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইল, বলিল—তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিও।—

অন্যো পুরুষো আগমিষ্যতি এতদ্বর্ণো এতদ্রূপো চ তং গৃহ্য তং মারেথ।

রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইয়া বজ্রসেনকে লইয়া 'কৃতান্তস্থনিকা'র দিকে চলিল। শ্যামার গৃহে বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র দ্বাদশ বর্ষ বাস করিবার শর্তে প্রবেশ করিয়াছিল। দশ বর্ষ অতীত হইয়াছিল, বর্ষদ্বয় মাত্র অবশিষ্ট ছিল।—

তহিং দানি গণিকাকুলে শ্রেষ্ঠিস্য একপুত্রকো দ্বাদশবার্ষিকেন ক্রয়েণ প্রবিষ্টকো দশ বর্ষা অতিক্রান্তা দ্বে বর্ষা অবশিষ্টা।

শ্যামা ছলপূর্বক সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রকে ভোজনপাত্রসহ শ্মশানস্থিত বন্দী বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল—

সো দানি শ্রেষ্ঠিপুত্রে তং ভোজনমাদায় প্রস্থিতো।

কেননা,

স্ত্রীমায়া হি অনন্তিকা।

রক্ষিপুরুষগণ ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্ঠিপুত্রকে পাইয়া শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে বজ্রসেনকে মুক্ত করিয়া দিল, শ্রেষ্ঠিপুত্রকে হত্যা করিল।—

তেহি দানি বধ্যঘাতকেহি তং শ্রেষ্ঠিপুত্তং ঘাতেত্বা সো অশ্ববাণিজকো ওসৃষ্টঃ।

সূর্যাস্তের পর শ্যামার আদিষ্ট চেটী বজ্রসেনকে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গণিকাকুলে প্রবেশ করিল। শ্যামা বজ্রসেনকে লইয়া বিলাসলীলায় কালাতিপাত করিতে লাগিল। নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের মাতাপিতার নিকট হইতে অবশিষ্ট বর্ষদ্বয়ের প্রাপ্য উপকরণাদির দ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ সুখেই চলিতে লাগিল। বজ্রসেনের মনে কিন্তু শান্তি নাই, দিনের পর দিন তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল, ভোজনে তাহার কোনো প্রবৃত্তি রহিল না। তাহার মনে সর্বদাই চিন্তা—বোধ হয় পূর্বতন নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের মতো আমিও একদিন এই গণিকাকর্তৃক ঘাতিত হইব।—

অহং পি তথা এব হনিষ্যামি যথা সো পুরিমকো শ্রেষ্ঠিপুত্তো।

শ্যামা উৎকণ্ঠিত হইয়া বজ্রসেনকে জিজ্ঞাসা করিল: তোমার এই বৈকল্যের কারণ কি? তুমি যাহা অভিলাষ কর, তাহাই পাইবে। বজ্রসেন প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিল: তক্ষশিলাস্থিত সুবিস্তীর্ণ উদ্যান ও দীঘিকায় ক্রীড়ার কথা স্মরণ করিয়া আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।—

সা অস্মাকং নগরী তক্ষশিলা উদ্যানোপশোভিতা পুষ্করিণীহি চ অভীক্ষ্ণং জনো উদ্যানযাত্রাং নির্ধাবতি ক্রীড়ার্থং তানি চোদ্যানানি তাং চ উদ্যানক্রীড়াং দকক্রীড়ানি চ সমনুস্মরামি।

বজ্রসেনের এই বাক্য শুনিয়া শ্যামা নগরোপান্তে এক দীঘিকা-পরিশোভিত সিক্ত-সংমৃষ্ট উদ্যানভূমি নির্মাণ করাইল। বিহারযাত্রার প্রারম্ভে বজ্রসেন বলিল, যাহাতে আমরা অন্যের অগোচরে বিশ্বস্তভাবে জলক্রীড়া করিতে পারি, তজ্জন্য পুষ্করিণীর চতুর্দিক প্রতিসীরার (যবনিকা) দ্বারা বেষ্টন করা হউক—

তেন দানি বজ্রসেনেন শ্রেষ্ঠিপুত্রেণ সা গণিকা উক্তা। এতাং পুষ্করিণীং প্রতিসীরাহি প্রতিবেষ্টাপেহি বিশ্বস্তা দকক্রীড়াং ক্রীড়িষ্যামঃ ন কোচিৎ পশ্যতি।

শ্যামার আদেশে তাহাই হইল। উভয়ে 'অতৃতীয়' অবস্থায় জলক্রীড়ায় রত হইল। বজ্রসেন মনে মনে ভাবিল, আজ এই অবসরে যদি পলায়ন করিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে পলায়নের আর উপায় থাকিবে না। এই ভাবিয়া প্রণয়ের ভাণ করিয়া বজ্রসেন পানপাত্র হইতে শ্যামাকে প্রভূত মদ্য পান করাইল, শ্যামাও ক্রমশঃ পানমত্ত হইয়া উঠিল—

পানং অগ্রে স্থাপয়িত্বা তাং গণিকাং পায়েতি। সা দানি পিবন্তী মত্তা সংবৃত্তা।

বজ্রসেন শ্যামাকে লইয়া পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিল। তখন বজ্রসেন শ্যামাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া জলমধ্যে শ্যামাকে নিমজ্জিত করিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিতে লাগিল। শ্যামা ভাবিল, বোধ হয় আর্যপুত্রের জলক্রীড়ার ইহাই রীতি।—

সো দানি অশ্ববাণিজকো তাং শ্যামাং কণ্ঠে সমালিঙ্গং কৃত্বা নিবর্তেতি মুহূর্তং বারেত্বা উদ্গচ্ছতি। শ্যামা জানাতি আর্যপুত্র উদকক্রীড়াং করোতি।

বারংবার এইরূপ করায় শ্যামা পীড়িত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ শ্যামা স্বল্পপ্রাণ হইয়া পড়িল; বজ্রসেন শ্যামাকে মৃত মনে করিয়া তাহার দেহ পুষ্করিণীর সোপানে স্থাপন করতঃ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া বিহারভূমি হইতে অন্যের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল।—

সো দানি শ্যামাং মৃতামভিজ্ঞাত্ব পুষ্করিণীয়ে সোপানস্মিং স্থাপেত্বা ইতো ইতঃ প্রত্যবেক্ষিত্বা পলায়তে যথা ন কেনচিদ্ দৃষ্টো।

যবনিকার বাহিরে প্রতীক্ষমাণ চেটীগণ ক্রীড়ায় বিলম্ব দেখিয়া জলক্রীড়ার কোনও শব্দ না শুনিতে পাইয়া সন্দেহপরবশ হইয়া পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিল ও শ্যামাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় একাকী শায়িত দেখিল। অনন্তর বহুযত্নে শ্যামার দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া চেটীগণ তাহাকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল।

বজ্রসেন পলায়ন করিয়াছে জানিয়া শ্যামার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইল—এক্ষণে যদি পূর্বতন নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কোনো কারণে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তবে কি উপায়? কিন্তু শ্যামার ছলের অভাব নাই। আবার সে চণ্ডালগণকে ডাকিল। বলিল, তোমাদের বহু পুরস্কার দিব। কোনো সদ্যোমৃত 'অনাদষ্ট' পুরুষের দেহ আমাকে আনিয়া দাও।—

ইচ্ছামি প্রত্যগ্রমৃতকং পুরুষং অনাদষ্টং আনীয়ন্তং।

শ্যামার আদেশে চণ্ডালগণ তাহাই করিল। তখন সেই পুরুষদেহ গন্ধোদকের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া একটি শবাধারের (চমু) মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং চেটীগণকে বলিল, তোমরা সমস্বরে এই বলিয়া কাঁদিতে থাক—হায়! হায়! আর্যপুত্র কালগত হইলেন—

সর্ব এককণ্ঠা রোদনং করোথ এবং চ বদথ আর্যপুত্রো কালগতো আর্যপুত্রো কালগতো তি।

সেই রোদন শুনিয়া নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের পিতামাতা শ্যামার আলয়ে পুত্রের শেষদর্শন পাইবার আশায় গমন করিল। শ্যামাকে শবাধার উন্মুক্ত করিতে বলিল। শ্যামা ভাবিল, বিপদ উপস্থিত। তখন সে চেটীগণকে বলিল—শবদেহটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল, যাহাতে কেহ না চিনিতে পারে। শ্রেষ্ঠীর নিকট আসিয়া বলিল—আর্যপুত্রের ইহাই শেষ অভিলাষ ছিল যে, তাঁহার আত্মীয়বর্গ যেন মরণের পরেও তাঁহার মুখ দর্শন করিতে না পারেন। আমি বরং নিজের প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিব, কিন্তু আর্য্যপুত্রের শেষ অভিলাষ অবমানিত হইতে দিব না।—

মা মে মৃতস্স মাতাপিতূণাং ঞাতীনাং বা দর্শয়িষ্যামি এত্তকং মে প্রিয়ং করোহি।—ময়া চ আর্যপুত্রস্য প্রতিজ্ঞাতং ন আর্যপুত্রং মৃতকং কস্যচিৎ মাতাপিতৃণাং বা জ্ঞাতীনাং বা উপদর্শয়িষ্যামি। কামং আত্মানমুপসংক্রমেয়ং ন পুনরার্যপুত্রস্য শরীর-সন্দর্শনং করেয়ং।

শোকাকুল পিতামাতা অন্তিমসংকারের জন্য শবদেহটি লইয়া শ্মশানে গেল—শ্যামা অতি করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল, প্রজ্বলিত চিতার উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিতে গেল, যেন আর্যপুত্রের শোকে নিতান্তই বিমূঢ়। পুত্রশোকাকুল পিতামাতা ভাবিল, শ্যামাকে দেখিয়াই আমরা পুত্রদর্শনের তৃপ্তি লাভ করিব। রাজার অনুমতি অনুসারে শ্যামা গৃহস্থবধূরূপে শ্রেষ্ঠিগৃহে প্রবেশলাভ করিল। মুক্তাভরণা, একবেণীধরা, শুক্লবসনা শ্যামা শ্রেষ্ঠিগৃহে থাকিয়া আকুল হৃদয়ে অশ্ববাণিজক বজ্রসেনের কথাই সর্বদা চিন্তা করে, শ্রেষ্ঠী ও তৎপত্নী ভাবে—শ্যামা আমাদেরই পরলোকগত পুত্রের জন্য শোক করিতেছে।—

সা দানি ওমুক্তমণিসুবর্ণা ওদাতবস্ত্রাম্বরধরা একবেণীধরা বজ্রসেনবাণিজকং শোচন্তী আসতি। —'অস্মাকমেষা পুত্রস্য শোচতি।'

অনন্তর কিছুকাল পরে, তক্ষশিলা হইতে একদল নট বারাণসীতে আসিল। একদিন তাহারা শ্রেষ্ঠিগৃহে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কি তক্ষশিলাস্থিত অশ্ববাণিজক শ্রেষ্ঠিপুত্র বজ্রসেনকে জান? তাহারা বলিল—হাঁ, জানি।—

আম প্রত্যভিজানাম।

তখন শ্যামা বলিল—তক্ষশিলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এই গাথাটি বজ্রসেনের নিকট পাঠ করিয়ো—

যাস্তং সালেহি ফুল্লেহি শ্যামাং কৌশেয়বাসিনীং।
গাঢ়ং অংকেন পীড়েসি সা তে কোশল্যং পৃচ্ছতি॥

তক্ষশিলাপ্রত্যাগত নটগণের নিকট বজ্রসেন শ্যামার বার্তা শুনিল, বিস্মিত হইল—শ্যামা তো মরিয়াছে, সে কিরূপে আমার কুশল প্রশ্ন করিবে? নটদিগকে বলিল—

তং বো ন শ্রদ্দধাম্যহং বাতো বা গিরিমাবহে।
কথং সা মৃতিকা নারী মম কৌশল্যকং ভণে।

নটদারকগণ বলিল—শ্যামা মরে নাই, একবেণীধরা হইয়া শুধু তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে।—

নাপি সা ম্রিয়তে নারী নাপ্যন্যমভিকাঙ্ক্ষতি।
একবেণীধরা বালা ত্বামেব অভিকাঙ্ক্ষতি।

বজ্রসেন তখন শঙ্কান্বিত হইল, ভীত হইল। ভাবিল, হয়তো পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের ন্যায় আমারও দশা হইবে। অতএব দূরতর দেশে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ—

অসংস্তুতং মে চিরসংস্তুতেন ন নির্মিণেয়া ধ্রুবমধ্রুবেণ।
ইতোপ্যহং দূরতরং গমিষ্যং মমাপি সা অঙ্গং ন নির্মিণেয়।

ইহাই 'শ্যামা-জাতকে'র গল্পাংশ।

৩

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিশোধ কবিতায় শ্যামা-জাতকের অনেক অংশ বর্জন করিয়াছেন। দর্শনমাত্রই বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার চিত্তে প্রণয়সঞ্চার, সেই প্রণয়কে চরিতার্থ করিবার জন্য অপর এক প্রণয়ীর প্রাণসংহার, এবং শ্যামার কবল হইতে বজ্রসেনের আত্ম-পরিত্রাণ—রবীন্দ্রনাথ

'পরিশোধ' কবিতায় মূল হইতে এই কয়টি অংশই মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে প্রথমদর্শনেই প্রণয়সঞ্চার, ইহা যে গণিকাসুলভ চটুলতাপ্রসূত নহে, ইহা যে কেবলমাত্র রূপতৃষ্ণাসঞ্জাত 'চক্ষুরাগ' নহে, ইহা যে জন্মজন্মান্তরের বাসনাসঞ্জাত, রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতায় ইহা যেরূপ দ্বিধাহীন নিঃসংশয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, মূল জাতকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে জাতকের ইঙ্গিতকেই যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট রূপদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।—

সা দানি গণিকা তহিং অশ্ববাণিজকে জাতীসহস্রাণি প্রেমানুবদ্ধা

পরিশোধ কবিতারও ইহাই মূল সুর।

হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

এবং শ্যামার চিত্তের এই প্রণয় আপাতপ্রণয় নহে বলিয়াই তাহার সমস্ত কলুষ যেন ইহার দ্বারা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। 'L'amour purifie tout—Love purifies all', পরিশোধ কবিতায় এই বাণীই যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জাতকের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই যেন একটা হীনতা ও কপটতা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। জাতকে আপনার প্রণয়প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য শ্যামা ছলপূর্বক— স্ত্রীমায়া হি অনন্তিকা— ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্টিপুত্রকে বধ্যভূমিতে পাঠাইয়াছে। কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় উত্তীয়ের আত্মত্যাগের মধ্যেও পৌরুষমণ্ডিত প্রেমেরই বিজয় ঘোষিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে শ্যামার কপট মায়ার কোনো চিহ্ন নাই।—

. . বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি, এ মোর গৌরব।

জাতকের বজ্রসেনের চরিত্রের মধ্যেও একটা ভীরুতা আছে, সে যে শ্যামার কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে, সে শুধু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, পূর্বতন শ্রেষ্টিপুত্রের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে নিজের সম্বন্ধেও তাহাই আশঙ্কা করিয়া সে আত্মত্রাণের জন্য হেয় কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, জলক্রীড়ার ছলে শ্যামাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পলায়ন অনেকটা পঞ্চতন্ত্রের গঙ্গদত্ত মণ্ডূকের ন্যায়—

আখ্যাহি ভদ্রে প্রিয়দর্শনস্য ন গঙ্গদত্তঃ পুনরেতি কূপম্।

উহার মধ্যে কোনো পৌরুষ নাই, বীর্য নাই, শ্যামার চরিত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা উহার মূল নহে। কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় বজ্রসেন যে শ্যামার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য তৎপর হইয়াছে, তাহার কারণ শ্যামার চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন, যাহাকে সে চন্দনলতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল তাহা যে প্রকৃতপক্ষে

বিষবল্লী ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই আকস্মিক উপলব্ধি, ভীরু পলায়নপ্রবৃত্তির সহিত ইহার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই। তাই শ্যামার প্রতি বজ্রসেনের নৃশংসতার মধ্যেও একটা উদাত্ত পৌরুষ বিরাজমান। সর্বপ্রকার নীচতার বিরুদ্ধে আন্তরিক গ্লানি ও পুরুষোচিত বীর্য বজ্রসেনের চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'পরিশোধ' কবিতার অবসানে শ্যামা ও বজ্রসেনের বিচ্ছেদদৃশ্য তাই এক অপূর্ব বেদনায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—

· · মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, "যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও।"
নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে ; পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল ; তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন।

শ্যামা-জাতকের অবসানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে বলিতেছেন—

অহং স ভিক্খবঃ তেন কালেন তেন সময়েন বজ্রসেনো নাম অশ্ববাণিজকো অভূষি। · · এষা সা ভিক্খবঃ যশোধরা তেন কালেন তেন সময়েন বারাণস্যাং নগরে শ্যামা নাম অগ্রগণিকা অভূষি।

'হে ভিক্ষুগণ! আমিই সেই সময়ে বজ্রসেন নামক অশ্ববাণিজক হইয়া জন্মিয়াছিলাম। · ·এবং এই যশোধরাই শ্যামা নাম্নী অগ্রগণিকারূপে বারাণসী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

জাতকের এই ইঙ্গিতকে অনুসরণ করিয়াই কি রবীন্দ্রনাথ ভাবী বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার সহধর্মিণী যশোধরার মহিমময় চরিত্রের সহিত সংগতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের পূর্বজন্মের প্রণয়েতিহাসকে সকল প্রকার হীনতা ভীরুতা ও কপটতা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই জাতকের গল্পাংশের পরিসংস্কার সাধন করিয়াছেন, অথবা চারিত্রিক উদাত্ততার প্রতি কবিচিত্তের স্বাভাবিক পক্ষপাতই ইহার কারণ? কে নির্ণয় করিবে?

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

আশ্রমপ্রসঙ্গ

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের প্রতি

আজকে তোমাদের ডেকেছি কোনো কিছু নতুন করবার বা বলবার জন্যে নয়। আগে আমাদের এখানে যে অধ্যাপকদের মিলনসমিতি ছিল তারই স্মৃতি মনে আনবার জন্যে। আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদের সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল, তারই পুনরুদ্ধার করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এখন কর্মবিভাগ উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ঘটার দরুন ভুল বোঝা বা না বোঝার সম্ভাবনা এসেছে— এ আমি অনুভব করি। আশ্রমে পরস্পরের মিলনের যে একটা দাবী আছে সেটাই হওয়া উচিত আমাদের চরম লক্ষ্য। কর্ম হল উপলক্ষ্যমাত্র; আমাদের বন্ধনটা কর্মের, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনটাই আমাদের আশ্রমের প্রধান সাধনা।

আজকাল শারীরিক দৌর্বল্যের জন্যে আমি আশ্রমের কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি; আগেকার মতো তেমনভাবে অধ্যাপকসমিতি বা ছাত্রসমিতিতে যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। কোনো একটা বিশেষ দিনে অধ্যাপকরা সমবেত হয়ে পরস্পর খোলাখুলিভাবে বলবার কইবার সুযোগ যাতে পান, সেটা আমার ইচ্ছা। আমিও এইরকম নিয়মিত মিলনসভা হলে তাতে যোগ দিতে পারব। তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনে জানতে পারব এখন কী নিয়মে কাজ হচ্ছে। যদি কারও মনে কোনো গ্লানি থাকে, তবে সেটা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ থাকবে। অপ্রিয় হলেও যা অকৃত্রিম সত্য— তাকে স্বীকার করার মতো ধৈর্য ও ঔদার্য যেন আমাদের থাকে। যে সব জায়গায় স্বার্থ বা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, সেখানে হয়তো এটা সহজ নয়। কিন্তু এই আশ্রমে এটা প্রত্যাশা করবারই বিষয়। কেবল কর্তাদের মন জুগিয়ে যে মিলন আমি সেইরকম মিলনের কথা বলছি না। কিছু মতবিরোধ থাকলেও সকলকে ঔদার্যের সঙ্গে স্বীকার করব, গ্রহণ করব, এই হবে আমাদের সাধনা। চক্ষুলজ্জা বা মিথ্যা মিষ্টতার চর্চা করা যেন আমাদের না হয়। যদি অধ্যাপকসভা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্যে যে, কোনো অসামঞ্জস্য ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারি।

আমাদের মধ্যে সহজ সহযোগিতার যে একটা প্রয়োজন ঘটেছে সেটা হয়তো কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্মের চারদিকে বেড়া তুলেছি, তার প্রয়োজন আছে। বেড়া থাক্, কিন্তু বেড়ার মধ্যে প্রবেশপথের ফাঁক না থাকাটাই দোষের।' প্রথম যখন আমি এখানে কাজ আরম্ভ করেছি তখন কোনো হেড্‌মাস্টার রাখিনি। প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক শ্রেণীতে যাঁরা ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। তাঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বলেছিলুম যে তাঁরা যেন তাঁদের নিজেদের শ্রেণী তৈরি করে নেন। উপর থেকে প্রয়োগ করা বাঁধানিয়মের রাস্তায় আমি কাউকে চলতে বলিনি। খুব স্বাধীনতা দিয়েছিলুম, এ কথা মানতেই হবে। পরে অবশ্য স্থান কাল অনুসারে ও কর্মের প্রয়োজন বিচার করে এই স্বাধীনতার ছাঁটকাট করতে হয়েছিল। তখন অনেকে এই স্বাধীনতার দোহাই দিয়েই তাঁদের স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করেছিলেন। আমার দোহাই দিয়ে ঢিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল ডেমোক্রেসির নামে।' যদি বলি সব প্যাসেঞ্জার মিলে ইঞ্জিন চালাবে তবে সবার পক্ষেই মরণং ধ্রুবম্। কর্মের একটা বিধি আছে, সেখানে উপযুক্ত ব্যক্তির প'রে যথেষ্ট কর্তৃত্ব বা বিশেষ দায়িত্ব যদি না দেওয়া হয়

তবে কী রকম গোলযোগ ঘটে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। একদা পাঠভবনের কাজে সেই শৈথিল্য দেখে আমার মনে হয়েছিল যে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে তামসিকতা খানিকটা আমাদের জাতিগত। নিজেদের দায়িত্ব উপরের চাপ না থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেরা নিতে পারে তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া সাজে। আমরা পরের শাসনে বাঁধা কাজ চালাতে পারি কিন্তু নিজের প্রবর্তনায় পারিনে। এই কারণেই আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল, যেমনটি হয়েছিল ইটালিতে। সেখানেও সময়মতো ইঞ্জিন চলত না। আমাদের এখানেও ইঞ্জিনে গলদ ঘটত। আমি চাইনে তেমনটা ঘটে। তাই এখানে চারদিকে পরস্পর-সম্বন্ধের অবাধ উদারতার মাঝখানে কর্মচালনার কর্তৃত্বপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে। অন্য দেশে দেখেছি যারা যথার্থ স্বাধীনতা ভালোবাসে তারাই কর্তৃত্বকে সম্মান করতে জানে। অপর পক্ষে, যাঁরা দৃঢ়ভাবে নিয়ম চালাবেন, নিজে তাঁরা দৃঢ়ভাবে নিয়ম মানবেন। তা ছাড়া তাঁদের কঠোরতা কেবল কর্মযন্ত্রের মধ্যেই যেন বদ্ধ হয়, যন্ত্রের বাইরে তাঁদের সৌহৃদ্যের কোথাও যেন কোনো বাধা না থাকে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মসৌষ্ঠবের অনুরোধে আপন আপন দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। অন্য অনেক জায়গায় এক পক্ষ অপর পক্ষকে শাসনের জোরে কাজ করিয়ে নেয়। সেরকম প্রাণহীন কর্তব্যপালন আশ্রমের স্বভাববিরুদ্ধ। কর্মে কর্মকর্তার স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে কিন্তু ব্যবহারে সকলের সঙ্গেই যোগ থাকা চাই। নিজের কর্মকেই সকলেরই কর্ম করে তুলতে হবে হৃদ্যতার দ্বারা।

এই সহৃদয় সহযোগিতার উপযুক্ত মনোভাবকে পুষ্ট করবার জন্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দরকার। সেই উদ্দেশ্যসাধনই অধ্যাপকসভার লক্ষ্য। সেখানে যেন জানতে পারি আমাদের কাজ কী ভাবে হচ্ছে, কী পরিবর্তন হল, কী বাধা রয়েছে, সেদিন যদি কারও নালিশ থাকে তবে সেটাও তারা অসংকোচে জানাতে পারবেন।

আমি সেজন্যে ঠিক করেছি যে তোমাদের যা বলবার তা আমার সমক্ষে বলবে, সাহস ক'রে। পৌরুষের অভাবে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারি না; ঝগড়াটে ভাবে বলতে হয়, পরুষ হয়ে পড়ে কথা — কারণ হয়তো সেকথার মধ্যে সত্যের অভাব। সহজে, নির্ভীকভাবে, রূঢ়তা না মিশিয়ে সত্য বলার সাধনা খুব বড়ো সাধনা। এখানে তা যদি সম্ভব হয় তবে গর্ব অনুভব করব। এখানে আমরা অনেকে মিলে থাকব, অথচ আমাদের সঙ্গটা অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে— এই হওয়াই তো উচিত। পৌরুষের অভাবে আমাদের এই মেরুদণ্ডহীন দেশে আড়ালে লুকিয়ে কত যে গোলমাল, কত চক্রান্ত, কত বিদ্বেষ— এ যেন আমাদের জাতিগত। আমাদের এটা ছোটো জায়গা, অল্প কয়জনা লোক, আমাদের লক্ষ্যও অনেক-গুলো নয়, এখানে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মিলন— তার সম্ভাবনা হবে না কেন, আমি বুঝতে পারিনে। দেশে বাইরের বড়ো বড়ো কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাদলি মারামারি হচ্ছে। যদি আমাদের এ আশ্রম তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হয় তবে সেটা তো বাঞ্ছনীয় হবে না। অথচ পরের মন জুগিয়ে সত্যগোপন করার মতো প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। কারণ চিত্তের দুর্বলতা থাকলে সত্যকার মিলন হবে না—হতে পারে না।

১৭ শ্রাবণ ১৩৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

বক্তৃতার অনুলিপি। বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত

গ্রন্থপরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। অনাথগোপাল স্মৃতি-সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন প্রকাশিত। মূল্য সাত সিকা।

শিক্ষাপ্রকল্প। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। বিশ্বভারতী। মূল্য আট আনা।

বাংলার জনশিক্ষা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী। মূল্য আট আনা।

সমাজশিক্ষার ভূমিকা। শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙলা ভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনার সন্ধান পাইলে খুশী হইতে হয়; কারণ একে তো শিক্ষাশাস্ত্রসম্বন্ধীয় রচনা সচরাচর সুলভ নয়, তাহার উপর এ বিষয়ে মৌলিক চিন্তা বিশেষ দুর্লভ। আমরা যখন শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে বলি তখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা পরের মুখের ঝাল খাইয়া বলি। এতএব ইহারই মধ্যে যখন কোথাও শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন কথা শোনা যায় তখন সর্বাংশে সে কথাগুলি গ্রহণ করিতে না পারিলেও মন দিয়া কথাগুলি শুনিতে ইচ্ছা হয়, শুনিতে ভালো লাগে, বিশেষ করিয়া যখন শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মত বক্তা পাওয়া যায়।

আমাদের সৌভাগ্য যে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন এবং শুধু তাহাই নহে আজও আমরা তাঁহার মুখের কথা তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত বাণী শুনিতে পাইতেছি। বোধ করি বাঙলাদেশের ও ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদগণের মধ্যে তিনিই প্রবীণতম। বয়স তাঁহার বলিষ্ঠ মননশীলতা ও প্রতিভা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে বলিবার অধিকার তাঁহার চেয়ে আর কাহার আছে? আশা করি বিদ্যানুরাগী বাঙালী পাঠকমাত্রেই শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার গ্রন্থদুইটি পাঠ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা অনেকদিন হইতেই শোনা যাইতেছে। শুনিতেছি নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে একটা কিছু সংস্কার ঘটিবে। যাঁহারা এ বিষয়ে কর্মকর্তা তাঁহাদের চোখে এই বইটি পড়িবে কিনা জানি না। না পড়িলে সেটা তাঁহাদেরই দুর্ভাগ্য বলিব।

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার'-গ্রন্থে লেখক বর্তমান ত্রুটিগুলি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলি দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে উপায়গুলির কথা বলিয়াছেন সেগুলির সবগুলি আজ গ্রহণযোগ্য না হইলেও বিচার ও আলোচনার যোগ্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একটা কথা অত্যন্ত সত্য, পাশ্চাত্ত্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বহুলপরিমাণে বিদেশীই রহিয়া গিয়াছে; তাহার সহিত আমাদের সমাজজীবনের নাড়ির যোগ ঘটিয়া ওঠে নাই; তাই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ব্যর্থতা আমাদের এত পীড়িত করে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সেই মূল গলদটি ধরিয়া কিভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশীরূপে রূপায়িত করিতে পারা যায় তাহার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনিবে? স্বাধীনতা পাইলেও কি হয়, আমাদের মন যে এখনও বিদেশী রহিয়া গিয়াছে।

'শিক্ষাপ্রকল্প'-গ্রন্থটি বহু বৎসর পূর্বে লিখিত দুইটি প্রবন্ধের সমষ্টি। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এই নূতন নামে প্রবন্ধ দুইটি পুনর্মুদ্রিত করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটিতে শিক্ষাসংস্কারের মূল

সূত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী দুইই অসাধারণ। আরও আশ্চর্যের কথা, ত্রিশ বৎসর পূর্বে কথিত এই কথাগুলি আজও পুরানো হইয়া যায় নাই। বোধ করি সকলের চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রবন্ধগুলির কথা বাঙলাদেশ ভুলিয়া গিয়াছে বা অবজ্ঞা করিয়াছে। শিক্ষাতত্ত্বের এরূপ মৌলিক আলোচনা খুব কমই দেখা যায়—(এখানে মৌলিক ইংরেজি fundamental শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিয়াছি)। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে এই আলোচনা অপূর্ব। ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় হইলে এ গ্রন্থ বিখ্যাত হইত; ইহার জন্য লেখক দেশবিদেশে যশ ও খ্যাতি লাভ করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বহু লোককে সম্মানসূচক উপাধিদ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, কিন্তু যোগেশচন্দ্রের মত যাঁহারা সত্যই সম্মানযোগ্য তাঁহাদের সম্মান করেন নাই। ইহার চেয়ে গভীর পরিতাপের বিষয় কী হইতে পারে?

আমাদের দেশে শিক্ষার ইতিহাসের দিকে কেহ বড়-একটা দৃষ্টি দেন না; কারণ একে তো এরূপ ইতিহাসের একান্ত অভাব; তাহার উপর যে দু-একটা ইতিহাস পাওয়াও যায় তাহা সাধারণতঃ সুখপাঠ্য হয় না, তাহাকে অনেক সময়ে তথ্যের আড়ালে আসল ইতিহাসের ক্রমবিকাশের খেই হারাইয়া ফেলিতে হয়। অথচ শিক্ষার ইতিহাস হইতেছে সংস্কৃতির ইতিহাস: তাহার পাতায় পাতায় জাতির মনোবিকাশের বিচিত্র কাহিনী বিবৃত আছে। ইহার উদাহরণ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা বাঙলার জনশিক্ষা পুস্তিকাটিতেই রহিয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশের, সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাঙাগড়ার যুগ-সন্ধিক্ষণ। তখন একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণস্রোতে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে নবীন সংস্কৃতি শিক্ষাকে বাহন করিয়া সবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই দুই ধারার মধ্যে বোঝাপড়া তখন মাত্র শুরু হইয়াছে। বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই যুগসন্ধিকালের ইতিহাস লিখিয়া লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই যুগে পাঠশালাগুলিই ছিল শিক্ষার প্রাচীন বাহক। কিভাবে সেই পাঠশালাগুলি রূপান্তরিত হইয়া নূতন কলেবর ধারণ করিল লেখক আমাদের সেই ইতিহাস শোনাইয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দী হইতে শুরু হইয়াছে। তাহার অব্যবহিত পূর্বে যে অল্প-কিছু নূতন ধরনের বিদ্যালয় ছিল, যেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি প্রথম ইংরেজি পাঠ লইতেন, লেখক তাহাদের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন; তাহাদের একটা বর্ণনা পাইলে মনোজ্ঞ হইত। সেগুলি সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। লেখক হয়তো কিছু নূতন কথা শুনাইতে পারিতেন। তিনি বহু শ্রমে বহু অনুসন্ধান করিয়া বহু গ্রন্থ ও রিপোর্ট হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিষ্ঠা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবে। তিনি যে ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে Fisherএর Memoirএর উল্লেখ দেখিলাম না। তাহাতে অনেক সংবাদ আছে। এই বইটি সম্প্রতি বোম্বাই হইতে নূতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি দেশের দৃষ্টি গিয়াছে দেশের নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার দিকে। ইহাদের নিরক্ষর বলা চলে, কিন্তু অশিক্ষিত বলা চলে কিনা সন্দেহ। এককালে এদেশে যাত্রা কথকতা কীর্তন পাঁচালি প্রভৃতির সাহায্যে জনসাধারণের শিক্ষার প্রচুর বাবস্থা ছিল। কিন্তু সেসব দিন গিয়াছে, সেসকল ব্যবস্থাও মৃতপ্রায়। এখন নূতন যুগের তাগিদে নূতন করিয়া নূতনভাবে দেশের নিরক্ষর বয়স্কদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলার প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ জনশিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন। তাহারই পটভূমিকায় এই পুস্তকটি লিখিত হইয়াছে।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ-শিক্ষাধিকরণের বয়স্কশিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও বয়স্কশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত। বর্তমান গ্রন্থে লেখক বয়স্কশিক্ষার প্রতিশব্দরূপে ভারত সরকারের অনুমোদিত 'সমাজশিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

সমাজ বা বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙলায় কোনো ভালো বই নাই। সুতরাং বইটি এই অভাব কিছুটা দূর করিবে; সুতরাং ইহার জন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন। বইটিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। বয়স্কশিক্ষাকর্মীর পক্ষে সেগুলি মূল্যবান হইবে।

বইটি মুখ্যত নানা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সমষ্টি। একটানা লেখা না হওয়াতে ইহাতে গ্রন্থহিসাবে কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইয়াছে, তাহা কতকটা অপরিহার্য। কিন্তু সম্পাদনাগুণে এই ত্রুটি বহুলপরিমাণে দূর করা যায়। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহার ব্যবস্থা হইবে। লেখকের সামান্য দুই-একটা ভুল চোখে পড়িল; সেগুলি এমন কিছু মারাত্মক নয়। তবুও সেগুলি ভবিষ্যতে দূর হইলেই ভালো হইবে। ২১ পৃষ্ঠায় লেখক অ্যাডামের যে রিপোর্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উনবিংশ শতকে প্রকাশিত, অষ্টাদশ শতকে নয়; আর, ১০৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মেকলের মতবাদ infiltration নয়, filtration theory। বইটিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত লোকশিক্ষাপরিষদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা। শ্রীশান্তা দেবী। প্রাপ্তিস্থান লেখিকার নিকট, পি-২৬ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী। মূল্য আড়াই টাকা।

চিত্র-চরিত্র। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য ছয় টাকা আট আনা।

শ্রীঅরবিন্দ। নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য এক টাকা।

জীবনকথার সঙ্গে ছবির তুলনা সহজেই মনে আসে। জীবনকথার মত ছবিও মানুষের প্রতিকৃতি ফোটাতে চায়। কিন্তু সব ছবির ভঙ্গী এক নয়। এমন-এক যুগ ছিল যে সময় চিত্রকর শুধু যথাযথ অনুকৃতিতেই খুশী থাকতেন। হয়তো বা একটু-আধটু অত্যুক্তিও করতেন—গণ্ডের লালিমা বা বর্ণের ঔজ্জ্বল্য একটু-আধটু বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সেসব অত্যুক্তি বাদ দিলেও চিত্রলিপির প্রধান কাজ ছিল যথাযথ অনুকৃতি। কিন্তু ক্রমে এমন সময় এল যে সময় দেখা গেল যে এইরকম বাহ্যিক অনুকৃতিতে চিত্রকরের মন উঠছে না। তখন শুরু হল একদিকে আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা, অন্যদিকে প্রচেষ্টা চলতে লাগল ফটোগ্রাফিক অনুকৃতির বদলে মানুষটার গভীরতর সত্তাকে ফুটিয়ে তুলবার, তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করবার। আলোছায়ার লীলার উগ্র ব্যবহার, অসমান রঙের সমাবেশ, ইচ্ছা করে দিক্‌বিশেষের বিবর্ধন ইত্যাদি সমস্তই সেই প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত। এমনকি এই চেষ্টার আতিশয্যের ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আঙ্গিকসর্বস্বতার সঙ্গে আর্টের সমীকরণের প্রচেষ্টাও হয়েছে, যা অবক্ষয়ী সমাজের অসুস্থ মনোভাবের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এইসব অসুস্থ অত্যুক্তির কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, সুস্থতার চতুঃসীমার মধ্যেও হাওয়া-বদল যথেষ্ট ঘটেছে। যেমন সাহিত্যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের তর্ক। বাচ্যার্থের সাহায্যে কাব্যরচনা হয় না

তা নয়—রামায়ণের মত অত্যুজ্জ্বল মহাকাব্য প্রধানতঃ বাচ্যার্থ-নির্ভর—তবুও ব্যঙ্গার্থের উপর ক্রমাগতই জোর পড়েছে। তেমনি, প্রতিকৃতি বলতে কি বুঝি? সাধারণ মর্মরমূর্তি, যা জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি, অথবা রোদ্যাঁ-এপস্টাইন-গিলের ভাস্কর্যলীলা? জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পেন্‌সিল স্কেচ না শ্রীযুত অতুল বসুর আঁকা প্রতিকৃতি? যামিনীপ্রকাশের আঁকা পোর্ট্রেট, না যামিনী রায়ের আঁকা প্রতিচ্ছবি? প্রতিকৃতি সবই, কিন্তু সবগুলির মেজাজ এক নয়। পার্থক্য সুস্পষ্ট।

জীবনচরিতের বেলাতেও সেই কথা। জীবনী বলতে কি বুঝি? প্রত্যেক লোককেই জীবনধারণের জন্য কতকগুলি কর্তব্য পালন করতেই হয়, সেই জৈবধর্মের দায় থেকে কারও অব্যাহতি নেই। তাছাড়া প্রত্যেকের জীবনেই ছোট-বড় নানারকম ঘটনা ভীড় করে আসে। জীবনকথার বিষয়বস্তু কি হবে? শুধু এইসব ঘটনাবলীর তালিকা? শুধুই chronicle? এরকম জীবনকথা নেই তা নয়, কিন্তু এ জীবনকথায় ঘটনার পিছনের মানুষটার সত্য পরিচয় খুব কমই মেলে। পক্ষান্তরে এমন জীবনকথাও দেখা যায় যেখানে দুটি চারটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র আছে এবং সেই ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য করেই জীবনীকার তাঁর ভাষ্য রচনা করে চলেছেন। সেখানে ঘটনার তালিকার চেয়ে ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁকই বেশি, chronicleএর বদলে তা প্রধানতঃ interpretation. খুব পাকা জীবনীকার না হলে এরকম ব্যাখ্যার বিপদ অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় এই যে তার মধ্যে জীবনীকারের ব্যক্তিত্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ বেশি প'ড়ে জীবনকথার বিকৃতি ও অযথার্থ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নেপোলিয়নের মৃত্যুসংবাদে শেলী একটি কবিতা লিখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—আবার মহাভারতীয় পরিধিতে নেপোলিয়নের জীবনী লিখে অ্যাবট শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিতে নেপোলিয়নের মহত্ত্ব ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। এইরকম বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি ঘটে যদি জীবনকথার বিষয়বস্তু খুব অসাধারণ মানুষ হন। কারণ তাঁদের নিয়ে একদলের অচিন্তিত শ্রদ্ধা এবং আর একদলের অবিরাম নিন্দার সংঘাত প্রায়শঃই ঘটতে দেখা যায় এবং কালের গতির সঙ্গেসঙ্গে অনেক সময় তাঁদের মূল্যও যায় বদলে। এই কারণেই এরকম লোকের জীবনচরিত লেখা—বিশেষতঃ ব্যাখ্যামূলক জীবনচরিত লেখা—সহজ নয়।

আলোচ্য জীবনকথাগুলির মধ্যে উপরি-লিখিত মেজাজের বিভিন্নতার আভাস আছে। সবগুলি এক ভঙ্গীতে লেখা নয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলা তথা ভারতের এক যুগসন্ধির সময় জন্মেছিলেন। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম। সে সময় বাংলার স্বর্ণযুগ। বাংলার মনীষা তখন দিকে দিকে বিকশিত হচ্ছে। সে সময় থেকে বাংলার তথা ভারতের জীবনধারা ও মননধারার সুদীর্ঘ স্রোত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রান্তে এসে যেখানে পৌঁছল রামানন্দ শুধু যে সেই ধারায় অবগাহন করেছেন তাই নয়, যেসব মহাপুরুষের চেষ্টায় ও মনীষায় সেই ধারার খাত খনিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রামানন্দ সেই মহাপুরুষদের অন্যতম। তাঁর আলোচ্য জীবনকথায় ব্যাখ্যার চেয়ে ঘটনার তালিকা সময় সময় বেশি হলেও বইটি থেকে এই সুদীর্ঘ ধারার ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে রামানন্দের মহৎ অবদানের চিত্র স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বাল্যে অসাধারণ কষ্ট-দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যার্জন করে তিনি স্বকীয় চেষ্টায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বাল্য-জীবনেই রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তার পর কলিকাতায় আসবার পর তাঁর সহপাঠী সতীর্থ ও সমসাময়িকদের মধ্যে এমন অনেকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন যাঁরা—যথা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু—

বাংলায় সর্বজনপূজ্য। কিন্তু সেই অল্পবয়সের নানা ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীক বীরত্বের আভাস পাওয়া যায়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম হলেও তিনি যখন উপবীত ত্যাগ করলেন তখন তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নি। সেই উপলক্ষ্যে এমন কুৎসাও প্রচারিত হয়েছিল যে তিনি আত্মীয়স্বজনকে উপার্জনের ভাগ দিতে চান না বলেই হয়তো ব্রাহ্ম হয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট আয় ১১৯৮১৫-এর মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য দিয়ে তাঁর নিজের জন্য বাকি ছিল আন্দাজ ১৬৲ মাত্র। এই রকম ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেই যে তাঁর চরিত্রের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তা নয়। সে সময় থেকেই দেশের কাজে, কংগ্রেসের কাজে, দাসাশ্রমের মধ্য দিয়ে রোগী অনাথ ও দুঃস্থদের সেবায়, 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদনে তাঁর কুসুমসুকুমার অথচ বজ্রকঠিন চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠতে আরম্ভ করল। তার পর দীর্ঘকাল ধরে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মহৎচরিত্র বিকশিত হয়েছে। পত্রিকা-সম্পাদনায়, পত্রিকার নতুন আদর্শ রচনায়, ছবি ছাপার রীতি ও লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি প্রবর্তনে, নির্ভীক সমালোচনায়, শ্রেষ্ঠ মনীষীদের রচনা প্রকাশে, ভারতের মুক্তিসাধনায় অংশগ্রহণে এবং সেজন্য জনসাধারণের চিত্তের প্রস্তুতি ও চরিত্রগঠনে তিনি অর্ধশতাব্দী ধরে যে বিপুল ঐতিহ্য রচনা করে গিয়েছেন তা বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এত গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও যখনই অপবাদ প্রচারিত হয়েছে যে রামানন্দ নিজের পত্রিকার স্বার্থে রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন তখনই রামানন্দ তার প্রতিবাদের ব্যবস্থা করেছেন, রবীন্দ্রনাথকেও সাক্ষী মানতে দ্বিধা করেন নি। এই 'শুক্লকেশ ও শুক্লকর্মা' সম্পাদকের চরিত্র-দ্যুতি হয়তো রবীন্দ্রনাথের মত চোখ-ধাঁধানো নয়, কিন্তু সে দ্যুতি তবুও অপূর্ব। ন্যায়নীতিতে অবিচলিত বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের জন্য সকল রকম ত্যাগ ও দুঃখ বরণ, একদিকে মৈত্রী ও কারুণ্যে উদ্বেলিত হৃদয় অথচ অন্যদিকে বজ্রকঠিন বীর্য— এইসমস্ত গুণের সমন্বয়ে তাঁর চরিত্র মহীয়ান্। আলোচ্য গ্রন্থে সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিকায় রামানন্দ-জীবনীর এইসব দিক ফুটে উঠেছে। আরও লক্ষ্য করার কথা এই যে, লেখিকা কন্যা হলেও তাঁর রচনা শ্রদ্ধান্বিত হয়েও ঘটনানিষ্ঠ, ভাবাবেগের আতিশয্য কোথাও নেই। থাকলে হয়তো তার আবরণে এই চরিত্রের দ্যুতিটি তেমন ফুটত না। কিন্তু সে রকম কোনো আবরণ না থাকার ফলে সে দ্যুতি আপনা থেকেই ফুটবার সুযোগ পেয়েছে—পাঠকের মনে আপনা হতেই সে চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তবু একটি কথা না বলে উপায় নেই। এই বইটিতে, বিশেষতঃ একেবারে শেষের দিকে, টুকরো টুকরো ঘটনাই যেন কিছু বেশি সাজানো হয়েছে। বাংলায় তথা ভারতে এই যে যুগান্ত ঘটল এর বিরাট্ ও বিচিত্র পটভূমিকার আরও একটু বেশি আস্বাদ থাকলে যেন ভাল হত। তাছাড়া রামানন্দ দীর্ঘকাল ধরে নানা বিষয়ে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বইটিতে তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃত করে তার পরিচয় কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে আরও বৃহত্তর ও ধারাবাহিক পরিচয় পাঠকসমাজকে আরও বেশি উপকৃত করত। এমনকি, এবিষয়ে একটি আলাদা সংগ্রহ প্রকাশেরও প্রয়োজন আছে মনে করি। এ কথাগুলির উল্লেখ করছি বইটির ত্রুটিস্বরূপে নয়। বইটিতে এত জিনিস আছে বলেই পাঠকসাধারণ বোধ হয় আরও বেশি আশা করবে। বাঙালী এককালে যেসব গুণে বড় হয়েছিল, অদ্ভুতকর্মা ও অমিতবীর্য রামানন্দ ছিলেন সেইসব গুণের সমাহারী। সেইজন্য তাঁর জীবনী একালের বাঙালীর পক্ষে সমধিক মূল্যবান্। বইটি সে প্রয়োজন মেটাবে। রামানন্দের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত যে ছবিটি ফুটেছে তা অত্যন্ত মধুর।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর নেহরুজীবনী যে ঘটনা-প্রধান নয়, ব্যাখ্যা-প্রধান, সে কথা তাঁর বইয়ের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। গোড়াতেই তিনি বলেছেন, "নেহরুর জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা ঐ কর্মফলের স্তূপ রচনা মাত্র। তাঁহার যথার্থ জীবনী লেখককে দেখাইতে হইবে পূর্বোক্ত তিনজনের [বিবেকানন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ] সঙ্গে কোথায় তাঁহার মিল আর কোন্‌খানেই বা প্রভেদ, দেখাইতে হইবে ত্রিশবৎসর কাল গান্ধীজির নিকটতম সহচররূপে থাকিয়াও কেন তিনি গান্ধীজির শ্রেণীতে না পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীভুক্ত হইলেন· ·এসব দেখানোর অপর নাম, নেহরুর ব্যক্তিরূপ-বিকাশের ইতিহাস রচনা। সে ইতিহাস রচিত হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তি নেহরুর চেয়ে, কর্মী নেহরুর চেয়ে, রাজনীতিক নেহরুর চেয়ে নেহরুর ব্যক্তিত্ব অনেক মহৎ· অনেক চিত্তাকর্ষক তো বটেই।" লেখক এই ব্যক্তিত্বের উপাদান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, বাল্যের নিঃসঙ্গ জীবন তার একটা বড় উপাদান। এই কারণে তিনি অন্তর্মুখী ভাবুক, এমনকি তাঁর বক্তৃতাগুলিও সর্দার প্যাটেল বা মিস্টার চার্চিলের মত না হয়ে রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়সের 'আত্মচিন্তা'র মত। তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় উপাদান তাঁর হ্যারো কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই কারণেই তিনি গান্ধীজীবনের অনেক জিনিস বুঝতে পারেন নি। এই কারণেই নেহরু রাজনীতিক গান্ধীজির উত্তরাধিকারী বটেন, কিন্তু তার বেশি নয়। কেননা "নেহরু লৌকিক পুরুষ, গান্ধীজি লোকোত্তর পুরুষ।" গান্ধীবাদের অনেক কথা— যেমন ধনীদের হৃদয়বদল— নেহরু বোঝেন না। সেবিষয়ে একটি চমৎকার অনুচ্ছেদ আছে বইটিতে। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। লেখকের মতে "গান্ধীজির মূলতঃ আধ্যাত্মিক পুরুষ, নেহরু নৈতিক পুরুষ মাত্র ; গান্ধীজি জগৎকে স্বীকার করিয়াও ভগবানকে স্বীকার করিয়াছেন, নেহরু জগৎকে স্বীকার করিয়া আর-কোনো গভীরতর তৃষ্ণা অনুভব করেন না।" সেইজন্য এক হিসাবে নেহরুর পক্ষে প্রকৃত ভারত-আবিষ্কার সম্ভব নয়। ভারত তাঁকে টানে, ভারতের জনগণ তাঁকে উদ্বেলিত করে, ভারতের সৌন্দর্য তাঁর মন ভোলায়। কিন্তু "এ যুগে যেসব নাবিক ভারত-আবিষ্কারে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির নাম করা যাইতে পারে। ভিন্ন পর্যায়ে হ্যাভেল, কুমারস্বামী ও নিবেদিতার নামও থাকিবে। এই দুই পর্যায়ের কোনোটিতেই নেহরুর নাম করা চলে না। সুগভীর অধ্যাত্মপ্রেরণা ব্যতীত প্রকৃত ভারতবর্ষ আবিষ্কার অসম্ভব। অধ্যাত্মপ্রেরণা নেহরুতে প্রবল নয়। ভারতবর্ষ ধর্ম বলিতে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি নেহরুর তেমন আস্থা নাই, বড়জোর কৌতূহল আছে। কৌতূহল জ্ঞানমার্গীয় অবলম্বন। অধ্যাত্মসাধনার জন্য গভীরতর ও ভিন্নতর প্রেরণার আবশ্যক।" সেইজন্য লেখক বলছেন, নেহরুর আত্মচরিত পড়লে জানতে পারা যায় বিদেশীপ্রভাবে কিপ্রকারে নেহরুচরিত্র গড়ে উঠেছে ; আর ভারত-আবিষ্কার পড়লে বুঝতে পারা যায় যে ভারত-আবিষ্কারের সার্থকতা তার মধ্যে নেই, কিন্তু বোঝা যায় যে নেহরু ভারতমুখী হয়েছেন। সেজন্য বইখানির নাম হওয়া উচিত ছিল 'ভারত-প্রত্যাবর্তন'। কাজেই এসব দিকে নেহরুর শ্রেষ্ঠ বিকাশ নয়। লেখকের মতে "নেহরুর যথার্থ প্রতিষ্ঠা তাঁহার ব্যক্তিত্ব। তাঁহার অসাধারণ মনীষা, তীব্র ভাবাবেগ, সুদৃঢ় চরিত্র, সমস্তই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক। যে শক্তির প্রভাবে তিনি দেশ-বিদেশের লোককে মুগ্ধ করেন, যে শক্তির আকর্ষণে তাঁহার নামে সভাস্থলে দশ লক্ষ লোক সমবেত হয়, সে শক্তি তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে উপজাত। চরিত্রশক্তিতে খুব সম্ভব প্যাটেল সমৃদ্ধতর, খুব সম্ভব রাজনৈতিক মনীষা রাজাগোপালাচারির অধিক, কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল অল্প লোকেরই আয়ত্ত।"

এর ফলাফল রাজনীতিতে কি রকম সে কথা লেখক আলোচনা করেন নি ; বস্তুতঃ সে কথা তাঁর আলোচ্য বস্তুও নয়। কিন্তু এই বইটির স্বল্পপরিসরে নেহরু-চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত বিশীর 'চিত্র-চরিত্র' একজনের চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, নানা লোকের জীবন সম্বন্ধে ছোট ছোট সমষ্টি। এগুলি মিনিয়েচর ছবির মতই। কিন্তু তবু শুধুই মিনিয়েচর ছবি নয়। এই জীবনকথার বিষয়বস্তু সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার খ্যাতনামা ব্যক্তিরা— যথা, রাজা রামমোহন, পরমহংসদেব, ডেবিড হেয়ার, কেরী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, টেকচাঁদ ঠাকুর, নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছোট ছোট স্কেচ রচিত হতে হতে ক্রমে এর মধ্যে একটি মূল সুর বেজেছে। লেখক নিজেই সে কথা বলেছেন, "চিত্র-চরিত্র ধারাবাহিক ইতিহাসও নহে আবার খণ্ড জীবনীও নহে, কোনো নামের দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বলা উচিত— ইহা একটি যুগের জীবনচরিত।·· বাঙলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বরূপ কি ? সংক্ষেপে বলা চলে— 'আত্মোপলব্ধি'। বিশদভাবে ইহাই চিত্র-চরিত্রগুলিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মোপলব্ধির অপর নাম 'ভারতোপলব্ধি'। এই ভারতোপলব্ধির লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মনীষিগণ মানুষের সর্ববৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধ একটি পন্থা আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।··ঊনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষিগণ বহুকাল পরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।··প্রাদেশিকতা তাঁহারা জানিতেন না—তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি বিবর্জিত ছিলেন।··আধুনিক বাঙালী যে ঊনবিংশ শতকের কীর্তিকে বুঝিতে অক্ষম, তার কারণ তাহারা ভারতীয় দৃষ্টির পরিবর্তে সর্ববিষয়ে প্রাদেশিক দৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছে।" তাছাড়া লেখক আরও দেখিয়েছেন যে গত শতকের জ্ঞানকৈবল্যের ফলস্বরূপে বাঙালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নেশায় মত্ত হয়েছিল। আজ সমষ্টিসাধনার প্রাধান্য শুরু হবার সঙ্গেসঙ্গে 'ব্যক্তিসর্বস্ব' বাঙালীর নেতৃত্বে খসে পড়ছে। এইসমস্ত মৌলিক কথাগুলিই বিভিন্ন চরিত্রচিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ফোটাতে চেয়েছেন। সব চিত্রই যে সমান উৎরেছে তা নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি চিত্রের আণুবীক্ষণিক বিচারেই এ বইটির মূল্য নয়। লেখক ভূমিকায় যে অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মৌলিক কথাগুলির উল্লেখ করেছেন এই চিত্রপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। সে হিসেবে তাঁর পূর্ববর্তী বইটির চেয়ে এ বইটির মূল্য ঢের বেশি। কারণ, পূর্বোক্ত বইটিতে ক্ষণে ক্ষণে সন্ধানী আলোর ঝলক আছে, তাতে পাঠক সচকিত হয়। কিন্তু এ বইটিতে আছে সন্ধানী আলোর বদলে ছোট ছোট তারার ঝিক্‌মিক্ ; তার আলোয় পাঠক সচকিত হয় না বটে, কিন্তু একটা বিরাট্ মহাকাশের আভাস পায়। সেই মহাকাশ হল ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর চিত্তাকাশ। তারই পুনরালোকন আছে বলে বইটির মূল্য অধিকতর। এর পাশে নেহরুর জীবনভাষ্য অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়, এ বইখানি এতই উজ্জ্বল। সেকালের সমাজের ও মনের গভীর কথাগুলির অতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আছে এই বইটিতে।

নীরদবরণের 'শ্রীঅরবিন্দ' গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধাপ্লুত অর্ঘ্য। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের শেষ অধ্যায়ের বর্ণনা। এই সময় শ্রীঅরবিন্দের দেহ ক্রমে কালধর্মে জীর্ণ হয়ে এল। তবু একদিকে তিনি কি অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, অন্যদিকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে, তারই কিছু কিছু বর্ণনা এ বইটিতে আছে। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তিনি দেহের ব্যাধিকে পরাভূত করছেন, এমন-সব ঘটনার উল্লেখ আছে। যাঁরা অলৌকিক শক্তিতে সশ্রদ্ধ বিশ্বাস পোষণ

করেন তাঁদের পক্ষে এ বইটি নিশ্চয় মনোমুগ্ধকর হবে। কিন্তু ভারতের চিত্তে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠা শুধু এরকম অলৌকিক ক্ষমতার জোরে নয়। আরও হাজারটা কারণ আছে যার জোরে তিনি লৌকিক মানুষেরও চিত্ত জয় করেছেন। কিন্তু সে কথা এ বইটির বিচার্য বিষয় নয়। শেষ কয়দিনের কাহিনীই এ বইটির উপজীব্য। সে হিসেবে বইটি সুখপাঠ্য।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

খাতার পাতা। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা। দেড় টাকা।
নিমন্ত্রণ। শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়, কলিকাতা। দু টাকা বারো আনা।
বিপ্রমুখের কথা। বিপ্রমুখ। প্রকাশক শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। সাড়ে চার টাকা।
বিচিত্র উপল। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা, হাওড়া। চার টাকা।
চাচা-কাহিনী। সৈয়দ মুজতবা আলী। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। তিন টাকা।
পঞ্চতন্ত্র। সৈয়দ মুজতবা আলী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা।
ময়ূরকণ্ঠী। সৈয়দ মুজতবা আলী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা।
কালপেঁচার নকশা। কালপেঁচা। বিহার সাহিত্যভবন, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।
কালপেঁচার দুকলম। কালপেঁচা। বিহার সাহিত্যভবন, কলিকাতা। তিন টাকা।

এতগুলি বইকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে এই কারণে যে এরা ঠিক একপরিবারভুক্ত না হলেও এদের মধ্যে একটি জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান। সম্পর্কটা সব ক্ষেত্রে খুব নিকট নয়; কিন্তু সবটা মিলিয়ে কোথাও একটা আদল আছে যার জোরে এদের একপর্যায়ভুক্ত করা যায়। সেটাকে ঠিক মুখের আদল না বললেও মনের আদল বলা যেতে পারে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে এদের চিন্তার ধারাটা এক রকম—একই কথা ভাবছেন কিম্বা একই কথা বলছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এদের ভাব বিভিন্ন কিন্তু হাবভাবটা কতকটা একজাতীয়।

লেখক-মানুষরা সাধারণত মুখচোরা স্বভাবের লোক। তাঁদের কলমের ডগায় যত সহজে কথা জোগায় জিবের ডগায় তত সহজে নয়। আবার, এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাঁরা চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারেন, কিন্তু সেই কথাকেই যদি লেখার পাতায় হাজির করতে বলা হল তো এমন আড়ষ্ট এমন অপ্রতিভ মূর্তিতে দেখা দেবে যে দেখলেই মায়া হবে। গুছিয়ে বলা আর গুছিয়ে লেখা এক কথা নয়। বেশির ভাগ মানুষই মুখে এক, কলমে আর। এটাকে দোষই বলতে হবে। কিন্তু এখানে যাঁদের কথা বলছি তাঁরা আর যাই হোন মুখচোরা মানুষ নন। এঁরা সবাই বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি'; এঁদের বেলায়—লিখিয়াছি যেই মত বলিবারে পারি। এটা বড় কম কথা নয়। শব্দের কলরবকে নিঃশব্দের কলেবর দেওয়া রীতিমতো কঠিন কাজ।

এই জাতীয় লেখা কিছুকাল ধরে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে; হালে কেউ কেউ একে

রম্যরচনা বলতে শুরু করেছেন। রম্যরচনা নামটাতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে, তার কারণটি এইখানে বলে নিই। আমার মতে সার্থক রচনা মাত্রই রমণীয় রচনা। কোনো বিশেষ ধরনের রচনাকে যদি আগে-ভাগেই রম্যরচনা নাম দিয়ে বসে থাকি তাহলে তার নামের মধ্যেই একটি সার্টিফিকেট জুড়ে দেওয়া হয়। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। ধরুন, এর পরে কেউ যদিব লেন অমুক রম্যরচনাটি যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয়নি, তবে তার রম্যরচনা নামের সার্থকতা রইল কোথায়? ল্যাম্ স্টীভেন্‌সন্ যেসব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাদের ধরেই কেউ *belles lettres* নাম দেয়নি; কালের বিচারে তারা সে নাম অর্জন করেছে। আমাদের দেশে এখন অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে এদের মধ্যে যেসব রচনা রসের বিচারে উত্তীর্ণ হবে তারাই একদিন রম্যরচনা নামের অধিকারী হবে। নামে অনেক কিছু যায় আসে বলেই এই কথাটি বলতে হল। সব-কিছুর আদিতে নাম। নামে গলদ থাকলে গোড়ায় গলদ থেকে যায়।

রচনামাত্রই যেমন রম্যরচনা নয়, প্রবন্ধ মাত্রই তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়। সাধারণ প্রবন্ধে বক্তব্য-বস্তুটা প্রধান। লেখকের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে, সেটিকে তিনি যুক্তিতর্কের দড়িদড়া বেঁধে বেশ মজবুত চেহারা করে পাঠকের সামনে পেশ করেন। কোনো কোনো দেহের গঠন যেমন পেশিবহুল, এদের গঠন তেমনি যুক্তিবহুল। চেহারাটা ভারি এবং মজবুত গোছের হলেও প্রকাশভঙ্গিটি যদি মনোরম হয় তাহলে সমস্তটা মিলিয়ে মূর্তিটি হবে সুঠাম সুসমঞ্জস—তেমন প্রবন্ধকে অনায়াসেই সার্থক রচনা বলা যেতে পারে। এই জাতীয় প্রবন্ধে বক্তব্যটা প্রমাণসাপেক্ষ, ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী নয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তিত্বটাই প্রধান, বক্তব্য অপ্রধান। সেখানে লেখাটা বক্তব্যের ভারে কাটে না, ব্যক্তিত্বের ধারে কাটে। বলবার কিছুই নেই অতএব লিখলুম না—কেবলমাত্র এই কথাটি বলবার জন্যে অনায়াসে সাত পাতা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে এবং তাতেও লেখকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। শুধু তাই নয়, সবটা মিলিয়ে জিনিসটা রসোত্তীর্ণ হতেও বাধা থাকে না। সেটা সম্ভব হয় কেবলমাত্র লেখকের ব্যক্তিত্বের গুণে। যে মানুষের সাধা গলা, তিনি যদি বিশেষ কোনো গান না করে শুধু আপন মনে সুর ভাজেন সেটি যেমন শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করে, এও তেমনি। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আর কিছু নয়, লেখকের আপন মনে সুরের গুনগুনানি। প্রবন্ধকারের মনটি সাধা মন, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক পড়েছেন। সেই বহুলব্ধতার প্রসাদে মনটি কানায় কানায় পূর্ণ— তারই খানিকটা যখন ছলাৎ করে লেখার পাতায় উপচে পড়ল তখন সে জিনিসের আর তুলনা হয় না, সাহিত্যে সেটি রম্য সৃষ্টি। তার মধ্যে কাব্য আছে, নাট্য আছে, কাহিনী আছে, ইতিবৃত্ত আছে, আপন মনের কল্পনা আছে, কৌতুক হাস্যের দ্যুতি আছে, সজল চোখের মিনতি আছে— লেখকের বিচিত্র মনের চিত্রিত বিবরণ। একান্তভাবে আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলেই প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখকের আত্মচরিতের এক-একটি টুকরো অংশ।

আলোচ্য গ্রন্থ-কখানির প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই উপরোক্ত মন্তব্য খাটে এমন নয়। তবে প্রত্যেকটি গ্রন্থই এর কিছু কিছু গুণের অধিকারী। মোটামুটি এই কথা বলা যেতে পারে যে, বেশির ভাগ লেখার মধ্যেই সাহিত্যের প্রসাদগুণ রয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখার মধ্যে একটি বিপদ আছে, সে বিপদ সকলে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। নিজের কথা একটু বেশি পরিমাণে বলতে গেলে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা এবং বাচালতা প্রকাশের আশঙ্কা থাকে।

সেই দিক থেকে বিমলচন্দ্র সিংহের লেখায় যে স্নিগ্ধতাটি আছে তা মনকে প্রসন্ন করে। লেখার মধ্যে একটি অত্যন্ত সংযত পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত মনের পরিচয় আছে; আবার অত্যন্ত সংযত বলেই ব্যক্তিত্বের ছাপ ততখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আরেকটু যদি মর্জি কিম্বা মেজাজ প্রকাশ পেত তো লেখার বৈচিত্র্য বাড়ত। অবশ্য যাঁর লেখার হাত স্বভাবতই মিষ্টি তাঁকেও 'খাতার পাতা'য় অল্পবিস্তর লঙ্কাবাটা মেশাতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হওয়াই ভালো। বিমলবাবুর স্বধর্ম খাঁটি সাহিত্যিকের ধর্ম। সাহিত্যবিচারে এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। যা কিছু বলেছেন হালকা সুরেই হোক আর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর সুরেই হোক সর্বত্র খাঁটি সাহিত্যের সুরটি লাগাতে পেরেছেন। দুঃখের বিষয় 'খাতার পাতা'র অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তিনি আমাদের যৎসামান্য দিয়েছেন। ভালো জিনিসের অল্পতে মন ওঠে না। ওঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু পাবার আশা রাখি।

এই জাতীয় রচনার জন্যে যে মানসিক সজ্জা এবং প্রসাধনের প্রয়োজন তার অনেকখানি যেমন আছে বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মধ্যে তেমনি আছে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। বিমলাপ্রসাদ ইতিপূর্বে যা লিখেছেন তার কিছু কিছু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'নিমন্ত্রণ'-এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পূর্বতন গৌরবের অধিকারী এমন কথা বলব না। কোথাও কোথাও প্রসাধনের ফাঁকে ফাঁকে বয়সের বলীরেখা দেখা দিয়েছে। তাহলেও বলব, তিনি পাঠককে কখনো নিরাশ করেন না। লেখার মধ্যে এমন-একটি তার আছে, স্বাদ আছে— মন সহজেই প্রসন্ন হয়। ঐ স্বাদটিই সাহিত্যের প্রাণীন্ পদার্থ, ঐটি সকলের লেখায় আসে না। বিমলাবাবু নিজে ভাবতে জানেন, অপরকে ভাবাতে জানেন। 'বিপ্রমুখের কথা' নিতান্তই মুখের কথা নয়, অনেক ভাববার কথা আছে। কোনো একটা বিষয়কে আশ্রয় করে কয়েকটি ভাবনার সূত্র পাঠকের মনে তুলে দিয়ে দিব্য ভালো মানুষটির মতো সরে পড়েন, গম্ভীর মুখে অন্য কথা পাড়েন। বিষয়বৈচিত্র্যে 'বিপ্রমুখের কথা' নানা চিন্তার একটি চলন্ত শোভাযাত্রা। লোক-লৌকিকতা, সমাজ-সামাজিকতা, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা এবং শিক্ষক, রোগ এবং মৃত্যু, ইহলোক এবং পরলোক ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ভঙ্গিটা নাতি-লঘু, নাতি-গুরু। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রসবেত্তার কথায় যে সারবত্তাও থাকতে পারে লেখায় তার প্রমাণ আছে।

প্র. না. বি. আর প্রমথনাথ বিশী এক ব্যক্তি হলেও দুজনের ব্যক্তিত্বে খানিকটা তফাত আছে। স্বনামে বেনামে দু ভাবেই যাঁরা লেখেন তাঁদের লেখায় এই তারতম্য থাকা স্বাভাবিক। স্বনামে যখন লেখেন তখন স্বরূপ প্রকাশ পায়, আর বেনামে যখন লেখেন তখন বিরূপ। মন বিরূপ হলেই কথায় অধিকতর ঝাঁজ প্রকাশ পায়। লক্ষ্য করে দেখেছি প্রমথনাথ বিশীর চেয়ে প্র. না. বি. র লেখায় ঝাঁজ বেশি থাকে। অবশ্য ইচ্ছে করলে স্বনামেও বিশী মহাশয় যে-কোনো কথাকে বিষিয়ে দিতে পারেন। ঝাঁজালো ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যিনি সাধারণত ঝাঁজের সঙ্গে কথা বলেন তিনি কখনো যদি নরম সুরে কথা বলতে শুরু করেন তো আকর্ষণ বাড়ে বই কমে না। 'বিচিত্র উপল' গ্রন্থটির নামের মধ্যে একটি লালিত্য আছে। সুখের বিষয় বক্তব্যবস্তুর মধ্যেও তার খানিকটা প্রবেশ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের চলন্ত প্রবাহে বহুবিধ অভিজ্ঞতার উপলখণ্ড আপনি এসে জড়ো হয়। সেই বিচিত্র সম্ভার আমাদের সুমুখে উপস্থাপিত করে প্রমথবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ যুগের বিদ্বানেরা কেউ নিউটনের মতো বিনয়ী নন। জ্ঞানসমুদ্র কিম্বা জীবনসমুদ্রের

তীরে দাঁড়িয়ে নুড়ি কুড়ানোতে তাঁদের আস্থা নেই। অথৈ জলে ঝাঁপ দিয়ে নাকানি-চুবুনি খাওয়ার নাম অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রমথবাবুও বিদ্যাচর্চা করে থাকেন, জ্ঞানসমুদ্রের লোণাজল তাঁরও নাকে-মুখে ঢুকেছে, তথাপি উপল-সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ আছে, এইটি সাহিত্য এবং সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে আশ্বাসের কথা। প্রমথবাবু রবীন্দ্রশিষ্যদের অন্যতম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চরম তত্ত্বটি তিনি শিখেছেন—'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা'। বিষয়বস্তু নিয়ে বাছ-বিচার করতে যান নি। ফুলকপি, বার্তাকু, সোডার বোতল, গোরুর গাড়ি সব কিছুকেই সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন। একদিকে গদ্যকবিতার আলোচনা করেছেন, অপরপক্ষে নতুন জুতোকেও অবহেলা করেন নি। সাহিত্যে অস্পৃশ্যতা পরিহারের প্রয়োজন ছিল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সেই কাজটি করেছে। একদা যেসব বস্তু ছিল সাহিত্যে অস্পৃশ্য বাণীমন্দিরের দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা কাব্যে উপেক্ষিতা চেস্টারটনের মতে তা ট্রিমেণ্ডস্ ট্রাইফল্স্; আর প্র. না. বি. তারই নাম দিয়েছেন উপলখণ্ড।

'চাচাকাহিনী'তে সৈয়দ মুজতবা আলী আশ্চর্য রকম মনোহারী গল্প জমিয়েছেন। এ জাতীয় রচনার পক্ষে তিনি আদর্শ ব্যক্তি। বাক্‌চাতুর্য এবং লিপিচাতুর্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। গল্প বলা আর গল্প লেখা এক বস্তু নয়। বলার কথাকে লেখার আকার দিতে গিয়ে অনেকে কথ্যবস্তুটাকে অকথ্য ব্যাপার করে তোলেন। মনের ভাবনাকে লেখার পাতায় ষোল আনা ধরে দিতে সক্ষম এমন লেখক লাখে না মিলল এক। যে শোধন-প্রক্রিয়ার- মধ্য দিয়ে মুখের বাক্যকে লেখার পাতায় উত্তীর্ণ হতে হয় তাতেই কথার অধেক রসের অপচয় ঘটে। মুজতবা সাহেবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপচয় নেই। তিনি যা ভাবেন তা পুরোপুরি পাঠককে দিতে পারেন। ঠিক এই মুহূর্তে মুজতবা সাহেব বোধকরি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তার কারণ পাঠকদের সঙ্গে তিনি যেমন সহজ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছেন এমন আর কেউ নয়। 'চাচাকাহিনী'তে নাহয় কাহিনীর আকর্ষণটা একটা বড় কথা, কিন্তু 'পঞ্চতন্ত্রে' নিতান্তই এ কথা ও কথার আলোচনা পাঠকরা অনুরূপ অধীর আগ্রহের সঙ্গেই শুনছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'ময়ূরকণ্ঠী' এই দুই গ্রন্থে অনেকটা একই জাতীয় জিনিসের পরিবেশন। একটি কাল্পনিক শ্রোতৃমণ্ডলী লেখককে ঘিরে বসেছে। একটা-কোনো কথার সূত্র ধরিয়ে দিলেই হল— ও, এই কথা যদি বললেন, তবে শুনুন বলছি— ব্যস্, শুরু হল অনায়াস বাক্যস্রোত। কথাশিল্পী একেই বলে— আলী সাহেবের কথা অমৃতসমান বললে অত্যুক্তি হয় না। বহুশ্রুতি বহুস্মৃতি বহুদর্শিতার প্রসাদে প্রতিটি পাতা সমৃদ্ধ। নিছক গল্পই হোক আর অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর আলোচনাই হোক, কথা বলার এমন জীবন্ত ভঙ্গী, পড়তে পড়তে লেখকের কণ্ঠস্বর যেন কানে ভেসে আসে। এমনকি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বক্তার ভ্রূভঙ্গি এবং হাত-নাড়ার আভাস পাওয়া যায়। এসবই ভালো; তবু বলব তিনি মাঝে মাঝে অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন। 'চাচাকাহিনী'তে যে ভাষা খাপ খেয়ে যায় 'পঞ্চতন্ত্রে' কোথাও কোথাও সে ভাষা খাপছাড়া বলে মনে হয়। চাচা যে ভাষায় কথা কইবেন বিষ্ণুশর্মা সে ভাষায় নাও বলতে পারেন। মাঝে মাঝে যদি গলা খাটো করে কথা বলতেন তো শুধু কথার বৈচিত্র্য নয়, কথার আবেদন বাড়ত। মুজতবা সাহেব শক্তিমান লেখক। তিনি যে অন্য সুরে কথা বলতে পারেন না এমন নয়। 'ময়ূরকণ্ঠী'র সঞ্চয়নটি তার প্রমাণ। ওখানে তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত সংযত এবং সংযত বলেই অধিকতর সাহিত্যগন্ধী।

কালপেঁচার নক্‌শাগুলি যখন ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল তখনই বন্ধুবান্ধবের মুখে লেখাগুলোর তারিফ শুনেছিলাম। এখন পুস্তকাকারে সংগৃহীত নক্‌শাগুলো পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলাম। এঁর লেখার হাত পাকা। দেখবার মতো চোখ আছে, ভাববার মতো মন আছে। ভাষার সাচ্ছন্দ্য লক্ষণীয়। দৈনিক পত্রিকার স্তম্ভের লেখা সর্বসাধারণের জন্যে। এই কারণে ভাষাটাকে ইচ্ছে করেই বোধকরি অত্যন্ত আটপৌরে করা হয়েছে। ফলে কোনো কোনো লেখায় সাহিত্যিক প্রসাদগুণের কিঞ্চিৎ অভাব হয়েছে। সাধারণের জন্যে লিখতে হলে লেখাটা সাধারণ করতে হবে এমন কথা ভাবা অন্যায়। তাতে সাহিত্যের প্রতিও অবিচার করা হয়, সাধারণের প্রতিও। কারণ সাধারণ পাঠকরা সাহিত্য-রস উপভোগে অক্ষম এমন কথা ভাববার কোনো কারণ নেই। ভাষাটা পাণ্ডিত্যের ভারে ভারিক্কি না হলেই হল। কালপেঁচা রসিক ব্যক্তি, সে রসবোধ তাঁর আছে। অযথা পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি; অথচ বহু বিচিত্র এবং বিস্মৃত তথ্য দিব্য রসগ্রাহ্য করে সকলের কাছে পরিবেশন করেছেন।

সাহিত্যরসের দিক থেকে ওঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কালপেঁচার দুকলম' অধিকতর সার্থক রচনা। লেখক ভূমিকায় বলেছেন তিনি স্টাইলের কোনো ধার ধারেননি, সাদা কথা সাদামাটা ভাষায় বলেছেন। লেখার স্টাইল বলতে আমি বুঝি লেখার চরিত্র। লেখার চরিত্র লেখকেরই চরিত্র। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তথ্যের ভারে এবং ভীড়ে সেই চরিত্রটি কিঞ্চিৎ ঢাকা পড়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে লেখকের চরিত্র অধিকতর স্পষ্ট। এইখানে তাঁকে বেশি আপনার বলে মনে হয়। প্রথম গ্রন্থে একাল এবং সেকালের কলকাতার চিত্র। কলকাতার রাস্তার হৈচৈ এবং কলরব বহুলপরিমাণে বইএর পাতার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। পড়তে পড়তে কেমন যেন হাঁপ ধরে যায়। সেই তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থের পরিবেশ অনেক বেশি স্নিগ্ধ।

অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে অভাবনীয় বিস্তার লাভ করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। এর কৃতিত্ব বহুল পরিমাণে পাঠকদের প্রাপ্য। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, শুধু রসগ্রাহ্য করে কথা বলতে পারলে আগ্রহবান শ্রোতার অভাব হয় না, সাহিত্যিক আবহাওয়ার পক্ষে এটি অতি শুভ সূচনা। পাঠক-সমাজ যেখানে এতটা রসগ্রাহী লেখক-সমাজকে সেখানে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই খাদ্যসংকটের দিনে নন-সিরিয়েল ফুড বলে একটা পদার্থের প্রবর্তন হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে যা চলছে তার একটা অংশকে এক ধরনের নন্-সিরিয়েল লিটারেচর বলা যেতে পারে। এর মধ্যে হাস্যকৌতুক আছে, রসোজ্জ্বল উক্তি আছে, আলংকারিক বাক্যপ্রয়োগ আছে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্যের রস খুব বেশি পরিমাণে নেই। আমরা এর সমস্তকেই রম্যরচনা বলে চালিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সে জিনিসটার আসল রূপ যে কি, ল্যাম্-এর যে-কোনো প্রবন্ধের দুপাতা পড়লেই রসিক পাঠক তা বুঝতে পারবেন! বারো আনা জার্নালিজ্‌মের সঙ্গে সিকি পরিমাণ সাহিত্যের ব্যাসন মিশিয়ে দিলেই সেটা সাহিত্যের পুরো মর্যাদা লাভ করে না। জার্নালিজ্‌মের ধর্ম এক, সাহিত্যের ধর্ম আর।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর ॥
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে, দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥

কথা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি ॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II [ম]গা মা -ণা । [ণ]দা পা -দা I [দ]মা -া -পা । মপা -দণা দপা I
ও গো ০ আ মা র্ প্রা ০ ০ নে০ ০র্ ঠা০

I মা -া -পমা । -গা -মা -গা I মগা মা -ণা । [ণ]দা পা -া I
কু ০ ০০ ০ ০ র্ ও০ গো ০ আ মা ০

I -া -া -া । -া গা গা I গা -মা মা । মা মা -া I
০ ০ ০ র্ তো মার্ প্রে ম্ তো মা রে ০

I মা গমা -পদা । [দ]পা ণদা -া I -া -া না । র্সা র্ঋা র্সা I
এ ম০ ০ন্ ক রে০ ০ ০ ০ ক রে ছে নিষ্

I র্সজ্ঞা -র্ঋা -র্সা । -ণা -দা -পা II
ঠু০ ০ ০ ০ ০ র্

সা র্সা II র্সজ্জ্ণ জ্জ্ণ -া । জ্জ্ণ -র্রা জ্জ্ণ I জ্জর্মা মজ্জ্ণ -া । ঋর্া র্সা -া I
তু মি ব ০ সে ০ থা ক্ তে দে বে ০ না যে ০

I র্সঋর্া র্সা -া । ণা ণা -দা I দপা -ণা ণদা । দা পা -া I
দি ০ বা ০ নি শি ০ তা ই তো বা জে ০

I পা পদা -ণা । ণদা পা -দা I দমা দা -া । জ্জর্মা মজ্জ্ণ -া I
প রা ০ ন্ মা ঝে ০ এ ম ন্ ক ০ ঠি ন্

I ঋর্া -র্সা -ণা । -দা -পা -মগা II
সু ০ ০

-া -া II সা সা -ঋা । জ্ঞা জ্ঞা -মা I মজ্ঞা -া -া । ঋা -জ্ঞা ঋা I
০ ০ ও গো ০ আ মা র্ প্রা ০ ০ ণে র্ ঠা

I সা -া -া । -া -া -া I সমা মা -া । মা মা -া I
কু ০ ০ ০ ০ র্ তো০ মা র্ লা গি ০

I মপা -মা জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I মা -া মজ্ঞা । ঋা জ্ঞা -ঋা I
দুঃ ০ খ আ মা র্ হ য়্ যে ন ম ০

I সা -া -া । -া -া -া I জ্জ্ণ জ্জ্ণ -া । জ্জর্রা জ্জ্ণ -া I
ধু ০ ০ ০ ০ র্ তো মা র্ খোঁ জা ০

I জ্জর্মা জ্জ্ণ -া । ঋর্া র্সা -া I সঋর্া র্সা -া । ণা ণা -দা I
খোঁ জা য়্ মো রে ০ তো মা র্ বে দ ন্

I পা পদা -ণা । ণদা পা -া I পা পদা -ণা । ণদা পা -দা I
কাঁ দা৹ য়্ ও রে ৹ আ রা৹ ম্ য ত ৹

I মা ণদা -া । দর্মা র্মর্জ্জা -া I ঋ্রা -র্সা -ণা । -দা -পা -মগা IIII
ক রে৹ ৹ কো৹ থা য়্ দূ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹র্

হেমন্তশ্রী
শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০

ধর্মলিপি

মনুসংহিতা হইতে অনূদিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥ মনু ৪. ১৭২

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই,
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অদ্যই।
জানি তার আবর্তন অতি ধীরে ধীরে,
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরে॥

২

যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ॥ মনু ৪. ১৭৩

আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি,
পুত্রে বা পৌত্রেও তাহা ফলে নিরবধি।
এ কথা নিশ্চিত জেনো, অধর্ম যে করে
নিষ্ফল হয় না কভু কালে কালান্তরে॥

৩

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ মনু ৪. ১৭৪

আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা,
অধর্মেই আপনার ভালো দেখে তারা।
এ পথেই শত্রুদের পরাজিত করে,
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথ মনুসংহিতার উপরিউদ্ধৃত শ্লোকগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগুলি উৎকীর্ণ করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় স্বগ্রামে (হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ) একটি ধর্মলিপি ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-কৃত পরিকল্পনানুযায়ী একটি ধর্মস্তম্ভ স্থাপন করেন (১লা চৈত্র ১৩৪৬)। "এই ধর্মলিপি এই গ্রামের কোন এক অধিবাসীর। অধর্ম সমস্ত দিকে সকলকে অভিভূত করিতেছে দেখিয়া তিনি মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছেন, আর সকলকে আদরপূর্বক আহ্বান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—বন্ধুগণ, শ্রবণ করুন। ঋষি সত্য কথাই বলিয়াছেন—"। ধর্মস্তম্ভ স্থাপনা উপলক্ষ্যে এই ধর্মলিপি গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার সূচনা হইতে উল্লিখিত উদ্ধৃতি মুদ্রিত হইল।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, নানা উপদেশে ও ভাষণে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্যের সারসংক্ষেপরূপে তৃতীয় শ্লোকটি বারংবার ব্যবহার করিয়াছেন।

মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

রুদ্ধগৃহ[১] অনেকদিনের লেখা। পড়তে গেলে অন্য কারো রচনা বলে বোধ হয়। তুমি প্রশ্ন না করলে ওর অস্তিত্বের পরিচয় পেতুম না। কিন্তু ওর বিষয়বস্তুটা দুর্ব্বোধ মনে হোলো না।

জীবনে যখন কোনো বড়ো শোক আসে তখন মনে করতে পারিনে কালে তার ক্ষয় হতে পারে। নিজের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে। এত তীব্র বেদনাও যে কোনো চিরসত্যকে বহন করেনা সে কথাটাকে আমরা সান্ত্বনাস্বরূপে গ্রহণ করিনে, তাতে আমাদের দুঃখের অহঙ্কারে আঘাত লাগে। জীবনটা থাকে কালের চলাচলের পথে, তার বিশ্রামহীন চাকার তলায় গুরুতর বেদনার চিহ্নও জীর্ণ হয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে। আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটিমাত্র দাবি, সে বলে মনে রেখো। কিন্তু প্রাণের দাবি অসংখ্য, মনকে সে অহোরাত্রি নানাদিক থেকেই আকর্ষণ করতে থাকে— দাবির সেই উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে মৃত্যুর একটিমাত্র আবেদন টিঁকতে পারেনা। মনে যদি থাকে স্মৃতির ব্যথা যায় ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু শোকের অভিমান জীবনকে বঞ্চিত করে ও শোককে ধরে রাখতে চায়। চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দেয়, প্রাণের দূতগুলিকে বলে দেয় not at home। প্রাণ আপন বিচিত্র ফসলের ক্ষেতকে উর্বর করে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু শোক অভিমানী তার মাঝখানে একটা শোকোত্তর জমি রাখতে চায় সেইটেতে সাধের মরুভূমি বানায়। মৃত্যুর সঞ্চয় নিয়ে কালের বিরুদ্ধে তার মকর্দ্দমা। ভিতরে ভিতরে ক্রমেই হারতে থাকে কিন্তু হার মানাতে চায়না লেখক বলচে হার মানাই ভালো। মনকে নিজকৃত কবরে জীবিত সমাধি দেবার মতো অভিশাপ কিছু হতে পারে না। দেখা যাচ্চে পরবর্ত্তীকালের বলাকার ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে। ইতি ২১।৯।৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সংসারে যে দুঃখ গভীর সে আপন মাহাত্ম্যেই আপন সান্ত্বনা বহন করে আনে। ক্ষুদ্র শোকের বাণী নেই, মহৎ শোকের বাণী আছে। পরিপূর্ণ ক্ষতি সে নয়। হৃদয়কে সে বিদীর্ণ করে, কিন্তু সেইখান থেকে প্রচ্ছন্ন উৎস উৎসারিত হয়ে ওঠে— সে উৎস বৈরাগ্যের। সেই বৈরাগ্যের ধারা অন্তত কিছুকালের

---

১ বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত। প্রবন্ধটি প্রথমে ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'বালক' পত্রে মুদ্রিত হইলে, এ সম্বন্ধে কোনো লেখকের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্রবিনিময় হয় (বালক, পৌষ ১২৯২) তাহা রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সঞ্চয়িতার গ্রন্থপরিচয়ে শাজাহান কবিতার টীকাও দ্রষ্টব্য।

জন্য সংসারের সমস্ত সম্বন্ধকে নির্ম্মল করে দেয়। অর্থাৎ মানব সম্বন্ধ থেকে আসক্তির ধূলি-আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাকে মুক্তির ভূমিকায় বিশুদ্ধরূপে দেখিয়ে দেয়। এই দেখা সর্ব্বদা দেখতে পাইনে বলেই আমরা নানা মলিন মিথ্যায় জড়িত হয়ে দুঃখ পাই দুঃখ দিই। মানুষে মানুষে যে যোগ, তাকে সত্য করে তোলা ও সত্য করে দেখাই জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট সাধনা। যা সত্য তা মৃত্যুর অতীত। মৃত্যু যেটুকু ধ্বংস করে তাকে স্বীকার যেন সহজ মনে করতে পারি— কিন্তু যা মৃত্যুকে অতিক্রম করেও পরিশিষ্ট থাকে তারি পরিচয় যেন মৃত্যুর হাত থেকে পাই। পৃথিবীতে সমস্ত ভক্তিস্নেহ-প্রেমের মধ্যে সেই কিছু আছে যা চিরন্তন— আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক সময়ে তাকে আমরা অশ্রদ্ধা করি। মৃত্যু যেন শ্রদ্ধাকেই সংসারে বিস্তীর্ণ করে দেয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা আমি তার এই অর্থই জানি— অর্থাৎ সে বলে মানুষের মধ্যে যে অমৃত তাকেই যেন শ্রদ্ধা করতে পারি মৃত্যুর এই শিক্ষা সার্থক হোক্। শ্রাদ্ধমন্ত্রে বলে মধুমৎ পার্থিবং রজঃ— পৃথিবীর যে ধূলি তারও অন্তরে মধু আছে— তা যদি না থাক্‌তো তা হলে ত মৃত্যুরই জয় হোত। কিন্তু জয় তো হয়নি— চারিদিকে তো দেখতে পাচ্ছি মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। ইতি ৫ই আষাঢ় ১৩৩৯

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পিতামহের বিয়োগদুঃখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে জানি। কেননা দুঃখ স্বীকার করতেই হবে। দিন এবং রাত্রির মতো প্রেমের সম্বন্ধে একদিকে সুখ ও অন্যদিকে দুঃখ তাকে সম্পূর্ণতা দেয়। জীবনে যাঁকে পাওয়ার দ্বারা আমাদের ভালোবাসা সার্থক হয়, তাঁকে আশ্রয় করে সেই ভালোবাসারই প্রকাশ সুখে এবং দুঃখে সম্পূর্ণ করতে হবে। দুঃখ যদি না পেতে তাহোলে ভালোবাসার মূল্য যেত হ্রাস হয়ে। প্রিয়জনের প্রিয়ত্বের গৌরব তো ভালোবাসারই গৌরবে, সেই অভিজ্ঞতার থেকে জীবনকে বঞ্চিত করলে জীবনকে দরিদ্র করা হয়। বস্তুত শোকের অভিজ্ঞতা প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। অনুরাগ এবং বৈরাগ্য উভয়েই প্রেমের দান। মৃত্যু প্রেমের ব্যক্তিগত বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়, মৃত্যুর বিরাট ভূমিকায় প্রেমের সার্ব্বজনীন ও শাশ্বত রূপ দেখবার অবকাশ পাওয়া যায়— বৈরাগ্যে প্রেমের নির্ম্মলতম মূর্ত্তি পরিব্যক্ত হয়, বস্তুত প্রেমের মুক্তি তাই। সৌভাগ্যক্রমে যে প্রিয়বিয়োগীর মন বৈরাগ্যে উত্তীর্ণ হয় শোকেই তাকেই চরিতার্থতা দেয়। আমাদের কোনো ভালোবাসার লোক যখন চলে যায় তখন তাঁর চলে যাবার শেষ দানই এই। এই দানটি পেতে হোলে দুঃখের সেতুর মধ্য দিয়েই যেতে হয়। মৃত্যুর মধ্যে থেকে সত্যকে পেতে হোলে বীর্য্যের দরকার করে— সেই বীর্য্যের সহায়তার অভাবেই সত্যের অভাব ঘটে— তখন সত্যহীন শূন্যতার মধ্যে সংশয় এসে আক্রমণ করে। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩৪৩

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মনীষীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হলুম। শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। মর্ত্তালোক থেকে যে গেছে তার যাত্রা সার্থক হোক্ আমরা কেবল এই কামনা করতে পারি। আশা করি আমাদের বিচ্ছেদবেদনারও কোনো অর্থ আছে।. গভীর দুঃখের মূল্য যে আমরা দিই তার পরিবর্ত্তে কেবলি শূন্যতা এমন কথা মনে করা যায় না। প্রিয়জনের জীবিতকালেও তো আমরা অনেক দুঃখ অনেক উপলক্ষ্যে তার জন্যে স্বীকার করে থাকি। সেই স্নেহের শেষ দুঃখদান দিতেই হবে। সেই দেওয়া ব্যর্থ না হোক্।
ইতি ৩০ কার্ত্তিক ১৩০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৯১ সাল। আমি কটকে থাকি। জানুআরি মাসের প্রথম সপ্তাহে, বোধ হয় ৪ঠা, বুধবার কলিকাতায় প্রথেরো (Prothero) সাহেবের বাড়ীতে রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রথম দেখি। আমি সেবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। প্রথেরো সাহেব প্রধান পরীক্ষক। তিনি ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে মাদ্রাসা কলেজের সম্মুখের বাড়ীতে থাকিতেন। সে বাড়ী মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপালের জন্য গবর্মেণ্ট ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমি মাদ্রাসা কলেজে দুই বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে বাড়ীটি আমার জানা ছিল। গাড়ী-বারান্দার উপরের ঘরে প্রথেরো সাহেব বসিয়া ছিলেন। আমি উপরে উঠিয়া দেখি, পেণ্টুল-চাপকান-পরা, কপাট-বক্ষ, সংহতপেশী, সপাট-পাণ্ডুর-মুখমণ্ডল, অপরিস্ফুট-গুম্ফ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ক্ষণমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নামিয়া গেলেন। প্রথেরো সাহেবের সহিত দুই-চারিটা কথার পর আমিও চলিয়া আসিলাম। পথে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কে? ইহাঁকে ত বাঙ্গালী মনে হইতেছে না! তৎকালে প্রবেশিকা-পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের চারিজন মাত্র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাঁদের নাম জানিতাম। বুঝিলাম, তাহাঁদের মধ্যে ইনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাহাঁর সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় তিনবারের অধিক হয় নাই, কিন্তু পত্র-ব্যবহার অনেক হইয়াছিল।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিষৎপত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি আমার নাম সদস্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন। পত্রিকায় দেখি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের যত্ন হইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০১ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিচার্য বিষয় তিনিটি— (১) বিজ্ঞানে পরিভাষার প্রয়োজন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা নির্মাণ-বিধি। এই তিন বিষয়ে তাহাঁর আলোচনা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী, কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নবীনের অনুরাগী। তাহাঁর ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল; বাগ্‌রীতি প্রসন্ন। পরে তাহাঁর নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তাহাঁর হস্তাক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহাঁর চিন্তাপ্রবাহ দ্রুত প্রধাবিত হইত; তাহাঁর লেখনী অনুসরণে অসমর্থ হইয়া বাংলা সকোণ অক্ষরকে তরঙ্গে পরিণত করিত। এতদ্দ্বারা তাহাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য প্রমাণিত হয়। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধ রচনাকালে তাহাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর, রিপন কলেজে কিমিতি ও ভূতবিদ্যার শিক্ষক। তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, আমি কটক কলেজে থাকি।

এই প্রবন্ধে তাহাঁর যে বিচার-ক্রম ও ভাষা-বিন্যাস দেখিতে পাই, তাহা পরবর্তীকালে রচিত তাহাঁর যাবতীয় গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিদ্যমান। আমার দৃষ্টিতে তাহাঁর রচনার দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল—

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ - ১৯১৯

(১) পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই প্রাচীনপন্থী, কদাচিৎ নবীনের প্রতি স্নেহশীল ; মনে হয়, যেন দুইটি বিপরীত শক্তি তাঁহার মনের মধ্যে কাজ করিত। (২) তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তিনি পুনরুক্তি করিতেন। তাঁহার 'বৈজ্ঞানক পরিভাষা' প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল। একবার তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য অঙ্কিত হয় না।" এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি মনে করি, তাঁহার অনুসৃত পন্থায় পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্কিত হয় না। পাঠক একপ্রকার আবছায়া পান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে প্রকৃত তথ্য বলিতে পারেন না।

তাঁহার "যজ্ঞকথা" পড়িলে তাঁহার পাণ্ডিত্য সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। পাঠক বুঝিতে পারেন না, বৈদিক যজ্ঞকর্মের তুল্য দুরবগাহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে না পারিলে সে রত্ন উদ্ধৃত হইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করিবার সময় তাঁহাকে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইয়াছিল। সে অল্পদিনের পরিশ্রমসাধ্য নয়। আমি এক এক সময় ভাবি, তিনি কবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন, কবে অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত করিলেন ? এফ্-এ পড়িবার সময় তাঁহাকে সংস্কৃত কাব্য পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় রঘুবংশের প্রথম চারি সর্গ ও ভট্টির দুই সর্গ মাত্র পড়িয়া থাকিবেন। এতৎসত্ত্বেও আমি বলিব, তাঁহার "যজ্ঞকথা" আরও অল্প কথায় বলিতে পারা যাইত।

তাঁহার "বিচিত্র জগৎ" বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। কঠিন বিষয় এত সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করা অল্প সাধনার ফল নয়। একই ভাব, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেন, তথাপি মনে হয় যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। আমি তাঁহাকে ব্যাখ্যাতৃশ্রেষ্ঠ মনে করি।

তাঁহার "জিজ্ঞাসা"র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণকে তিন ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগ, যাঁহারা বিজ্ঞানের একটি শাখা লইয়া থাকেন এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সেই শাখায় গবেষণা করিয়া নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহারা নিম্নশ্রেণীর হইলেও, ইঁহারা না থাকিলে অন্য দুইশ্রেণীর উদ্ভব হইতে পারিত না। যাঁহারা হাইড্রোজেন বম্ নির্মাণ করিতেছেন, তাঁহারাও এই শ্রেণীর। এইরূপ, যাঁহারা প্রকৃতির এক এক দিক্ পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য সামান্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সমবেত কর্মেই বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ, যাঁহারা সংগৃহীত তথ্য বর্গে বর্গে সাজাইয়া বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাঁহারা লোকরঞ্জন ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করেন। ইঁহাদের দৃষ্টি সর্বদিকে থাকে বলিয়াই বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারে যোগ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ পাঠককে রচনায় প্রলুব্ধ করিতে হইবে। লেখক নিজেকে প্রশ্ন করিবেন, অপরে

কেন তাঁহার রচনা পাঠ করিবে ? সাধারণ পাঠক উদাসীন। ইহাঁরা মধ্যম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। ইংলণ্ডে হাক্সলেকে এই শ্রেণীতে বসাইতে পারা যায়। বঙ্গদেশে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন।

তৃতীয় ভাগ, যাহাঁরা সমগ্র বিজ্ঞান-বৃক্ষের যাবতীয় শাখা অবলোকন করিয়া এক সূত্র অন্বেষণ করেন, অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়া দেন। ইহাঁরাই প্রকৃত দার্শনিক। ইহাঁরা সংখ্যায় অত্যল্প। ডারবিনের 'পরিণামবাদে' আমাদের চিন্তাধারায় এক শৃঙ্খলা আনিয়া দিয়াছে। আমরা সদ্‌বস্তুর পরিণামী উৎপত্তিক্রম স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত 'মাধ্যাকর্ষণ' এক্ষণে আরও প্রসারিত হইতেছে বটে, কিন্তু মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে জীব ও অ-জীবের একটা পার্থক্য-লক্ষণ ক্ষীণ হইয়াছে; মনে হয় যেন অ-জীবেরও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রকারগণের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের অতীত আমাদের দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যাহা আমাদের দেশে ছিল, যাহা এখনও আছে, তাহার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দর অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। তাহাতে হস্তার্পণ করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) তিনি 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের পরিভাষার গুণে সে বিদ্যার এত উন্নতি হইতে পারিয়াছে। তৎকালে জ্ঞাত ৭০টা মূল পদার্থের সংস্কৃত-মূলক দেশীয় নাম সৃষ্টি করিলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা সুসাধ্য হইবে না। তথাপি তিনি ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজী নামের ইতিহাস সঙ্কলন ও সংস্কৃত নাম উপন্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের কেহ কেহ অতিশয় কুতূহলী হইয়াছিলেন। তিনি ক্লোরিনের নাম 'হরিণ' রাখিয়াছিলেন; অক্সিজেনের নাম 'দহন বায়ু', অক্সাইড 'দগ্ধ'। অতএব Chlorous anhydride 'দগ্ধ হরিণ'। ডক্টর পি. সি. রায় স্বদেশী নামের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্রদের জন্য "সরল রসায়ন" লিখিয়াছিলাম। তাহাতে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি ইংরেজী নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ডক্টর রায় প্রবাসী পত্রিকায় সে পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ?"

স্বদেশী ভাষার এতবড় অনুরাগী হইয়াও তিনি 'দগ্ধ হরিণ' শুনিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। পরে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই বুঝিয়াছিলেন, সে পরিভাষা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "শব্দকথা"র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, কাগজ কলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পরিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অনুবাদকের হাতে।" এখানে তিনি নিজমত প্রত্যাখ্যান করিয়া উদাসীন হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। পরিভাষা নির্মাণ গ্রন্থকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে পাঁচজন গ্রন্থকার পাঁচপ্রকার পরিভাষা করিয়া বসিবেন। পরিভাষার ঐক্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়জ্ঞান ভাষাজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান একাধারে সকল গ্রন্থকারের কিম্বা অনুবাদকের থাকে না। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত এক

সংসদ নিযুক্ত করিয়াছেন। উচিত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ভারত পূর্বের ন্যায় প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত নয়। সকল রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া পরিভাষা-সমিতি গঠন না করিলে সর্বভারতীয় পরিভাষা নির্মিত হইবে না।

তৎকালে স্বদেশী ভাষায় বিদেশী নামের অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ইউরেনস গ্রহকে ইন্দ্র বলা হইবে কি বরুণ বলা হইবে, এইরূপ চিন্তায় কয়েকজন বিদ্বান্ অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই ব্যবহারিক জগতের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। এই মনোবৃত্তির কারণ বুঝিতে পারা যায়। আমরা পরপদানত, আমাদের মানসম্ভ্রম কিছুই নাই; কিন্তু আছে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য। আমরা যেমন তেমন জাতি নহি। ইংরেজী নামের বঙ্গানুবাদ করিয়া এই আত্মতৃপ্তি লাভ হইত। আমি স্বভাবে প্রাচীনের অনুরাগী হইয়াও ব্যবহারে কল্যাণকর নবীনের পক্ষপাতী ছিলাম। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা সম্বন্ধে আমি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুমোদিত বিধি স্মরণ করাইয়াছিলাম। বিজ্ঞানে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া —এই তিনপ্রকার নামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্রব্য নামে, দ্রব্যের নির্মাতা কিম্বা আবিষ্কর্তার প্রদত্ত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। গুণ ও ক্রিয়ার বাচক শব্দ সঙ্কলন অথবা নির্মাণ করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে ইংরেজী শব্দই রাখিতে হইবে। নূতন শব্দ রচনার সময় দেখিতে হইবে, যেন সেই শব্দের মূল ধাতু হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ পাইতে পারি। তৎকালে এবিষয়ে একা আমি একদিকে এবং অপর বিজ্ঞান-সেবিগণ অন্যদিকে ছিলেন। এখন সে পুরাতন মোহ গিয়াছে। বিজ্ঞান-প্রচারের সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ পরিভাষা সঙ্কলনে সবিশেষ যত্নবান্ আছেন।

(২) ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমার "বাঙ্গালা ভাষা" নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্‌যোগী হন। উক্ত পুস্তকের প্রথমভাগের উপক্রমণিকায় বাংলা ভাষার দোষ-গুণ বিচার করিয়া লিখিয়াছি, বাংলাভাষা শিক্ষা সহজ কিন্তু বাংলা অক্ষর শিক্ষা সহজ নহে। আর, যুক্তাক্ষর লিখিতে ও শিখিতে অযথা পরিশ্রম করিতে হয়। যদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অক্ষরগুলি দেখিতে পাই, তাহা হইলে সে কষ্ট থাকে না। শুধু সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর নয়, সংযুক্ত স্বরাক্ষর সংযোগের নিমিত্তও দ্বিবিধ, ত্রিবিধ আকার শিখিতে হয়। যথা গু, রু, রূ, হু ইত্যাদি। আমাকে বহু সাহিত্যিক উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বানান ও অক্ষরের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। আমি বানান পরিবর্তন করিতে চাহি নাই, সংযুক্ত অক্ষর স্পষ্ট দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। একা রামেন্দ্রসুন্দর ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে আমি সাহিত্যপরিষৎকে গোটা দশ-বার নূতন অক্ষর করাইতে অনুরোধ করি। তৎকালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক চিঠিতে তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা নির্গলিত হইয়া পড়িত। তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে আমার "বাঙ্গালা ভাষা" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সংযুক্তাক্ষরের আকার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার দুই যুক্তি ছিল।

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের দুইভাগ শিখিতে ছেলেদের তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কষ্ট বোধ করেন নাই।

(২) অক্ষরের আকারের সহিত ইতিহাস জড়িত আছে। আকার পরিবর্তন করিলে ইতিহাস ছিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব যেমন আছে, তেমনই থাক।

আমি উত্তর করিয়াছিলাম, "আপনি আপনার সহিত অন্য বালকদের তুলনা করিতেছেন? আমি দেখিয়াছি, আমার ওড়িয়া বন্ধুরা স্বচ্ছন্দে বাংলা পড়িয়া যান, কিন্তু সংযুক্তাক্ষর লিখিতে পারেন না। আর, ভাষা-শিক্ষার এই কণ্টক দূরীভূত না হইলে বাংলা ভাষার প্রসার হইবে না। আপনি যে অক্ষরের ইতিহাস লোপের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাও বৃথা। কারণ, অসংখ্য পুস্তক বর্তমান অক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পুথীর অক্ষর দেখিলেই বুঝি, স্বাভাবিক ক্রমেই কোন কোন অক্ষর পরিবর্তিত হইয়াছে।"

তিনি আর তর্ক করিলেন না। কিন্তু আমার পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ যখন মুদ্রিত হইয়া আসিল, তখন দেখি, আমার অনভিপ্রেত অক্ষরও আসিয়াছে। আমি অ লিখিয়া পৃথক্ মাত্রা দিই। সেটা কিছু নয়, লেখার দোষ। ছাপায় দেখি, অ-এর মাথায় একটা পৃথক্ মাত্রা আছে।

আমাদের প্রাচীনকালের কোন তথ্যের সন্ধান পাইলে রামেন্দ্রসুন্দরের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ষে বর্ষে এক একস্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করিতেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহীতে সম্মেলন বসিবে। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার। আমি তখন কটকে থাকি। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমায় আহ্বান করিলেন। আর, সম্মেলনে পাঠের নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ চাই, নির্বন্ধ-সহকারে পত্র লিখিলেন। ডক্টর পি. সি. রায় সম্মেলনের সভাপতি। তিনিও একটি প্রবন্ধের নিমিত্ত আমায় পত্র লিখিলেন। কিন্তু আমার অবসর কোথায়? বিশেষতঃ, বঙ্গের সুধীগণের শ্রবণোপযোগী প্রবন্ধ রচনাও সহজ কাজ নয়। আমি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলাম, আমি যাইতে পারিব না, উপস্থিত প্রবন্ধও পাঠাইতে পারিব না। তিনি শুনিলেন না, পুনর্বার পত্র লিখিলেন। তাঁহার পুনঃপুনঃ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না, লজ্জা হইতেছিল। এদিকে সম্মেলনের নির্ধারিত দিবস নিকটবর্তী হইয়াছে। আমি "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের নিমিত্ত 'স্বয়ংবহ যন্ত্র' লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; প্রকাশ করি নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই প্রবন্ধ রাজসাহী-সম্মেলনের ঠিকানায় পাঠাইলাম। মধ্যাহ্ন কাল। সম্মেলন বসিয়াছে। রেজেষ্টরি ডাকে আমার 'স্বয়ংবহ' উপস্থিত হইল। তাহার পর কি হইয়াছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কলিকাতা হইতে তিনি আমাকে ১৩১৫।১৭ মাঘ তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

"রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে ১৯।২০টি প্রবন্ধ জুটিয়াছিল। সময়াভাব হেতু অন্যান্য অনুপস্থিত লেখক-গণের প্রবন্ধের সহিত আপনার প্রবন্ধটিও 'পঠিত করিয়া গৃহীত' হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সভাপতি ডক্টর পি. সি রায় হঠাৎ আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়িতে দেওয়ায় আপনার প্রবন্ধটি ঐ বিপৎ হইতে রক্ষা পায়। অন্যের নিকট যাহাই হউক, প্রবন্ধমধ্যে আমার শিক্ষার বিষয় অনেকগুলি ছিল। আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা যে perpetual motion ঘটাইবার এত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার আমি বিন্দু-বিসর্গ জানিতাম না। আমি প্রবন্ধ পাঠ মাত্র আনন্দের সহিত প্রবন্ধটি সভায় পড়িয়া শুনাইবার ভার গ্রহণ করি এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুগ্রহে মূল প্রবন্ধের টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য করিবার অধিকারও পাইয়াছিলাম। Black-board ও chalk ইত্যাদি সরঞ্জাম পাওয়ায় কিছুক্ষণ মাষ্টারি করিবার অবকাশও পাইয়াছিলাম। আপনার প্রবন্ধ সভাস্থ সকলেরই, এমন কি রাজসাহী কালেজের অধ্যাপকবর্গেরও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শুনিলে আপনি প্রীত হইবেন।

"'স্বয়ংবহ' শব্দটি কি আপনার? না সিদ্ধান্তকারগণের? 'দণ্ড' ও 'ঘটিকা' শব্দের অর্থ লইয়া আপনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আমার অত্যন্ত মনে লাগিয়াছে।

"সভাপতি মহাশয় আপনার প্রবন্ধ সভাস্থলে উপস্থিত করিবার সময় আপনাকে "সর্বশাস্ত্রজ্ঞ" উপাধিযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতই আপনার বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন বিস্মিত হইতেছি।

"স্বয়ংবহযন্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া টীকা-সমন্বিত একটি বৃহত্তর প্রবন্ধ লেখা চলে না কি? চলিলে diagram সহ পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিতে পারি। পরিষৎ-পত্রিকা এতকাল প্রাচীন সাহিত্য লইয়া মগ্ন আছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিতেছেন।"

'স্বয়ংবহ' নাম আমার রচিত নয়, সিদ্ধান্তের। সাধারণ স্বয়ংবহ যন্ত্রে perpetual motion নাই। ইহাকে automatic clock বলিতে পারি, যদিও জানি ঘড়ী স্বয়ংবহ নহে। পশ্চিমদেশের বিদ্বানেরা বুঝিতে পারেন নাই; আমাদের প্রাচীনেরা সদাগতির কল্পনায় ভ্রান্ত হইয়াছিলেন—এই বলিয়া তাঁহারা উপহাস করিয়াছেন। ১৩১৫ চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমার স্বয়ংবহ-প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরকে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয় না। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পরিষদের উন্নতি ও উত্তরোত্তর গৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে কত যত্ন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়, পরিষদের তুল্য প্রিয় সামগ্রী তাঁহার আর কিছু ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র মনে করিতেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৫) বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের নির্বন্ধে সাহিত্য-সম্মেলন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল,—সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখাপতি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখাপতি, শ্রীযদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখাপতি এবং আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি মনোনীত হইয়াছিলাম। মহাসমারোহে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এক বৃহৎ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং দুইটিই আমাকে করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত বাংলা ভাষা পঠন ও পাঠন প্রবর্তিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা করা হউক। দ্বিতীয় প্রস্তাব, পঞ্জিকা-সংস্কার সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির স্থাপিত হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা প্রেরণ সোজা কথা, কিন্তু জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সোজা কথা নয়।

সে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর পীড়িত। বর্ধমান যাইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি হইতে সম্মত হইয়াছিলাম। সম্মেলনের পর তিনি আমায় কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন (১৩২২। ৯ বৈশাখ)—

"একই দিনে আপনার দুইখানি চিঠি পাইয়া বুঝিলাম, আপনি টোপ গিলিয়াছেন। এতকাল নির্জনে তপোবনে লুকাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন লোক-সমাজে ধরা দিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাকে ঠিক ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তুলনা করিবার দরকার নাই; তবে বুদ্ধিমান্ লোকে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা আপনার

কাজ করাইয়া লইয়াছিল, আপনিও যখন ধরা দিয়াছেন, তখন আপনার দ্বারাও আমাদের কাজ করাইয়া লইব, তাহার ভরসা হইতেছে।

"সাহিত্য-সম্মেলনের বন্দোবস্ত এবার খুবই ভাল হইয়াছিল, সহস্রমুখে একবাক্যে তাহা শুনিতেছি। কাজের দিকের খবর অন্যে বড় একটা দেন নাই। আপনি যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম, আপনি উহার শাদা-কাল দুইটা দিকই দেখিয়াছেন। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। বলিতে গেলে বোধহয় এক দিস্তা কাগজে কুলাইবে না।"

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা আমার অভিভাষণের বিষয় ছিল। বিষয়টি তাঁহার প্রিয়, কিন্তু তাঁহার কল্পিত পথ হইতে আমি কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে গিয়াছিলাম। বোধহয়, সেই কারণেই তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে এক দিস্তা কাগজ লাগিবে।

বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ১৩২২। ১৬ ভাদ্র তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"মান-মন্দির সম্পর্কে আপনার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই পড়িয়াছি। বেধালয়ের আবশ্যকতা এবং পঞ্জিকা-সংস্কারের উপযোগিতা আপনি যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে যদি কেহ না বুঝে, তাহা হইলে গত্যন্তর নাই। ·· কলিকাতার হাওয়া বেধকর্মের উপযোগী নহে। শীতকালের আকাশে মোটা মোটা তারাগুলাও দেখা যায় না। মফঃস্বলে স্থান মিলিতে পারে, কিন্তু লোক মিলিবে না। ·· পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য, উভয় মত জ্যোতিষিক গণনার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারেন এবং তদনুসারে গণকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ লোক ত দেখিতেছি না। কালেজের অধ্যাপকদের মধ্যে এক আপনি আছেন, তদ্‌ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না। ·· আমাদের অধ্যাপক ভ্রাতারা যে সময়টা তারকা-পর্যবেক্ষণে নিয়োগ করিবেন, সে সময় মানের বহি লিখিলে বেশী কাজে আসিবে। এ সঙ্কল্প বিষয়ে আমার অধিক ভরসা নাই। আপনি নিজে কর্মী, আপনি স্বয়ং যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে আশা আছে।"

পুনশ্চ ১৩২২। ৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আপনার মান-মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। ·· কিন্তু জিনিসটা আদৌ গড়িয়া উঠিবে কিনা, সন্দেহ। কাশিমবাজারের মহারাজা মাসিক ব্যয় দিবেন কিন্তু মন্দির ও যন্ত্রাদির জন্য ব্যয় সম্বন্ধে আমার ঘোর সংশয় আছে। বর্ধমান বা অন্য কেহ খরচ দিলেও উহা আদায় করিয়া জিনিসটা গড়িয়া লইবার উদ্‌যোগী লোকের অভাব। আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। বড়লোকে টাকা দেন, কিন্তু কেহ উদ্‌যোগ করিয়া হাত পাতিয়া না লইলে টাকা আদায় হয় না। ·· অভাব কেবল মানুষের। কর্মী মানুষ নাই, এবং কর্মে প্রেরণের জন্য পিছনে যে বাতিক থাকা আবশ্যক, সেই বাতিকও কাহারও নাই। ঔদাসীন্যে কত কাজ যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ব্যথা পাইতেছি মাত্র।"

রামেন্দ্রসুন্দরের অনুমানই ঠিক হইল। প্রস্তাবিত মান-মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিবার লোক পাওয়া গেল না। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমায় তিনখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষের অভাব। তদবধি ৪০ বৎসর হইয়া গেল, কিন্তু উদ্‌যোগী মানুষের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

১৩২২ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর বর্ধমান-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পূর্বেও দুই বৎসর যাইতে পারেন নাই। ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত হয়। তিনি আর পূর্বের

স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তিনি পরে যে সকল পত্র লিখিতেন, সে সকল পত্র তাঁহার অস্বাস্থ্যের বিবরণে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাঁহার সরস চিত্ত কখনও রসহীন হইত না। একবার লিখিলেন, "আমি কয়েক দিন শয্যাগত ছিলাম। আমার হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুগণ আমাকে স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মুখভঙ্গী ও মাথানাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা আমার যকৃতে বিস্ফোটক আশঙ্কা করিয়া শস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি সম্মত হইলাম না। যদি অকালে যম-সদনে যাইতে হয়, অক্ষত দেহেই যাইব। গতকল্য অপরাহ্ণে এক হোমিওপাথিক ডাক্তার-বন্ধু আসিলেন। তিনি একবিন্দু জলপান করাইয়া গেলেন আর আমি আজ সকালে বিছানায় বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি।"

আর একবার লিখিলেন, তাঁহার পত্নীর বস্ত্রাঞ্চলে কেরোসিন দীপের অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল; কোন ক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৯১৪।২ আগষ্ট তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন (তখন তিনি ভাল ছিলেন), "·· আরও ভাল হইবার আশায় কালেজে দেড় মাসের ছুটি লইয়া গঙ্গায় নৌকাযাত্রা করি। আশা ছিল, গ্রীষ্মের অবকাশটা জড়াইয়া চারিমাস গঙ্গাবাসে সুস্থ হইব। মার্‌চ্‌ মাসটা নৌকাতেই গঙ্গাবক্ষে কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু গঙ্গামাতা বক্ষে স্থান দিলেন না। একদিন রাত্রিকালে মাঝ-গঙ্গায় কালনার নিকটে নৌকায় আগুন লাগিল। মাঝিরা আগুন নিভাইতে পারিল না। সস্ত্রীক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। জল ঘটনাক্রমে অল্প ছিল, কাজেই গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না। নতুবা এতদিন চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইতাম। নৌকা-খানার সমস্ত উপরের অংশ আমার জিনিসপত্র সমেত পুড়িয়া গেল। নিকটে নির্জন চড়া, সেখানে আশ্রয় লইলাম। ঘটনাটা কালনার নিকটে। কালনার দুইটি ভদ্রলোক ডিঙ্গি করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। গোলমাল ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া সে রাত্রি আশ্রয় দিলেন। পরদিন ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসি।

"এই ঘটনা অবলম্বনে দিব্য একখানি নবেল হইতে পারে। আপনার নবেল লিখিবার ক্ষমতা আছে কি না, সে পরিচয় এখনও পাই নাই। আর সকল সাহিত্যেই ত ধরা দিয়াছেন; আমি মসলা দিলাম, একবার নবেল লিখিবার চেষ্টা করিতে পারেন।"

তাঁহার এইরূপ পুনঃপুনঃ বিপৎপাতের সংবাদে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাঁহার বর্ত্তমান দুঃসময় আর কতদিন চলিবে। ফল-জ্যোতিষ ইহার উত্তর দিতে পারে। তখন আমার নিকটে পণ্ডিত ঘনশ্যাম মিশ্র নামে এক নিপুণ ফল-জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ওড়িয়া-অক্ষরে লিখিত "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" পড়িয়া আমায় শুনাইতেন। আমি নিজে ফল-জ্যোতিষ শিক্ষা করি নাই। প্রয়োজন হইলে মিশ্র-মহাশয়কে দিয়া গণাইতাম। আর সে প্রয়োজনের হেতুও ঘটিয়াছিল। সাধারণ লোকে জ্যোতিষের গণিত-ভাগ ও ফল-ভাগ অভিন্ন মনে করে। আমি গণিত-জ্যোতিষ চর্চা করি; লোকে মনে করিত, আমি ফল-জ্যোতিষও জানি। সেই ভ্রম এখনও চলিতেছে। বিজ্ঞলোকে আমার নিকটে তাঁহাদের কোষ্ঠী পাঠাইয়া দেন।

আমি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলাম, "আপনি আমাদের ভাগ্যের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ পান না, কোষ্ঠী-গণনায় বিশ্বাস করেন না। আমিও করি না। কিন্তু দেখিয়াছি, কোন কোন ঘটনা মিলিয়া যায়; বিশেষতঃ অগ্নিদাহ, জলডুবি ইত্যাদি। তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকুজী পাঠাইবেন।"

দিনকয়েক পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পার্সেল পাইলাম। পোষ্টকার্ডে রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষক লিখিতেছেন—"আপনার পত্র মা [রামেন্দ্রসুন্দরের পত্নী] দেখিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশে আমি এই পত্র লিখিতেছি ও কোষ্ঠী পাঠাইতেছি। আপনি কোষ্ঠীখানা উত্তমরূপে দেখিয়া জানাইবেন, উপস্থিত রোগ হইতে কোন ভয় আছে কি না।"

আমি মিশ্র-মহাশয়কে কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল ও রাশিচক্র তুলিয়া দিলাম। তিনি ফল বিচার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা অবিকল লিখিয়া লইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষকের নামে পাঠাইলাম। তাহাতে ছিল, ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার অজীর্ণ-জনিত পীড়া হইবে এবং উপস্থিত রোগ হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই। দৈবক্রমে আমার পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে পড়িয়াছিল। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন (১৩২১। ৪ আশ্বিন)—

"কোষ্ঠীর ফল দিন-তারিখ ধরিয়া যতটা দিয়াছেন, তাহাতে কোষ্ঠী-গণনায় প্রায় বিশ্বাস হইবার উপক্রম হইয়াছে। · · অজীর্ণ-রোগে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তারিখটা অত্যন্ত মিলিয়াছে। এ অবস্থা কত দিন টিকিবে, তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ, সেটা শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই বলেন নাই। যাহা হউক, কৌতূহলটা যখন জাগাইয়া দিলেন, তখন পরিণামটা সম্বন্ধে কোষ্ঠী কি বলেন এবং কর্মভোগ কতদিন চলিবে, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।"

পুনশ্চ ১৩২১। ২৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমার কোষ্ঠীখানি লইয়া আপনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে কোষ্ঠীর ফলাফলের সহিত কতদূর আমার অবস্থা মিলিল, তাহা জ্ঞাপন করা কর্তব্য বোধ করিতেছি। আপনার ইহা কাজে লাগিতে পারে।

"সাধারণ ফল :—

'সুন্দর, প্রিয়ংবদ, ধর্মরত, বিদ্বান্, শৌর্য-বীর্যে খ্যাতিমান্'—ইত্যাদি বিষয়ের বিচার-ভার আপনাদের উপর। শৌর্য-বীর্যের বিশেষ পরীক্ষা কখনও হয় নাই। জর্মনির সহিত লড়াইয়ে যদি সরকার বাহাদুর ঠেলিয়া পাঠান, তাহা হইলে পরীক্ষা হইতে পারে।"

ইত্যাদি-ক্রমে তিনি কোষ্ঠী-গণনার ফল কতদূর সত্য হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার জন্ম-কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল উদ্‌ধৃত করিলাম এবং সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গণিয়া তাৎকালিক গ্রহস্থিতি দিলাম। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

জন্মকাল : ১৭৮৬।৪।৪।৫৩।৩৩ ॥

ভাদ্রস্য পঞ্চম দিবসে শনিবারে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ রাত্রৌ সপ্তত্রিংশৎ পলাধিক একবিংশতি দণ্ডাভ্যন্তরে শুভ কর্কটলগ্নে (লগ্ন স্ফুট রাশ্যাদি ৩।০।২১।১৬) ॥

তাৎকালিক স্ফুটগ্রহা :—

র ৪।৫।১৯, চ ১১।১৪।২৯, ম ১।১।১, বু ৫।৩।১৩, বৃ ৬।২৮।৫৬, শু ৪।১৬।১৭, শ ৫।৩২।৩২, রা ৬।২২।১৯, কে ০।২২।৩৯।

ইহার পর তিনি কয়েক বৎসর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। ১৩২১। ৫ ফাল্গুন তারিখের পত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন—

"আপনার শব্দকোষ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' পড়িলাম। শব্দকোষে আপনাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না, ইহা আমার দুর্ভাগ্য। যাহা হউক, আপনি যাহা খাড়া করিয়া দিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বাংলা কোষ রচনার পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকিল। ··এ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বাংলা অভিধান এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে প্রস্তুত করেন নাই। আপনার পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ গৌরবান্বিত হইল। আমার এই আনন্দ যে, আমি না থাকিলে হয় ত পরিষদের সহিত আপনার গ্রন্থের এই সম্পর্কটুকু ঘটিত না।"

কি উপায়ে জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারিবে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারিবে, এই চিন্তা অনেকের মনে জাগিয়াছিল। এক্ষণে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ সে চিন্তা করিতেছেন এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রে যথাসাধ্য বিজ্ঞানপ্রচারে যত্নবান্ আছেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অনুরাগী হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্যেরা উদাসীন থাকিতেন। তৎকালে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যল্প শিক্ষিতের শ্রদ্ধা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ও আমি বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কেহ কেহ দয়া করিয়া পড়িতেন, কেহ বা পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল তথ্য প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম। এ বিষয়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, সে-সব কথা এখানে উত্থাপন করিব না। মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যা পাঠ্য ছিল। কিন্তু ছাত্রদিগকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইত, শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রবেশিকা-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িতে হইত। Blandford's *Physical Geography* বইখানি ভাল, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের মত পড়ান হইত। তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা কলেজে পড়িত, তাহারা ইংরেজীতে শিখিত, বাংলায় পড়িবে কেন? অতএব যদি দেশে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে লোক-রঞ্জন ভাষায় বিজ্ঞানের স্থূল তথ্য বুঝাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক নয়, কোন একটা শাখার আদ্যন্ত নয়, তাহার সারমর্ম পারিভাষিক শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে ফল হইতে পারে। কিন্তু কোন উদ্‌যোগী প্রকাশক ছিলেন না।

একদিন রামেন্দ্রসুন্দর আমায় লিখিলেন, "বাংলায় এক এক বিষয়ের ছোট ছোট বই লিখিতে হইবে। কোন বই ১৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, দাম আট আনা। পাইকপাড়ার রাজা মহাশয় অরুণচন্দ্র সিংহ সে-সব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রেস আছে। এখন বই লিখিয়া যোগাইতে পারিলে হয়। এই নিমিত্ত এক সম্পাদক-সংসদ করিতে হইবে। আপনি প্রধান। আপনি, আমি ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূ-বিদ্যার শিক্ষক), এই তিনজনে মিলিয়া পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাদের মনোনীত হইলে রাজা-বাহাদুরের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।"

আমি লিখিলাম, "আমি দূরে থাকি, আপনারা দুইজনে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া, যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজন মনে করেন, আমার নিকটে পাঠাইবেন।" তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমার নিকট হইতে দুইখানি বই চাহিলেন। একখানি বিজ্ঞানের ভূমিকা, অপরখানি জ্যোতির্বিদ্যা। প্রথম খানি অন্য প্রয়োজনে আমি ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা সেইখানাই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। হেমবাবু ভূ-বিদ্যা সম্বন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে লিখিবেন। অপর কৃতবিদ্য

লেখকও আহ্বান করা হইবে। তাঁহারা এই সংসদের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন। দুই-তিন পরিচ্ছেদ লিখিয়া সংসদের সম্মতি পাইলে অপর পরিচ্ছেদ লিখিবেন। তাঁহারা দুইশত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

যে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রস্তাব করেন, সে সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শরীর ভগ্ন হইতেছিল। মন নানা হিতকর কর্মের প্রতি ধাবিত হইত। কিন্তু শরীরে কুলাইল না। আমার নিকটে আর পত্র আসিল না।

ভাস্করাচার্য কয়েকটি জ্যোতিষিক যন্ত্র বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, সকল যন্ত্র অপেক্ষা ধী-যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। রামেন্দ্রসুন্দর ধী-যন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যে-কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয়েক-বৎসর তাহার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার আসন শূন্য রহিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[২]

৯ই অক্টোবর ১৯২৭, রবিবার। গত রাত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা হ'ল, মশার উৎপাত প্রচুর। ফ্যা-থাই প্রাসাদ হোটেল, রাজপ্রাসাদ আর আধুনিক সমস্ত সুখ-সুবিধায় সম্পূর্ণ হ'লে কি হবে, মশা আট্‌কাবার উপায় নাই। মশারী ফেলে শুয়েও মশারীর বাইরে আমরা প্রত্যেক ঘরে গোল-ক'রে-জিলেপি-পাকানো সবুজ চীনা ধূপ জ্বালিয়ে' রেখেছিলুম। আমরা খুব ভোরেই উঠে প'ড়লুম—নোতুন দেশ, ঠাঁই-নাড়া হ'লে রাত্রে ভালো ঘুম তো সব সময়ে হয় না। কবি অবশ্য তাঁর অভ্যাস-মতন খুবই ভোরে অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে ওঠেন। দেখা হ'তেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি হে, কাল রাত্রে মশায় কষ্ট দিয়েছে?" বোধ হয় তাঁর কাছে মশার ঐক্যতান সঙ্গীত প্রীতিকর লাগে নি।

সকালে যথারীতি শোবার ঘরে bed tea দিয়ে যায়, আমার ও-ভাবে 'উপ-প্রাতরাশ' খাবার অভ্যাস নেই। আমি সঙ্গে শ্যামী ভাষার ব্যাকরণ দুখানি এনেছিলুম—একখানি ইংরিজিতে আর খানি জরমানে, সেই দুখানি বার ক'রে, শ্যামী ভাষা নয়, বর্ণমালার বর্ণগুলি আয়ত্ত কর্‌বার কাজে লেগে গেলুম। শ্যামী বর্ণমালা, দক্ষিণ ভারতীয় কোনও বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। বর্মী অক্ষর সব গোলাকার, শ্যামী অক্ষর চৌকো আকারের। অশোকের যুগের ব্রাহ্মী, গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী, বাঙলা, নাগরী, তমিল প্রভৃতি বর্ণমালার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তার পক্ষে শ্যামী লিপির সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে দেরী লাগে না। অনেক অক্ষরের চেহারা থেকে আবার দর্শন-মাত্রেই ভারতের এক বা একাধিক অক্ষরের সঙ্গে তাদের সংযোগ চট্‌ ক'রে ধরা যায়। শ্যামী ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে; ওদের উচ্চারণে সে-সব সংস্কৃত শব্দ ধরা কঠিন হ'য়ে পড়ে আমাদের কাছে, কিন্তু বানান ঠিক মূল সংস্কৃতের মতই রাখে, তাতে হাত দেয় না। সুতরাং উচ্চারণে যাই হ'ক না কেন, শ্যামী ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দ শ্যামী লিপিতে আমাদের মতন ক'রে প'ড়ে অর্থগ্রহণ ক'রতে কোনও বাধা নেই। কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত বর্ণের পরিবর্তন বা বিকার এদের মুখে হয়। সেই নিয়মগুলি অক্লেশে ধ'রে নিতে পারা যায়। মোটের উপরে, শ্যামী ভাষায় চারটী বর্গের প্রথম চারটী বর্ণ "ক, চ, ত, প" (এদের নিজেদের শ্যামী ভাষায় মূর্ধন্য ট-বর্গ নেই, সংস্কৃত আর অন্য ভারতীয় ট-বর্গের ধ্বনিকে এরা দন্ত্য ত-বর্গে পরিবর্তিত ক'রে নেয়) এদের মুখে হ'য়ে যায় "গ, জ, দ, ব"; দ্বিতীয় বর্ণ "খ ছ থ ফ" ঠিক থাকে, কিন্তু উদাত্ত বা চড়া সুরে উচ্চারিত হয়। তৃতীয় আর চতুর্থ বর্ণ "গ, ঘ; জ, ঝ; দ, ধ; ব, ভ", দ্বিতীয় বর্ণের মতই উচ্চারিত হয়,—"খ, ছ, থ, ফ", কিন্তু এখানে এই ধ্বনিগুলি অনুদাত্ত বা খাদে, নীচু সুরে উচ্চারিত হয়। অন্ত্য "গ্‌ দ্‌ ব্‌" হ'য়ে যায় "ক্‌, ত্‌, প্‌"; শব্দের শেষে হসন্ত "চ্‌ জ্‌, শ্‌, ষ্‌, স্‌", "ত্‌"-এর ধ্বনিতে বিকৃত হ'য়ে যায়; অন্ত্য "র্‌ ল্‌" হয়ে যায় "ন্‌"।

প্রথম অংশ কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৭ সংখ্যার "বিশ্বভারতী পত্রিকা"-তে প্রকাশিত হইয়াছিল—পৃ ৮৬-৯৬। ৮৮ পৃষ্ঠায় একটী ভুল আছে—রবীন্দ্রনাথের বলিদ্বীপ সম্বন্ধে কবিতাটী "মহুয়া"-তে প্রকাশিত হয়, "পূরবী"-তে নহে। পুরা কবিতাটী অবশ্য প্রথমে "প্রবাসী"-তে বাহির হইয়াছিল।

সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব (ব়—v বা w) সাধারণতই বাঙলা আর উত্তর ভারতের অন্য ভাষার মত, বিশেষতঃ শব্দের আদিতে থাকলে, বর্গীয় "ব" (b) হ'য়ে যায়, আর এই "ব" ও পূর্ব-লিখিত নিয়ম অনুসারে "ফ"-রূপে শোনায়। এ ছাড়া, স্বরবর্ণের-ও কতকগুলি খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের-ও আছে। উচ্চারণ-পদ্ধতিতে আরও ছোট-খাট অনেক নিয়ম আছে। ভাষার শব্দের উচ্চারণে tone বা স্বর (উদাত্তাদি স্বর)-ও থাকে—সে-সব কথার বিচারে এখন দরকার নেই। শ্যামীরা আজকাল যখন রোমান লিপিতে তাদের নাম পদবী প্রভৃতি লেখে, তারা সংস্কৃতের শুদ্ধ উচ্চারণ ধ'রে যে রোমান প্রতিবর্ণ করার রীতি আছে, কতকটা সেটাকে মানে, আর কতকটা নিজেদের উচ্চারণ ধ'রে, এই দুটীকে মিলিয়ে লেখবার চেষ্টা ক'রে। তাতে অনভিজ্ঞ বিদেশীকে একটু বিভ্রাটে প'ড়তে হয়। আজকালকার (১৯৫৩ সালে) প্রধান মন্ত্রীর নাম Bipul Songgram 'বিপুল সংগ্রাম' (সংস্কৃতে Vipula Sangrama; ইনি প্রথমটায় যুদ্ধের মন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই এঁর এই পদবী), উচ্চারণ কিন্তু Phibun Sonkhram 'ফিবুন্ সংখ্রাম', এখন রোমান হরফে Pibul Songgram-ও লেখা হয়। এখনকার রাজার নাম রোমান অক্ষরে লেখা হয় Aduldet Phumiphon, কিন্তু নামটী আসলে হ'চ্ছে সংস্কৃত Atula-tejas Bhumi-bala 'অতুলতেজাঃ ভূমিবল'—; 'অতুলতেজ্'-এর আধারে শ্যামী উচ্চারণ 'অতুল-দেৎ' গঠিত, আর 'ভূমিবল্' হয়ে গিয়েছে 'ফুমিফন্'। আমার নাম 'সুনীতিকুমার চাটুর্জ্যা' রূপে শ্যামী লিপিতে লিখে দেওয়ায়, শ্যামী বন্ধুরা প'ড়লেন 'সুনীদি-গুমান্ জাতুরাছি'। এইভাবে, শ্যামদেশে সংস্কৃত নাম পদবী প্রভৃতির উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে। ব্যাঙ্কক শহরের দক্ষিণের একটী অঞ্চলের নাম সংস্কৃত ভাষায় —'সমুদ্র-প্রাকার', উচ্চারণে 'সমুৎ-বাগান্'। পূর্ব-শ্যামে একটী ছোট শহরের নাম 'অরণ্যপ্রদেশ' শ্যামীরা বলে 'আরাঞ্-বাথেৎ'। 'অযোধ্যা' শ্যামের প্রাচীন রাজধানীর নাম, শ্যামী উচ্চারণ ধ'রে রোমান লিপিতে লেখে Ayuthia। প্রাচীন নগর 'বিষ্ণুলোক' Vishnu-loka, Bisanulok এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Phitsanulok 'ফিৎসানুলোক্'; 'স্বর্গলোক' Swarga-loka থেকে হ'ল প্রথম Sawarga-lok, তা থেকে এখন Sawankha-lok 'সৱঙ্খ-লোক্'; 'রাজপুরী' Rajapuri থেকে প্রথম Raj-puri, তারপরে এখন Rat-buri 'রাৎবুরি'; 'ব্রজপুরী' Vrajapuri থেকে Bra-ja-puri, তারপরে Phechaburi 'ফেচাবুরি'; 'পঞ্চম পবিত্র' Panchama Pavitra থেকে Panchama Pabitr— তা থেকে Bencham-bophit 'বেঞ্চাম্ বোফিৎ'; 'প্রবরনিবেশ' Pravara-nivesa থেকে Prabara-nibes, তাথেকে Bovor-nivet 'বৱর্-নিৱেৎ'—এখানে অন্তঃস্থ-ৱ-এর উচ্চারণ বজায় রাখবার চেষ্টা হ'য়েছে। বাঙালী ভদ্রলোকের নামের আর পদবীর সংস্কৃতানুসারী ইংরিজি বানান Kshitish, Jnan, Prabhat, Yajneswar, Satyendra, Vidyasagara প্রভৃতি প'ড়ে, অনভিজ্ঞ অ-বাঙালী ব্যক্তি কি ক'রে বুঝবে যে এই নামগুলির উচ্চারণ বাঙালীর মুখে 'খিতিশ, গ্যাঁন, প্রোভাৎ, জোগ্গেঁশ্শর, শোত্তেন্দ্র, বিদ্দাশাগোর' হ'য়ে দাঁড়ায়? এ-ও ঠিক এই ধরণের ব্যাপার। আবার, উপরন্তু শ্যামীরা শেষের অনেক অক্ষর একেবারে ছেড়ে দেয়, বা সংক্ষিপ্ত ক'রে বলে; যেমন 'মহাধাতু'='মহাথাদ্' বা 'মহাথাৎ'; 'ইন্দ্র'='ইন্', 'অমরেন্দ্র'='অমরিন্'; 'শতাংশ' (টিকল tical বা বাৎ baht অর্থাৎ শ্যামী টাকার ১০০-ভাগের এক ভাগ মুদ্রা, ইংরিজিতে cent)='সদাং'; 'দূরশব্দ', টেলিফোন-শব্দের শ্যামী অনুবাদ='থুরসপ্' বা 'থোরোসপ্'।

সকালে সাড়ে-আটটার দিকে আমাদের suite বা মহলে প্রাতরাশ এল', অবশ্য ইংরিজি মতে। ৯-টার সময়ে ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ এলেন। আমাদের সঙ্গে উনি প্রাতরাশেও যোগ দিলেন। নাতিদীর্ঘ ভদ্রলোকটী, সাধারণ আধময়লা বাঙালীর মত গায়ের রঙ, ধুতি চাদর প'রলে লোকে এঁকে বাঙালী ব'লেই মনে ক'রবে। ইংলাণ্ডে গিয়ে লেখা-পড়া শিখে এসেছেন। এঁর ব্যক্তিগত নাম হ'চ্ছে Vira বা Bira অর্থাৎ 'বীর'। আজ সকালে কাজ ছিল, শ্যাম-রাষ্ট্রের শিক্ষা-মন্ত্রী Prince Dhani রাজকুমার ধনী—ইনি রাজার এক বৈমাত্রেয় ভাই, এঁর বাড়ীতে গিয়ে কবিকে এঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে। শিষ্টাচারের সাক্ষাৎ—কবি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, সেইজন্য শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রথম তাঁকে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। আমরা বেলা দশটায় কবির সঙ্গে রাজকুমার ধনীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম।

কবিকে তিনি স্বাগত ক'রলেন নিজের বাড়ীর হাতার ভিতরে প্রবেশদ্বারে। মোটাসোটা বেঁটেখাটো চেহারার ভদ্রলোকটী, একটু গোলগাল চেহারা। পরিধানে কালো রেশমের 'ফানুম্', সাদা জীনের গলা আঁটা কোট, ডান হাতে আস্তিনের উপরে শোকসূচক কালো কাপড়ের ঘের, পায়ে সাদা মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত, ইংরিজি জুতো। এই শোকসূচক black-band আর কালো রেশমের 'ফানুম্' কেন, তা বুঝলুম। রাজার বিমাতা, ভূতপূর্ব রাজা চূড়ালঙ্করণের রাণী ছিলেন অনেকগুলি, তাঁদের একজনের দেহত্যাগ ঘ'টেছে। শ্যামী রীতি অনুসারে, বলিদ্বীপে যেমন, দেহ দু'চার মাসের জন্য তেল-মশলা দিয়ে রক্ষিত হ'য়ে থাকে, তার পরে শুভ মুহূর্ত দেখে তার অগ্নিসৎকার হয়। যতদিন তা না হ'চ্ছে, আর এঁদের শ্যামী ক্ষত্রিয়-ধর্মী রাজবংশের রীতি অনুসারে আমাদের শ্রাদ্ধের মতন অনুষ্ঠান না হ'চ্ছে, ততদিন অশৌচ— ইংরিজি state-mourning-এর দরে এঁরা পালন করেন। দেহটী একটী মূল্যবান স্বর্ণ-মণ্ডিত কাঠের চৈত্যাকার শবাধারে রক্ষিত থাকে, চারিদিকে শাস্ত্রী পাহারা, বৌদ্ধ পুরোহিত আর শ্যামী ব্রাহ্মণদের নানা অনুষ্ঠান; আর সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় নাচগান সঙ্গীতাদি আনন্দ-উৎসব বা অনুষ্ঠান সব বন্ধ থাকে। আমাদের আসার সময় থেকে প্রায় আরো দু'মাস এই শোকপ্রকাশ চ'লবে। সুতরাং আমাদের যে আশা ছিল, এদেশের উচ্চাঙ্গের প্রাচীন আর আধুনিক নাচ-গান সংগীত প্রভৃতি, যবদ্বীপে যেমন দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল তেমনি রাজ-দরবারের ব্যবস্থা অনুসারে এখানেও আমরা দেখতে পাবো, সে আশা থেকে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হবে।

বিরাট্ প্রাসাদ, সেপাই পাহারা বাইরে। যে ঘরটীতে আমাদের বসালে, বিশুদ্ধ ইউরোপীয় কায়দায় সাজানো, কিন্তু প্রাচীন ব্রঞ্জের মূর্তি, কাঠের কাজ প্রভৃতি লক্ষণীয় শ্যামী শিল্পদ্রব্যও আছে। কবির সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট ধ'রে রাজকুমার ধনী আলাপ ক'রলেন। ইংরিজি ভাষাতেই আমাদের কথা হ'ল। মাঝে-মাঝে আরিয়ম্ আর আমিও দু'একটা কথা ব'ললুম। বেশী কথা হ'ল শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে— এ-সম্বন্ধে কবির আদর্শ, পরে শান্তিনিকেতনে কবির অভিজ্ঞতা। রাজকুমার ধনীও বেশ মন দিয়ে শুনলেন।

রাজকুমার ধনীর সঙ্গে ব্যাঙ্ককেই আরও বার কতক দেখা হ'য়েছিল। ইনি শ্যামের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলক। পরে ১৯৪৮ সালে পারিসে প্রাচ্যবিদ্যা-বিদ্গণের আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কতগুলি শ্যামী পণ্ডিতব্যক্তিদের নিয়ে শ্যামদেশের প্রতিনিধি হ'য়ে এসেছিলেন। তখন আর তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না— ২১ বছর পরেকার কথা। একটু পরিচয়

দিতেই চিন্‌তে পারলেন। বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে পুরাতন সাক্ষাতের কথা স্মরণ ক'রে তার উল্লেখ ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের কথা ব'ল্‌লেন, তাঁর নিজের লেখা কতকগুলি ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ—ইংরিজিতে—আমায় দিলেন।

আমরা পরে বিদায় নিলুম। ব্যাঙ্ককে আজ ধ'রতে গেলে আমাদের প্রথম দিন— গত কাল পৌঁছেচি তো রাত্রে। একটু শহর ঘুরে তবে হোটেলে ফিরলুম। দেশটা মনে হ'ল বাঙলাদেশেরই মত। গরীবের ঘর-বাড়ী ছেঁচা বাঁশের তৈরী, খড়ের ছাত। মধ্যবিত্ত আর ধনী লোকের বাড়ী ইটের, বিশিষ্ট শ্যামী রীতির ছাত। না'রকল গাছ আর আমাদের দেশের অন্য গাছ প্রচুর। মেনাম্ নদীর ধারে শহর, সেদিকে এখনও যাওয়া হয় নি। কিন্তু শহরের মধ্যে অনেকগুলি খাল আছে—খালগুলিকে klong 'ক্লোং' বলে। ছোট-ছোট নৌকার চলাচল খুব; এগুলো দেখে মনে হ'ল, লোকজনের যাওয়া-আসা, মাল-পত্রের চলাচল খাল-পথেই খুব বেশী হয়। নদী তো আছেই।

পূর্বে শ্যামী মেয়েদের সম্বন্ধে ব'লেছি, ট্রেনে আসতে-আসতে গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষদের যেমন দেখেছি। শহরে এরা পোষাক-পরিচ্ছদে একটু ভব্য— অনেকেরই মাথায় চুল লম্বা, বা 'বব্' করা চুল, মাথা কদম-ছাঁটা ক'রে উপরে একটা ছোট ঝুঁটী রাখা নয়। আর শহরে আজকাল শ্যামী মেয়েদের ফ্যাশন হ'চ্ছে, পুরুষদের মতন 'ফানুম্' বা কাছা-আঁটা হাঁটু-পর্য্যন্ত লুঙ্গী না প'রে, উত্তর-শ্যামের মেয়েদের সুন্দর পোষাক পরা— একটা স্কার্ট বা ঘাগরার ধরণে পরা রঙীন লুঙ্গী, গায়ে একটা সাদা ব্লাউস, আর কেউ-কেউ তার উপরে একটা পাট-করা চাদর পরে। এ পোষাকে এদের বরং চলনসই দেখায়। শ্যামী জাতের মানুষ এই দক্ষিণ-শ্যাম অঞ্চলে দুটী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে রূপ গ্রহণ ক'রেছে—একটী মৌলিক জাতি হ'চ্ছে Mon মোন্ আর Khmer খ্মের— অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি, আমাদের কোল জাতির জ্ঞাতি— নাতিদীর্ঘ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ এরা; আর দ্বিতীয়টী হ'চ্ছে, উত্তর থেকে আগত Thai 'থাই' জাতির লোক— এরা মোঙ্গোল জাতির মানুষ, পীতবর্ণ, চেপ্টা-নাক, উঁচু-চোয়াল, সরু-চোখ, চীনা বর্মী ভোটদের জ্ঞাতি। এই দুইয়ের মিশ্রণে যে শ্যামজাতির মানুষ গ'ড়ে উঠেছে, তাদের চেহারা অনেকটা বাঙালী ধরণের, তবে মোঙ্গোল প্রভাবটী চেহারায় একটু বেশী। উত্তর-শ্যামে এই মোঙ্গোল থাই জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখ্‌তে, আর পীত বা গৌরবর্ণ থাই মেয়ে অনেক সময়ে দেখ্‌তে বেশ সুন্দরীই হয়।

শ্যাম-ভাষী থাই জাতি, এরা যে শব্দে নিজেদের নাম-করণ ক'রেছে, সেটা লেখা হয় শ্যামী লিপিতে "দৈ"— এই শ্যামী ভাষা, মোনদের কাছ থেকে নেওয়া ভারতীয় লিপিতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের দিকে যখন প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তখন নিশ্চয়ই শব্দটীর উচ্চারণ ছিল "দৈ", তা না হ'লে সে সময়ে ওরা "দৈ" লিখ্‌ত না। কিন্তু এখন এই সাড়ে-সাত শ' বছর পরে এর উচ্চারণ ব'দলে দাঁড়িয়েছে "থৈ" অর্থাৎ "থাই"— গলা খাদে নামিয়ে' এই এই দ-কারের থ-উচ্চারণ হয়। "দৈ" বা "থাই"-এর অর্থ 'স্বাধীন'। দেশের নাম "মুআঙ্-থাই", অর্থাৎ 'স্বাধীন জাতির দেশ।'

দুপুরে হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা গাড়ী নিয়ে বেরুলুম— কবি একটু বিশ্রাম করবার জন্য তাঁর ঘরেই রইলেন। আমাদের সঙ্গে রাজধর্ম-নিদেশ-ও আহার ক'রলেন, তাঁকে তাঁর আফিসে—শিক্ষাবিভাগের দপ্তরে—নামিয়ে' দিয়ে, আমরা গেলুম "দুসিৎ" অর্থাৎ "তুষিত" Throne Hall বা রাজসভা-

গৃহের সামনেকার চত্বরে— সেখানে শ্যামী ফৌজের Trooping of the Colours অর্থাৎ বিভিন্ন পল্টনের ঝাণ্ডা-উৎসর্গের অনুষ্ঠান দেখ্‌তে। "তুষিত মহাপ্রাসাদ" ব'লে আর একটী পুরাতন রাজ-প্রাসাদ অন্যত্র আছে। এই 'তুষিত রাজদরবার' গৃহে রাজার সিংহাসন আছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে যত রাজকীয় ঘটার ব্যাপার সে-সব এখানেই হ'য়ে থাকে। রাজসভা-গৃহের সামনে চত্বরে রাজার পিতা, আধুনিক শ্যামের গঠনকর্তা শ্যামরাজ পঞ্চম রাম চূড়ালঙ্করণের ব্রঞ্জে তৈরী বিরাট্‌ অশ্বারোহী মূর্তি আছে। চত্বরের বায়ু কোণে, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে, রাজসভা বা দরবার গৃহের খুব কাছে একটা জায়গা শামিয়ানা দিয়ে ঘেরা, তাতে নানা রঙীন কাপড়ের সজ্জা, সেখানে উঁচু পদের কর্মচারী, আর উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের কাপড় পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু, আর সাদা 'ফানুম্‌' পরা, সাদা কোট গায়ে ঝুঁটী-বাঁধা মাথা শ্যামী ব্রাহ্মণদল অপেক্ষা ক'রে আছেন। বিরাট্‌ চত্বরে বেলা তিনটে থেকে সাড়ে চারটে-পর্যন্ত এই ব্যাপার চ'লবে। আমরা মোটরে ক'রে বেশ একটু আগেই চত্বরে এসে হাজির হ'লুম—চত্বরের মধ্যে তখন সৈন্যেরা কাতারে কাতারে দাঁড়াচ্ছে। চত্বরের চারদিকে দর্শকদের বস্‌বার জায়গা; পিছনের পথ দিয়ে তাতে আসতে হয়। ফ্যা-থাই প্রাসাদ হোটেলের শাখা একটা রেস্তোরাঁ এখানে আছে, তার সামনে এই হোটেলের অতিথিদের জন্য একটা বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট আর চিহ্নিত ছিল। সেখানে সব চেয়ার সাজানো ছিল, আমরা ব'সে ব'সে দেখবো। সেই স্থানে তো গিয়ে ওঠা গেল। শ্যামী সিপাহীদের দেখে খুব মজবুত বা "তাগ্‌ড়া" ব'লে মনে হ'ল না, "তুবলা পাতলা" গুরখার মতন, আমাদের বাঙালী ছেলেরা সাধারণতঃ যেমন হয় তেমনি। অফিসাররাও খুব লক্ষণীয় নয়। শিখ, পাঞ্জাবী রাজপুত আর মুসলমান, ভোজপুরিয়া, গুরখা, তমিল প্রভৃতি ভারতীয় সৈন্যদের যে একটা সহজ বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারার জৌলুশ আছে, সেটা পৃথিবীতে অনেক জাতির মধ্যে দুর্লভ। অফিসাররা খুব পান চিবুচ্ছেন, উর্দী প'রে—তখনও অবশ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়নি—কিন্তু এটা একটু ঢিলেঢালা লাগ্‌ল। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট, দড়ি-দিয়ে-আলাদা-করা জায়গার বাইরে, রাস্তায়, আমাদের আড়াল না ক'রে অন্য লোকেদের স্থান ছিল। সেখানে শ্যামী অফিসাররাও চলাফেরা ক'রছিল। সেখান থেকে একটী ভারতীয় ছোকরা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রলে—বাঙালী মুসলমান, নাম আবু সৈয়দ মোবারক আলী। 'বারিসীমাধ্যক্ষ' অর্থাৎ Irrigation Officer লুআং ওয়াহেদ আলী, যিনি গত কাল ষ্টেশনে আমাদের আন্‌তে গিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে আগত বাঙালী ভদ্রলোক শ্যামদেশে উপনিবিষ্ট হ'য়েছেন, মোবারক আলী-তাঁর আত্মীয়। মোবারক আলী এখানে অনেক দিন আছেন, শ্যামী ভাষা বেশ ভালো ক'রে লিখতে প'ড়তে শিখে নিয়েছেন—বাঙলা উপন্যাস শ্যামীতে অনুবাদ ক'রে রোজগার করা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌লেন—আমাদের বড় সুবিধাই হ'ল। রেস্তোরাঁর ভোজপুরী-ভাষী ভারতীয় দরওয়ানও আমাদের সঙ্গে এসে আত্মীয়তা ক'রে আলাপ ক'রলে।

তিনটে প্রায় বাজে, অনুষ্ঠানটী আরম্ভ হবার সময় হ'ল। শ্যামদেশের রাজা সপ্তম রাম প্রজাধিপক মোটরে ক'রে এলেন। এক-হারা শ্যামবর্ণ খর্বাকার মানুষটী। ফৌজী উর্দী পরা। শ্যামদেশের সেপাইদের পোষাক সাধারণতঃ খাকী কাপড়ের, তবে তার মধ্যে সবুজের আমেজ আছে। বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা এতক্ষণে সার দিয়ে ফৌজী কায়দায় দাঁড়িয়েছে। রাজা তাদের এক এক রেজিমেণ্টের কাতারের মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন। একটী রেজিমেণ্ট-এর সামনে হ'লেই, সেনানী শ্যামী ভাষায় হুকুম দিলে, present arms অর্থাৎ সেলামী-হাতিয়ার হ'য়ে, বন্দুক দুহাতে সামনে খাড়া ক'রে মাটী থেকে উঁচু ক'রে

ধ'রে, ঋজু ভাবে সেপাইরা দাঁড়াল'। রাজা লাইনের সামনে এলেন, অফিসার কাঁধ থেকে খোলা তলোয়ার নীচু ক'রে মাটির দিকে মুখ ক'রে নামালেন, সৈন্যরা সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"ছাই-য়োঃ"। শুনলুম, এই শব্দটী হ'চ্ছে আমাদের "জয়"—দুই অক্ষরে উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দ "জ—য়", শ্যামী ফৌজী কায়দাতে তার এই উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে।

শ্যামদেশ আগে ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুরাজার দেশ ছিল, এখনও অনেকটা তাই আছে। বিজয়া দশমীর দিন, শরৎকালের প্রারম্ভ, হিন্দুরাজারা সৈন্য সাজিয়ে' দিগ্‌বিজয়ে বেরুতেন, কিংবা কুচ-কাওয়াজ ক'রে যুদ্ধের জন্য ফৌজ নিয়ে সজ্জা ক'রতেন। সেই রীতি শ্যামদেশে এখনও চ'লে এসেছে, তাই বিজয়া দশমীর পরের রবিবারে এই ফৌজী অনুষ্ঠান।

রাজা এই ভাবে প্রত্যেক পল্টনের কাছ থেকে সেলামী বা প্রণাম নিয়ে আর জয়ধ্বনি শুনে উত্তর-পশ্চিম কোণে শামিয়ানার তলায় তাঁর আসনে গিয়ে ব'সলেন। তারপরে একে একে বিভিন্ন পল্টনের অফিসারেরা পল্টনের ঝাণ্ডা নিয়ে শামিয়ানার তলায় আস্‌তে লাগলেন, ভূঁয়ে হাঁটু গেড়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ব'সলেন, তার পরে আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু আর পরে ব্রাহ্মণেরা পালি আর সংস্কৃতে মন্ত্র প'ড়ে, পবিত্র তীর্থ-নীর ছিটিয়ে,' ঝাণ্ডাগুলিকে মন্ত্রপূত বা পবিত্র ক'রে দিতে লাগলেন, অফিসাররাও ফিরে যেতে লাগ্‌ল। এই ভাবে ব্যাপারটা শেষ হ'ল। শুন্‌লুম, প্রায় দশ হাজার সেপাই এই অনুষ্ঠানের জন্য জমা হ'য়েছিল।

অনুষ্ঠান পুরো দমে চ'লেছে, কে ব'ললে, রাজা চ'লে গেলেন। শেষটায় আমাদেরও একঘেয়ে' লাগ্‌ছিল। রোদ্দুরে অনেক ক্ষণ ব'সে থাকতে হ'য়েছিল, আমরাও চারটে বাজতেই ঠাণ্ডা লেমনেড খেয়ে, সৈয়দ মোবারক আলীর সঙ্গে বেরিয়ে' প'ড়লুম—স্থানীয় বাজারে পুরাতন শিল্পদ্রব্যের সন্ধানে। বলা বাহুল্য, এ কাজে সুরেন বাবু (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর) আর আমি সমান উৎসাহী। সৈয়দ মোবারক আলী ব'ললেন, তাঁকে একটী শ্যামী নাম নিতে হ'য়েছে লেখক হিসাবে—'মহাজরিদ-ৱং আরী' Mahacharitavong Ari ; তিনি সৈয়দ অর্থাৎ নবী মোহম্মদের বংশের, সেই জন্য শ্যামী ভাষায় তার অনুবাদ হ'য়েছে 'মহাচরিত-বংশ' অর্থাৎ 'পুণ্য-চরিত্র মোহম্মদের বংশ-জাত', আর 'আলী'কে ওদের উচ্চারণ-মোতাবেক 'আরী' ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। সংস্কৃত 'বংশ' Vamsa শব্দ সংক্ষিপ্ত 'ৱং' Vong রূপে শ্যামীতে ব্যবহৃত হয়।

লাখন্ কাসেম Lakhon Kasem এখানকার একটী বিখ্যাত বাজার—এখানে পুরাতন চীনা আর শ্যামী শিল্পদ্রব্যের অনেকগুলি দোকান আছে, এই দোকানগুলির মালিক চীনা আর শ্যামী। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন জিনিসের মধ্যে আমি দুটী ব্রঞ্জে তৈরী বুদ্ধের মূর্তির মুণ্ড কিনলুম—বর্বরেরা পয়সার জন্য মূর্তি থেকে ভেঙে নিয়ে এসেছে—সবুজ patina বা কলঙ্ক পড়ায় মূর্তি দুটীর প্রাচীনত্ব বোঝা যায়—পরে শ্যাম গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবে আমি এই প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সঙ্গে ক'রে আনতে পেরেছিলুম। এ দুটী আমার সংগ্রহে আছে ; অদ্ভুত সুন্দর দুটী মুখ, একটীর প্রস্তুত-কাল হবে, ব্যাঙ্কক মিউজিয়মের বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের মাঝামাঝি, আর একটী তার প্রায় একশ' শওয়া-শ' বছর পরেকার। শ্যামী চিত্র—কাঠের উপরে কালো জমীতে সোনালী কালিতে আঁকা ; শ্যামদেশের রঙীন বৌদ্ধ মূর্তি আঁকা চীনমাটির পাত্র—চীন থেকে বিশেষ ক'রে এই অতি সুন্দর পাত্রগুলি অষ্টাদশ শতকে শ্যামীরা তৈরী করিয়ে' আনাত' ; চীনা শিল্পের নানা জিনিস—ব্রঞ্জের, পিতলের, জেড-পাথরের, পলার,

কাঠের, হাতীর-দাঁতের, আর চীনা-মাটির। দস্তুর-মত মিউজিয়মের সংগ্রহ। আশে পাশে শ্যামীদের মধ্যে ব্যবহৃত পিতল-কাঁসার বাসনের দোকান—ভারতীয় প্রভাবের ফলে, এখনও এ জিনিসের চল এদের মধ্যে থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

বাজারে খানিক ঘুরে, প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, Vajira-nana বজির-ঞাণ বা বজ্রজ্ঞান' জাতীয় গ্রন্থশালা, আর জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম বাইরে থেকে দেখে গেলুম। মিউজিয়মের বাড়িটীর মধ্যে সম্মুখ-ভাগে ব্রঞ্জের তৈরী প্রমাণ-আকারের ধনুর্ধারী রামচন্দ্রের মূর্তি, শ্যামদেশে রামায়ণ-কথার লোকপ্রিয়তা সূচিত ক'রছে। এই তল্লাটে একটী ফোয়ারা আছে। তার কল্পনা আর গঠন-প্রণালী দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, যখন তিনি বোধিজ্ঞান পেয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তখন মার বা পাপপুরুষ এসে তাঁকে নানা রূপ প্রলোভন আর বিভীষিকা দেখায়, কিন্তু বুদ্ধদেব অবিচলিত হ'য়ে স্বস্থ থাকেন। তখন পৃথিবী দেবী দেখা দিলেন, আর তাঁর মাথায় বেণী নিংড়ালেন, অমনি বেণী থেকে জলপ্রবাহ বেরিয়ে' এসে, মার আর তার দলবলকে ভাসিয়ে' নিয়ে গেল। পৃথিবী দেবী, বা ধরণী দেবী, শ্যামী ভাষায় Nang Thorani বা Dhoroni "নাং থরনী," উপবিষ্ট হ'য়ে মাথার বেণী নিংড়াচ্ছেন—এরকম ছোট ব্রঞ্জমূর্তি শ্যামী শিল্পে পাওয়া গিয়েছে। এখানে এই ফোয়ারাটী হ'চ্ছে একটী মন্দিরাকৃতি গৃহের মধ্যে প্রমাণ আকারের অতিসুন্দর উপবিষ্ট ধরণীদেবীর ব্রঞ্জমূর্তি, তিনি দুই হাত দিয়ে বেণী পাকাচ্ছেন, আর বেণীর অন্তভাগ থেকে প্রণালীর মত জলধারা বেরিয়ে নীচে প'ড়ছে— পথিক লোক ইচ্ছা-মত এই জলধারা পান করে। ভাবটী, আর প্রকাশটী-ও, অতি সুন্দর।

আমরা এই ভাবে দুপুর আর বিকালের খানিক কাটিয়ে' সাড়ে-পাঁচটায় হোটেলে ফিরলুম। সাদা কোট-প্যান্ট ছেড়ে এইবার কালো আচকান চোগা প'রে নিলুম, কবির সঙ্গে গেলুম—Wat Rat-bophit 'রাৎ-বোফিৎ' অর্থাৎ 'রাজপবিত্র' মন্দিরে থাকেন এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু, His Holiness the Patriarch যাঁর ইংরিজি পদ-নাম, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে। মন্দিরে যাবার পথে প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; রাস্তায় দেখলুম, শ্যামী পল্টনের সিপাহীরা কুচ ক'রে নিজেদের ডেরায় ফিরছে, আর এক এক দল খুব ফূর্তির সঙ্গে বেশ জোর গলায় সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে-গাইতে— বোধ হয় রাষ্ট্রসঙ্গীত— পা ফেলার সঙ্গে তাল বজায় রেখে চ'লেছে। কবিকে আমরা Trooping of the Colours-এর কথা শুনিয়ে' দিয়েছিলুম— ভিক্ষু আর ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধ্বজায় অভিষেক, আর রাজাকে "ছাই-যোঃ" বা "জয়" বলে সংবর্ধনার কথা। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আমাদের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানে রাজকুমার ধনী উপস্থিত ছিলেন। ধর্মগুরুর কাছে পৌছুবার পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। কবিকে রাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ ধর্মগুরু বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন; বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী ইনি। কবিরও এঁকে দেখে বেশ ভাল লাগ্‌ল। আমরা তার পরে মন্দির আর প্রাচীন শ্যামী পদ্ধতিতে তৈরী কতকগুলি ঘর দেখলুম। কালো গালার রঙে রঙানো দরজায় বড়-বড় ঝিনুকের টুকরো লাগিয়ে' পচ্চেকারী কাজ— বড় সুন্দর লাগ্‌ল। এটী শ্যামী সুকুমার শিল্পের মধ্যে একটী বিশিষ্ট জিনিস। বৃষ্টি থামতে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

হোটেলের মধ্যে বারে একটী ছোট বইয়ের দোকান আছে, সেখান থেকে আমি খান দুই ছোট বই শ্যাম সম্বন্ধে কিনলুম।

এখানকার ইংরিজি খবরের কাগজ Bangkok Standard-এর সম্পাদক Mr. Fox ফক্স

ব'লে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। খানিক সদালাপ ক'রে চ'লে গেলেন।

রাজা চূড়ালঙ্করণের যে রাণীর সম্প্রতি মৃত্যু হ'য়েছে—তাঁর নামটী হ'চ্ছে, এরা ব'ললে, Sukhumal Marasri বা Sukhumaman Siri Agra-rajadevi, 'সুখুমাল্ মারশ্রী বা সুখুমমান্ সিরি অগ্র-রাজ-দেবী'। নামের প্রথম অংশটা বুঝতে পারলুম না। রাজধর্ম-নিদেশ বার বার উচ্চারণ ক'রলেন—'সু-খু-ম-মান্'— আমি মনে ক'রলুম, শব্দটী পালি 'সুখুম-মালা-শ্রী' অর্থাৎ 'সুক্ষমালা-শ্রী' হবে। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, নামটী হ'চ্ছে সংস্কৃতের 'সুকুমার-শ্রী', পালির 'সুখুমার-সিরি'। এঁর পুত্র এখন রাজ্যের সেনা ও নৌবলের মন্ত্রী। রবীন্দ্রনাথকে সৌজন্য দেখিয়ে' আগামী কাল সকালে এঁদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদে যেখানে রাণীমাতার দেহ রক্ষিত আছে সেখানে একটী wreath বা পুষ্পমালা যথারীতি অর্পণ ক'রে আস্‌তে হবে। সেই জন্য, আরিয়মের ব্যবস্থা-মত, রাত্রে ফুলওয়ালার দোকান থেকে লোহার তারের তৈরী ফ্রেমের মধ্যে বিরাট্ এক পত্রপুষ্পময় মালা এল', হোটেল থেকে কবি কাল সকালে সেইটী যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে দিয়ে রাজমাতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে' আসবেন। পথে আবার মৃতার স্বামী রাজা পঞ্চম রাম চূড়ালঙ্করণের অশ্বারোহী ব্রঞ্জ-মূর্তির পাদ-পীঠে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবি আর একটী মালা দিয়ে আস্‌বেন— এ দেশের রীতি এই।

ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল হোটেলে ফিরে। শ্যামী ভাষায় বানান আর উচ্চারণ নিয়ে আমি কতকগুলি প্রশ্ন ক'রলুম— ভাষাতাত্ত্বিক নয় ব'লে সব কথার ঠিক-মত উত্তর দেওয়া ওঁর পক্ষে অসম্ভব, একথা রাজধর্ম-নিদেশ আমায় জানালেন। ফ্রা রাজধর্ম-নিদেশ আমাদের ব'ললেন—চীনাদের সঙ্গে আমাদের বেশ মিল হ'য়ে থাকে। চীনারা এদেশে এসে আমাদের মেয়ে বিয়ে' করে, দু'পুরুষের মধ্যেই শ্যামী ব'নে যায়। We are Chinese by race, Indian by culture— আমরা জাতিতে চীনা, সংস্কৃতিতে ভারতীয়। আমার মনে হয়, সংক্ষেপে এই কথায় শ্যামী জাতি আর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইভাবে ব্যাঙ্ককে আমাদের প্রথম পূরো দিনটী কাট্‌ল॥

স্বীকৃতি: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিত্রের ব্লক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস

শ্রীভবতোষ দত্ত

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার পথ গত কয়েক বছরে অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে। তথ্য এবং পরিসংখ্যানের যে অভাব আগেকার লেখকরা ভোগ করে গিয়েছেন, আজকাল সেটা অনেক কম এবং অর্থনীতির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশের গবেষকদের জ্ঞান বেড়েছে। ফলে, গত সাত-আট বছরের মধ্যে প্রকাশিত রচনাবলী পড়লে পুরোনো যুক্তির চর্বিত-চর্বণ ছাড়াও অনেক নূতন জিনিস দেখতে পাই— সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতনতা, সঞ্চয় ও মূলধন-নির্মাণের গুরুত্ববোধ এবং বিদেশের সঙ্গে লেনদেনের ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের মূল্যোপলব্ধি। এখনো অবশ্য পরিসংখ্যানের অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে নালিশ সর্বদাই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকাল যা পাওয়া যায় তার অনেকটাই পঁচিশ বছর আগে পাওয়া যেত না; তা ছাড়া, ভারতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান ইংলণ্ড বা আমেরিকার তুলনায় যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, সারা পৃথিবীতে আট-দশটি দেশ ভিন্ন আর সব দেশেরই তথ্যসংগ্রহ আমাদের চেয়েও স্বল্পতর। আজকাল আমরা যখন তথ্যের অভাব নিয়ে নালিশ জানাই, তখন বোধ হয় মনে রাখি না যে এই অভাবের সঙ্গেসঙ্গে আছে অভাববোধের বৃদ্ধি; আগে যে মালমসলা নিয়ে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ্ অত্যন্ত তৃপ্তভাবে ছ'শ-সাতশ পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ লিখে গিয়েছেন এখন তার চেয়ে অনেক বেশি উপকরণ পেয়েও আমরা অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছি। এই অভাববোধ ও অতৃপ্তি একটা শুভলক্ষণ— জ্ঞান এবং বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল।

ভারতীয় অর্থনীতি-সমস্যার এমন প্রায় কোনোদিক নেই যেটা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে কিছুটা কাজ না হয়েছে। কিন্তু একটা অভাব আমাদের থেকেই গেল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটা নির্ভরযোগ্য এবং পরিপূর্ণ আর্থিক ইতিহাস লেখা হল না। অথচ, খোঁজ করলে দেখা যাবে যে ভারতীয় অর্থনীতির গবেষক-ছাত্ররা প্রায় অধিকাংশই আর্থিক ইতিহাসের কোনো-না-কোনো অংশ নিয়ে গবেষণা করেছেন, নিবন্ধ লিখেছেন, বই প্রকাশ করেছেন। যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির বইগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে এই রকম সব নাম: কোম্পানির আমলের ভারতীয় রাজস্ব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎপত্তি, বাংলাদেশের আর্থিক পুরাবৃত্ত, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিবর্তন, আয়কর ও অন্যান্য ট্যাক্সের ইতিহাস, সুয়েজখাল খননের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ভারতীয় রেলপথের ইতিহাস ইত্যাদি। কিন্তু যদি এইসমস্ত আংশিক ইতিহাসের একত্র গ্রন্থন দেখতে চাওয়া হয়, তা হলে নিরাশ হতে হবে; ভারতবর্ষের ক্ল্যাপ্‌হাম এখনো জন্মান নি, বা অন্ততঃ গ্রন্থকার-রূপে দেখা দেন নি।

অথচ, আমাদের দেশের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস লেখার উপাদান-উপকরণ নেই, এ কথা বলা চলে না— বিশেষতঃ যদি এই ইতিহাস গত দু শ বছরের হয়। যেটুকু প্রকাশিত তথ্য আছে কেবল তা থেকেই একটা ভালো আর্থিক ইতিহাস গড়ে তোলা যায়, যদি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটা বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বাঙ্গীণ হয়। এমনকি ভারতীয় অর্থনীতির যে-কোনো ভালো পাঠ্য বইয়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে ঐতিহাসিক তথ্য

আছে, সেগুলি একত্র করে বিষয়-স্তর অনুসারে না সাজিয়ে কাল-স্তর অনুসারে সাজিয়ে নিলে একখানা সহজ সাধারণপাঠ্য আর্থিক ইতিহাস তৈরি করে তোলা যায় বোধ হয়। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টার পরে অবশ্য অনেক ফাঁক ধরা পড়বে— সেগুলি পূরণ করবার জন্য ভবিষ্যতের গবেষকরা এগিয়ে আসবেন, এটা আশা করা অসংগত হবে না। কিন্তু প্রথমেই প্রয়োজন এখন পর্যন্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেসব একত্রে সন্নিবদ্ধ করে অন্ততঃ একটা কাঠামো তৈরি করা।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে ইংলণ্ডের এবং আরো অনেক দেশের আর্থিক ইতিহাস অবশ্য-পাঠ্য বলে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস পড়ানো হয় না এবং পড়াবার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র অনায়াসে পূর্বভারতের জমি-বন্দোবস্তের পূর্বানুক্রমিক ইতিহাস বলে যেতে পারবে, কিংবা ভারতীয় মুদ্রানীতির ইতিহাস ১৮৩৫ থেকে সম্পূর্ণ শুনিয়ে দিতে পারবে— কিন্তু ১৮৪০ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ আর্থিক অবস্থায় কী কী পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করেছিল এবং এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল কি না সেটা প্রকাশ করে বলতে পারবে কি না সন্দেহ। আফগান যুদ্ধ, ঋণভারবৃদ্ধি, রেলপথ-নির্মাণ, তুলোর রপ্তানিবৃদ্ধি এবং পাটের রপ্তানি-আরম্ভ, কাপড়ের আমদানি-বৃদ্ধি, কাপড়ের কলস্থাপন, বাংলাদেশের রায়তের দুরবস্থা, উত্তরভারতের 'সাহারাণপুর-নীতি', সোনার মূল্য-হ্রাস ইত্যাদি সব একত্রে গ্রথিত করে যে ইতিহাস তৈরি হয় সেটা তার চোখে ধরা পড়ে নি।

আপত্তি উঠবে, উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস তো রমেশচন্দ্র দত্ত রচনা করে গিয়েছেন— ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস রচনার এই বিরাট প্রচেষ্টা সম্মুখে থাকতেও একথা বলা কি সংগত যে এদিকটা অবহেলিত থেকে গিয়েছে? রমেশচন্দ্রের প্রচেষ্টার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই— এটা অত্যন্ত দুঃখেরই কথা যে আজকালকার অর্থনীতির ছাত্ররা রমেশচন্দ্রের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নয়। এ কথাটাও বোধ হয় অনেকের জানা নেই যে, ভারতীয় অর্থনীতির অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকার যেসব ঐতিহাসিক তথ্য এবং উদ্ধৃতি তাঁদের বইয়ে দিয়েছেন সেগুলি মূল রেকর্ড বা রিপোর্ট থেকে নেন নি, রমেশচন্দ্রের বই থেকে তুলে দিয়েই কাজ সহজ করেছেন। এমনকি অনায়াস-প্রাপ্য হাণ্টার বা উইলসনের ইতিহাস থেকে যেসব উদ্ধৃতি সাধারণ-ব্যবহৃত বইয়ে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলিতে কেবল সেই লাইনগুলিই আছে যেগুলি রমেশচন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের দুই খণ্ড আর্থিক ইতিহাস ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৭ এবং ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত মোট প্রায় দেড় শ বছরের বিবরণ। বই-দুখানা যথাক্রমে ১৯০২ এবং ১৯০৪ এ প্রকাশিত হয়, এবং তখনকার সময়ে প্রাপ্য এমন কোনো বই বা রিপোর্ট প্রায় ছিল না যা রমেশচন্দ্র খুঁজে দেখেন নি। শেষের খণ্ড সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহে বোধ হয় তাঁর খুব অসুবিধা হয় নি, কারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট' প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছিল, বাজেট বক্তৃতাবলী সুপ্রাপ্য ছিল এবং তা' ছাড়া সরকারি 'মর‍্যাল অ্যাণ্ড মেটিরিয়্যাল প্রগ্রেস'এর বার্ষিক রিপোর্ট অনেক তথ্য দিয়েছে। ১৮৮০ এবং তার পরেকার দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্ট থেকে রমেশচন্দ্র অনেক উপকরণ পেয়েছিলেন— আর তাছাড়া তাঁর নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও ১৮৭১ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম খণ্ড রচনার জন্য তাঁকে প্রধানতঃ

নির্ভর করতে হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রিপোর্ট এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রের উপরে। প্রথম খণ্ড পড়লে দেখা যায় কীরকম যত্ন নিয়ে রমেশচন্দ্র হ্যানসার্ড পাঠ করেছিলেন— ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কমিটির রিপোর্ট এবং কমিটির অধিবেশনে বিবৃত সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃতি তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্রের বিরাট অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য আজকালকার অর্থনীতিবিদ্ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারেন না, কিন্তু তাঁর রচিত ইতিহাসের অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বোধ হয় মনে হবে যে আধুনিক পাঠকের ঔদাসীন্যই সবটা কারণ নয়। অনেক কারণে রমেশচন্দ্রের বই-দুখানি ঠিক পুরোপুরি আর্থিক ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে নি। কেন পারে নি, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় প্রয়োজন।

ইতিহাস-রচয়িতার প্রধান কাজ ঘটনা-পরম্পরার বিবর্তনকে ফুটিয়ে তোলা— পাঠকের মনে একটা সুসংগত চলমান চিত্রধারা উপস্থিত করা। এই কাজের প্রথম ধাপ হল ঘটনার এবং তথ্যের আহরণ এবং পরের কাজ হল এগুলির মধ্যে কালানুক্রমিক বা সমকালীন যোগসূত্র আবিষ্কার। শেষপর্যন্ত ছবিটা কী হয়ে দাঁড়াবে সেটা গবেষক-ঐতিহাসিকের পক্ষে আগে থেকে নিরূপণ করা সম্ভব নয়— এবং তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র রচিত ইতিহাসে প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় যে কয়েকটি মূল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করার বিশেষ চেষ্টা আছে। এই সিদ্ধান্তগুলির সবই যে অন্য ঐতিহাসিক ভুল মনে করবেন তা নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাটাই যদি প্রাধান্য পায় তা হলে ইতিহাসের মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়।

রমেশচন্দ্রের সর্বপ্রধান সিদ্ধান্ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি এবং সমৃদ্ধি হয়েছে এবং যেসব প্রদেশে এরকম বন্দোবস্ত করা হয়নি সেখানে দুর্দশার অন্ত নেই; তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ভারতবর্ষের সরকারি ঋণ অন্যায়ভাবে এ দেশের উপরে চাপানো হয়েছিল; এবং তৃতীয় উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ইংরেজ পার্লামেন্ট এবং ভারতবর্ষে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরা ইংরেজের ব্যবসায়ের সুবিধাটাই প্রধান লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয় শিল্পের চূড়ান্ত অপকর্ষ ঘটেছিল। মোটের উপর রমেশচন্দ্রের আর্থিক ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের তীব্র এবং নির্ভীক সমালোচনা। যে মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুরাট-অধিবেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যে মনোভাব নিয়ে দাদাভাই নওরোজি বা ডিগ্‌বির রচনা, রমেশচন্দ্র তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের ও কংগ্রেসের নূতন চরমপন্থী দলের যে অর্থনৈতিক ধর্মবেদের প্রয়োজন ছিল, রমেশচন্দ্র সেটা উপস্থাপিত করলেন তাঁর ইতিহাসের মাধ্যমে। তাঁর বর্তমান পাঠকের চোখে সহজেই পড়ে কীভাবে আর্থিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগ, ভারতীয় জনমতের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সংযোগস্থাপন, গভর্ণর বা গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে ভারতীয় নিয়োগ ইত্যাদি তদানীন্তন কংগ্রেসী দাবি বার বার উপস্থিত হয়েছে।

ভারতীয় সরকারি ঋণের উৎপত্তি এবং ন্যায়সংগততার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র পঞ্চাশ বছর আগে যা লিখেছিলেন সেটা কারো গ্রহণ করতে বাধবে না— ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কলঙ্ক ভারতবিজয়ের ব্যয়ভার ভারতীয় করদাতার উপরে চাপানো। সরকারি আয়ব্যয়ে ঘাটতি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের যে ভীতি ছিল সেটা তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী বহু অর্থনীতির পণ্ডিতেরই ছিল এবং সেজন্যও তাঁকে খুব দোষ

দেওয়া যায় না। ইংলণ্ডের শুল্কনীতি, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যনীতি এবং ভারতস্থিত ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর একত্রিত ফলে যে এ দেশের কুটিরশিল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল সে সম্বন্ধে কারো হয়তো আপত্তি উঠবে না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে, কর্নওয়ালিসের শতাধিক বৎসর পরে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণগান দেখে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। রমেশচন্দ্রের বই লেখার আগে— ১৮৮৫তে— বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়ে গিয়েছিল, এবং তারও অনেক আগে— ১৮৫৯এ— ক্যানিং 'রেণ্ট অ্যাক্ট' পাশ করিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জাজ্বল্যমান গৌরবের ইতিহাসে এই আইনগুলির প্রয়োজন কেন হল সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র নীরব। জমির অধিকারের খণ্ডীকরণ রমেশচন্দ্রের কার্যকালেই অনেকদূর চলে গিয়েছিল এবং রায়ত বলতেই যে চাষী বোঝায় না, এ কথা অন্তত: বোঝা গিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, যে বাখরগঞ্জ জেলায় জমির মালিকানা জমিদার থেকে ধাপে ধাপে জোতদার এবং জোতদার থেকে আবার ধাপে ধাপে সবশুদ্ধ পঞ্চাশ-বাহান্ন রকমের নিম্ন-রায়তের পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই বাখরগঞ্জ জেলায় রমেশচন্দ্র কাজ করেছেন বহুদিন—১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ এবং আবার ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫। এ সময়টা অবশ্য বাখরগঞ্জের জমিদারদের সমৃদ্ধিরই সময়— অনাবাদী অঞ্চলে কৃষি-বিস্তারের ফললাভ তাঁরাই প্রধানত করেছিলেন— কিন্তু এটার অন্যদিকও তখনকার দিনে কালেক্টরের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

জমিদারি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিশেষ একটি সিদ্ধান্তে অনবরত জোর দেওয়ায় আর্থিক ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস রমেশচন্দ্রের বইয়ে স্থান পায় নি। প্রথমেই চোখে পড়ে, বাংলাদেশের জমিব্যবস্থায় রায়তের স্থান সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র খুব সজাগ নন। ১৮৫৯এর 'রেণ্ট অ্যাক্ট'এ কয়েক শ্রেণীর রায়তকে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং এর ফলে গ্রন্থকারের মতে বাংলাদেশে প্রায় নবযুগের প্রবর্তন হল। তাই যদি ঠিক হয় তা হলে ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৮র মধ্যে রায়তের অবস্থা নিশ্চয়ই ভালো ছিল না— নবযুগ প্রবর্তনের বর্ণনায় প্রাক্-নবযুগ অবস্থাটা কী ছিল সেটা ভালো করে প্রকাশ করলে ইতিহাস পূর্ণতর হত। ১৮৮৫র প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধেও রমেশচন্দ্র দু-একটি কথা ছাড়া কিছু বলেন নি। প্রত্যেক ঐতিহাসিকের মনেই প্রশ্ন জাগবে ঠিক কী কী কারণে এই আইনগুলির প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর রমেশচন্দ্রের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সরকার ও জমিদার শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই তাঁর কৌতূহলের শেষ; জমিদারশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক কর্নওয়ালিসি বন্দোবস্তের পরে কী ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল নেই।

বলা যেতে পারে যে, উনবিংশ শতাব্দী ধরে কৃষকশ্রেণীর উপরে জমিদারদের চাপ কতটা বাড়ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে, এবং রমেশচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হলেই তাঁর লেখা ঠিক নয় এ কথা বলা সমীচীন হবে না। কিন্তু মতামতের আগেও আসে ঘটনা এবং ইতিহাসের রচয়িতা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে যে বিরাট অসন্তোষ জাগ্রত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; সরকারি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টেও বহুস্থানে এই অসন্তোষের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে। ওয়াহাবি আন্দোলনের পিছনে একটা ধর্মমূলক 'দর-উল-ইস্‌লাম' প্রতিষ্ঠার আবেদন ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের কৃষককুলের অসন্তোষ কাজে লাগাতে না পারলে এই আন্দোলন এত ব্যাপক হতে পারত না। পাবনা জেলায় ১৮৭৩ এর

কাশীর ঘাট

শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে ছিল নাটোর জমিদারিতে খাজনাবৃদ্ধি; এই হাঙ্গামার ফল এতদূর গিয়েছিল যে নূতন আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও এই গোলমালের মাত্র চোদ্দ বছর পরে— ১৮৮৭তে— তিনি পাবনার কালেক্টর হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ১৮৭৯এ চাষীদের দুর্দশা চরমে ওঠে এবং সেখানেও নানারকম গোলমাল হয়েছিল; কিন্তু রমেশচন্দ্রের ইতিহাসে এসব স্থান পায় নি।

অন্যদিকেও বহু জিনিস তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। ১৮৭২ থেকে আমাদের জনসংখ্যা গণনা হচ্ছে; রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় খণ্ড ইতিহাস রচনার সময় অন্তত চারটে শুমারির হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এই হিসাব থেকে প্রায় কোনো তথ্যই তিনি ইতিহাস-রচনার কাজে লাগান নি। উনিশ শতকের শেষভাগে লিখতে বসেও এ দেশে তাঁর রচনার আগেকার অর্ধশতাব্দী ধরে যে যন্ত্রশিল্প ধীরগতিতে গড়ে উঠছিল সে সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত হন নি। আমদানি-রপ্তানির রূপপরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন, তাঁতির তৈরি কাপড় ও রেশমজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি কীভাবে কমে গেল এবং কাঁচামালের রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তাঁর বইয়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু কাপড়ের কলের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাটের কল ইত্যাদি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে সামান্য কিছু পরিসংখ্যান ও বর্ণনা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন।

অথচ, ইংরেজ কর্তৃক ভারতশোষণের যে সিদ্ধান্ত রমেশচন্দ্র আগাগোড়া উপস্থাপিত করেছেন সেটা এদিকে তাকালে আরো অনেক জোরালো করা যেত। ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধনের অবাধ প্রবেশাধিকারের ফল কি দাঁড়িয়েছিল সেটা শতাব্দী-প্রান্তে বসে বোঝা একেবারে দুঃসাধ্য ছিল না। রেলপথ-নির্মাণে অযথা চড়া সুদে বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু পাটের কল বা চা-বাগান থেকে যে বিরাট লাভ বিদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছিল সেসম্বন্ধে তিনি ততটা অবহিত নন; অথচ, ঠিক যে সময়ের বর্ণনায় পাটশিল্পের প্রথম ঐতিহাসিক ওয়ালেস বলেছিলেন যে পাটের কল প্রায় টাঁকশালের রূপ ধারণ করেছিল, সে সময়েই রমেশচন্দ্র তাঁর ইতিহাস-রচনার উদ্যোগ করছিলেন। ভারতসরকার দেশের লোকের উপরে ট্যাক্স বসিয়ে রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকে যদি ইংরেজ মহাজনকে চড়া সুদ দেন তা হলে যেমন 'ইকনমিক ড্রেন' হয়, ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কাঁচামাল বিক্রেতাকে কম দাম দিয়ে অনেক টাকা লাভ করে বিদেশী অংশীদারকে বেশি বেশি লভ্যাংশ পাঠালেও যে তেমনি 'ইকনমিক ড্রেন' হতে পারে এটা ভালো করে অবধান করলে রমেশচন্দ্রের যুক্তি আরো দৃঢ়তর হতে পারত। ম্যানচেস্টারের ব্যবসায়ীদের চাপে কীভাবে ভারতবর্ষের শুল্কনীতি পরিবর্তিত হত সেটা রমেশচন্দ্র অনেকবার দেখিয়েছেন, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ভারতীয় শ্রমিক-আইনগুলি যে শ্রমিক-রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে হয় নি, ম্যানচেস্টারের চেষ্টায় হয়েছিল, সেটা তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

আর্থিক ইতিহাসের প্রধান কাজ যদি হয় দেশের সর্বশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার বিবর্তনের স্বরূপ প্রদর্শন, তা হলে উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং বিশেষ করে শেষ কুড়ি বছরের ইতিহাস খুব বিশদ্‌ভাবে অনুশীলন প্রয়োজন। ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান স্বরূপ অবশ্য আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের প্রথম ধাপগুলি আমরা গত শতাব্দীতেই পার হতে আরম্ভ করেছিলাম। কলকাতা, বোম্বাই ও আমেদাবাদে, ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জে, আসাম, ডুয়ার্স এবং নীলগিরিতে নূতন শ্রমিক শ্রেণী তখনই গড়ে উঠতে আরম্ভ

করেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে শিল্পাশ্রিত নূতন ধনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এই সময়ে। অর্থাৎ, উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংলণ্ডে যে পরিবর্তনগুলি দেখা যাচ্ছিল— জমিদারের প্রতিপত্তির হ্রাস, নূতন-গজানো ধনিকশ্রেণীর প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তি ও দুর্দশাময় অস্তিত্ব, অল্প মজুরি ও বেশি খাটুনি, স্ত্রীলোক এবং শিশু শ্রমিকের নিয়োগ— এবং সঙ্গেসঙ্গে কিছুকিছু শিক্ষা ও জনসংরক্ষণ-আইনের বিস্তার— এর সবই আমাদের দেশে শতাব্দীর শেষে অল্প অল্প দেখা দিয়েছিল। এবং এ কথাও বোধ হয় বলা যায় যে, ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে অবস্থা এবং মনোভাব থেকে হুইগ্‌-পন্থার জোর বাড়ছিল, প্রায় সে রকম অবস্থা এবং মনোভাব থেকেই ভারতবর্ষে শতাব্দীর শেষভাগে কংগ্রেস ইত্যাদির উৎপত্তি: দুয়েরই মূল ছিল নূতন শিল্পাশ্রিত ধনিকশ্রেণী এবং চাকুরি ও অন্যবিধ উন্নতিকামী মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অর্জন।

উনিশ শতকের শেষার্ধের আর্থিক ইতিহাসের স্বরূপ রমেশচন্দ্র বা দাদাভাই নওরোজি ঠিক বুঝতে পারেন নি, কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। নওরোজির 'ভারতে দারিদ্র্য এবং অ-ব্রিটিশ শাসন' রমেশচন্দ্রের সুরেই বাঁধা, তবে সুর কোনো কোনো জায়গায় আরো একটু চড়া; অন্য দিকে রমেশচন্দ্রের লেখায় ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর। দু জনের লেখারই প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের সমালোচনা। সমালোচনার প্রবল উৎসাহে রমেশচন্দ্র পাতার পর পাতা আফগান-যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, নেপিয়ারের সিন্ধুবিজয়ের ন্যায়সংগততা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, শিখ-যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, ড্যালহৌসির 'ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্স' কী করে দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে প্রযুক্ত হল তার কাহিনী একটি-একটি করে বিবৃত করেছেন।

আর-একটা জিনিসও এখানে মনে রাখা দরকার। নওরোজি ও রমেশচন্দ্র দু জনেরই লেখা পড়লে এ কথাটা স্পষ্ট হয় যে তাঁরা বই লিখেছিলেন ইংরেজ পাঠকের জন্য, ভারতীয় পাঠকের জন্য নয়। বহুস্থানে খোলাখুলি ইংরেজ পাঠকের বোধশক্তি এবং ন্যায়বিচার-জ্ঞানের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে, এবং ইংরেজ-শাসনের অন্যায়-অবিচার প্রতিপন্ন করার জন্য ইংরেজ লেখকের মন্তব্য পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। রমেশচন্দ্রের বই-দুখানা পড়লে অনেক জায়গায় মনে হয় যে তিনি প্রধানত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে এবং সাক্ষীদের নির্ভরশীলতা প্রমাণ করতেই ব্যস্ত (রমেশচন্দ্র শুধু বিচারক ছিলেন না, ব্যারিস্টরও ছিলেন)। এবং আরো মনে হয় যে, তাঁর প্রচণ্ড ভয় ছিল যে তাঁর কথা ইংরেজ পাঠক বিশ্বাসই করবে না যদি না তিনি তাঁর অনুকূলে যে সব বক্তব্য পাওয়া যায় সেগুলি পুরোপুরি উপস্থিত করেন। এটাও তিনি বুঝেছিলেন যে, এইসব অনুকূল মন্তব্য এমন লোকের লেখা থেকে আসা চাই যাদের বিশ্বাস করতে ইংরেজের বাধবে না— ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর, বোর্ড অব কনট্রোল বা ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সদস্য, ভারতসরকারের অর্থসচিব, প্রাদেশিক লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর বা অন্তত সিভিল সার্ভিসের উচ্চকর্মচারী। শেষপর্যন্ত এই ধারণাই পাঠকের মনে আসে যে, বই-দুখানি ইংলণ্ডের রাজনীতি-সচেতন পাঠকের কাছে ভারতবর্ষের রাজনীতি-সজ্ঞান বুদ্ধিজীবীর আবেদন।

এতক্ষণ যা বলা হল সেটা রমেশচন্দ্রের কৃতিত্বের সমালোচনা নয়। আগেই বলেছি, রমেশচন্দ্র যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন, সেটা যে-কোনো দেশেই দুর্লভ; বিশেষত ১৯০২-১৯০৪এর

ভারতবর্ষে কোনো ভারতীয় লেখকের পক্ষে এ রকম বই লেখা যে সম্ভব হয়েছিল সেটা আশ্চর্য। কিন্তু রমেশচন্দ্র যে পথের নির্মাতা সে পথ আজ পঞ্চাশ বছরেও প্রশস্ত হল না, এটা আরো বড় বিস্ময়। ঠিক রমেশচন্দ্রের ধরনে লেখা বই অবশ্য আরো কয়েকটি দেখতে পাওয়া যাবে। বামনদাস বসু ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের বিনাশের উপরে বই লিখেছিলেন— রমেশচন্দ্রের রচনার মত বিষয়বিন্যাস, রচনাসৌকর্য এবং যুক্তিসংগতি তাতে নেই, কিন্তু ইতিহাস রচনার চেষ্টা হিসাবে বইখানি উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলা দেশের বাইরে আর্থিক ইতিহাসের পর্যালোচনা হয় নি বললেই চলে; বাঙালি লেখকদের মধ্যে যোগীশচন্দ্র সিংহ প্রমুখ কয়েকজন যুগ-বিশেষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বই লিখেছেন, কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাসের অভাব আমাদের এখনো থেকে গেছে।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বা ইতিহাস বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্তব্য এই অভাব যথাসাধ্য মোচন করা। পঞ্চাশ বছর আগে ইতিহাস রচনার যে উপকরণ পাওয়া যেত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি উপকরণ অনেক সহজে পাওয়া যাবে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমসের ইতিহাস রচনাকারী আজকাল ইণ্ডিয়া অফিসে না গিয়েও এমন মুদ্রিত কাগজপত্র দেখতে পারেন (যথা, ফস্টার-সংকলিত ভারতে ইংরেজ 'ফ্যাক্টরি'র চিঠিপত্র) যেগুলি রমেশচন্দ্রের আমলে সহজপ্রাপ্য ছিল না। কিন্তু এটাই একমাত্র কথা নয়। যে মূল থেকে রমেশচন্দ্র তথ্য আহরণ করেছিলেন সেগুলিও আবার বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র যেসব সিদ্ধান্তের প্রমাণ খুঁজেছিলেন সেগুলি অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু আরো অনেক জিনিসের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা আছে। উদাহরণ স্বরূপ বুকাননের রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮০০ অব্দে ওয়েলেসলি ফ্রান্সিস বুকানন নামে একজন ডাক্তারকে (পরে এঁর নাম হয়েছিল বুকানন-হ্যামিলটন) দক্ষিণভারতের অভ্যন্তর প্রদেশের লোকজনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করতে বলেন। প্রায় একবৎসর কাল ধরে বুকানন কর্নাট, মহীশূর, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর রিপোর্ট পরে তিনটি বিরাট খণ্ডে মুদ্রিত হয়। এর পরে আবার তাঁকে উত্তরভারতে এই রকমের তদন্ত করতে বলা হয়; ১৮০৭ থেকে সাত বৎসর কাল ধরে বুকানন পাটনা, বেহার, শাহাবাদ, ভাগলপুর, গোরখপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তথ্যানুসন্ধান করে বেড়ান। বুকাননের উত্তরভারত সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি অনেকদিন অপ্রকাশিত ছিল— মণ্টেগোমরি মার্টিন ১৮৩৮এ এগুলির কিছুকিছু অংশ উদ্ধার করেন এবং এই উদ্ধৃতি থেকে রমেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে অনেক উক্তি সংগ্রহ করেন।

আজকাল বুকাননের রিপোর্ট পাওয়া অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিসের সংগ্রহ যাঁরা দেখতে পারেন তাঁদের বাদ দিলেও বিহার-উড়িষ্যা গবেষণাসমিতির পুনর্মুদ্রিত 'ভাগলপুর' বা 'শাহাবাদ রিপোর্ট' এখন এ দেশের গবেষকদের কাছে সহজপ্রাপ্য। বুকাননের রিপোর্টে জনসাধারণের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। কোন্ জেলায় কত লোক কি ব্যবসায় করে, কোন্ জিনিস কতটা উৎপন্ন হয়, চালডালের দাম কত, বিভিন্ন ব্যবসায়ে ও বৃত্তিতে আয় এবং মজুরির তারতম্য কী রকম, এবং এমনকি মাথা-পিছু খাদ্যব্যয় কোন্ অঞ্চলে কত— কিছুই বুকাননের চোখ এড়ায় নি। অবশ্য, মাত্র একজন তথ্যানুসন্ধানীর দেওয়া খবর ইতিহাসের বিচারে সম্পূর্ণ প্রমাণ নয় এবং বুকানন কী পদ্ধতিতে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন সেটাও বিচার্য; কিন্তু ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে যে-কোনো তথ্যসংগ্রহেরই গুরুত্ব

আছে এবং সেদিক থেকে এই রিপোর্টগুলি অমূল্য সম্পদ। বিশদ ইতিহাস রচনায় সামান্য খুঁটিনাটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে-উঠতে পারে ; ভারতবর্ষের গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইতিহাসে যখন জনসাধারণের অবস্থা বিবৃত করা হবে তখন ত্যুবোয়া বা বিশপ হেবারের তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনা থেকেও যে সাহায্য পাওয়া যাবে না একথা বলা যায় না। সরকারি রিপোর্ট, পার্লামেন্টের বক্তৃতা ইত্যাদির সঙ্গে ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরি, আদালতের মোকদ্দমার রিপোর্ট, দোকানের হিসাব, জমিদারের নায়েবের খাতাপত্র, ব্যক্তিগত চিঠি সবই উপকরণের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। সিয়র-উল-মুতাখরিন বা সুবিখ্যাত 'ফিফ্‌থ্‌ রিপোর্ট' যেমন কাজে লাগবে, তেমনি কাজে লাগবে আনন্দরঙ্গ পিল্লে-র রোজনামচা, বা ঈভ্‌স্‌এর ভ্রমণকাহিনী, বা পামার কোম্পানির হিসাব ও চিঠির ফাইল।

পূর্বভারতের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার ইতিহাসের অনেক উপকরণ বাংলা সংবাদপত্রে পাওয়া যাবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৮ থেকে ১৮৪০এর সমাচার-দর্পণ থেকে যে সংকলন প্রকাশ করেছেন তার মধ্যেই অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পাই : ১৮১৯এর কাছাকাছি সময়ে কলকাতাবাসী ওড়িয়ারা বছরে তিন লক্ষ টাকা দেশে পাঠাত বা নিয়ে যেত ; কলকাতা এবং শ্রীরামপুরে সেভিংস এবং 'কমরস্যল' ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল আজ থেকে সোয়াশ বছর আগে ; ১৮২৬এ নৌকোযোগে বাহিত ব্যবসায়-সওদার বীমার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য 'গেঞ্জেস রিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানি' স্থাপিত হয়েছিল এবং তার কিছু পরে চেষ্টা হয়েছিল গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে একটি 'লাইফ আস্যুরেন্স সোসৈটি' স্থাপনের ; তামার পয়সার অভাবে ১৮৩০-৩৭এ 'ঘসা পয়সা' এবং নূতন পয়সার মধ্যে বিনিময়ের হারে তারতম্য এসেছিল ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথের সংকলনে আরো দেখি আর্থিক সমস্যার নানা বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ—'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য', 'ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য', 'কোম্পানির লবণমাসুলের পূর্ব্ব-বিবরণ', 'ক্লোনাইজেসিয়ান— অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাসবাস বিষয়ক', 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'চরকা-কাট্‌নির দরখাস্ত', 'ঢাকাশহরের লোকসংখ্যা' ইত্যাদি— আর তা ছাড়া মাঝেমাঝে আমদানি-রপ্তানির হিসাব, 'বাজার ভাও' এবং এমনকি কোম্পানির কাগজের প্রিমিয়মের হার।

ব্রজেন্দ্রনাথের সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি বাংলা খবরের কাগজের কার্যকলাপ এবং কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া— আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যেসব খবর তিনি সংকলিত করেছিলেন সেগুলি অনেকটা নমুনার মত। কিন্তু এই টুকরো টুকরো সংগ্রহ থেকেই সহজে বোঝা যায় যে, তখনকার সম্পাদক এবং পাঠক তৎকালীন আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আর্থিক ইতিহাসের আধুনিক গবেষক যদি তাঁর ইতিহাস-রচনার অঙ্গ হিসাবে পুরোনা খবরের কাগজের পাতা ভালো করে পড়ে দেখেন তা হলে ভারতবর্ষের, বিশেষত পূর্বভারতের, আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর পাবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাস রচনায় অনেক ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক থেকে মালমসলা সংগ্রহ করা যাবে। এই সময়টাতে সরকারি রিপোর্টের সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি। 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্', 'মেণ্টাল অ্যাণ্ড মেটিরিয়াল প্রগ্রেস' রিপোর্ট ইত্যাদির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ; তাছাড়া এ সময়টা সম্বন্ধে নানা সরকারি তদন্তকমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি থেকে আহৃত উপকরণ ছাড়াও পাওয়া দরকার দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণ ও সমস্যা সম্বন্ধে সমসাময়িক আলোচনা। এর জন্যেই বিশেষত সাময়িক পত্রিকার উপরে নির্ভর করতে হবে।

১৮৬০ থেকে ১৮৯০এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান ইংরেজি দৈনিকগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছিল— ১৮৬১তে বোম্বাইয়ের কয়েকটি কাগজের সম্মেলনে 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া'র উৎপত্তি হয়; এলাহাবাদের 'পায়োনীয়র' বেরোয় ১৮৬৫তে; এর তিন বছর পরে বাংলা সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা বেরতে আরম্ভ করে এবং ১৮৭৮এ ইংরেজি কাগজে পরিণত হয়; কলকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ও মাদ্রাজের 'হিন্দু'ও এই সময়টাতেই প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রগুলির অনেক পুরোনো ফাইল এখনো দুষ্প্রাপ্য হয় নি— এদের চেয়েও পুরোনো 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার কপিও এখন পর্যন্ত অনেক সংগ্রহে আছে। অনেক উপকরণ বিদেশী— বিশেষত লণ্ডনের— সংবাদপত্রে বা অন্য সাময়িক পত্রিকায় পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ইকনমিস্ট'এর গত শতাধিক বৎসরের প্রায় সব সংখ্যা অনেক লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়— এগুলিতে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও খবর বেরিয়েছিল। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে 'ইকনমিস্ট'এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক উইলসন কোম্পানির আমলের অবসানের পরে ভারতবর্ষের প্রথম অর্থসচিব। 'ইকনমিস্ট'এর মতবাদ অনেক জায়গায়ই একদেশদর্শী— উনিশ শতকে উদারতা আশা করাই অন্যায়— কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে সব মতামতেরই গুরুত্ব আছে, আর তথ্যসংগ্রহে সুকুল-দুকুলে তারতম্য করা চলে না।

রমেশচন্দ্র তাঁর ইতিহাস-রচনা-কালে হ্যানসার্ডএর উপরে অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন। আমাদের আর্থিক ইতিহাসের নূতন গবেষক নিশ্চয়ই আবার হ্যানসার্ড তন্ন তন্ন করে পড়বেন। রমেশচন্দ্রের চোখে যা পড়ে নি কিংবা তিনি যে সংবাদ বা মন্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি সেগুলি বর্তমান কালের গবেষকের চোখে হয়তো প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। তা ছাড়া উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, অর্থাৎ ১৮৯২র পর থেকে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার আলোচনাও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন হবে। আরো উপকরণ পাওয়া যাবে চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার কাগজপত্রে এবং কংগ্রেসের বার্ষিক রিপোর্ট ও প্রস্তাবে। উনিশ শতকের শেষ দিকে কংগ্রেস ইকনমিক কমিটি নামে ছোট একটি সমিতি লণ্ডন থেকে কাজ করতো; এদের প্রধান কাজ ছিল ভারতসরকারের আয়ব্যয় ও কর্মনীতির আলোচনা। এই কমিটির প্রকাশিত অনেকগুলি রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে না পাওয়া গেলেও ইংলণ্ডে পাওয়া যাবে, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের 'প্যাম্‌ফ্‌লেট' সংগ্রহে কয়েকখানি আছে।

অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস রচনার সম্পূর্ণ উপাদান দেশের ভিতরে পাওয়া যাবে না— অনেক জিনিস ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য, এবং যেগুলি এখানে এবং বিদেশে দু জায়গায়ই পাওয়া যায় সেগুলিও বিদেশে সহজপ্রাপ্য। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে বিরাট পুস্তক এবং রিপোর্টসংগ্রহ লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সে আছে তার কাছাকাছিও কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি লাইব্রেরিতে নেই। আর তাছাড়া বইগুলি সুন্দর ভাবে তালিকাভুক্ত করা আছে। যে-কোনো বই পেতে পাঁচমিনিটের বেশি দেরি হয় না। অলড্‌উইচে ইণ্ডিয়া হাউসের সংগ্রহও মূল্যবান, কিন্তু অনেক দিকে অসম্পূর্ণ। পুরোনো সরকারি কাগজপত্রের জন্য ইণ্ডিয়া অফিস (বর্তমান কমনওয়েল্‌থ্‌ রিলেশন্‌স্ অফিস)এর সংগ্রহ অমূল্য। মুদ্রিত বইও ইণ্ডিয়া অফিসে প্রায় সবই পাওয়া যায়—ভারতবর্ষে যতদিন ইংরেজ রাজত্ব ছিল ততদিন ভারতে মুদ্রিত সব বইয়ের এক কপি ইণ্ডিয়া অফিসে পাঠানো হত। ভারতবর্ষে বসে পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস রচনার কাজ অনেকদূর অগ্রসর করা যায়, কিন্তু কাজটা সহজে

সম্পূর্ণ করা যাবে না। এখানকার গবেষক-ছাত্ররা জানেন যে, তাঁদের গবেষণাকালের বারো আনা চলে যায় বইয়ের খোঁজ করতে, বই কোন্ লাইব্রেরিতে আছে সেটা বা'র করতে, বই লাইব্রেরিতে আছে জানতে পারার পরেও ক্যাটালগ থেকে সেটা উদ্ধার করতে এবং ক্যাটালগে নাম পাবার পরে সেটা লাইব্রেরি কর্মচারীদের হাত থেকে নিজের হাতে আনতে।

কিন্তু এসব হল কাজ আরম্ভ করার অনেক পরের কথা। আসল কথা হল যে, ভারতবর্ষের বিশদ এবং সুসম্বদ্ধ আর্থিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, কিন্তু রচনা করা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। রমেশচন্দ্র যে পথ খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন সে পথ আজ পর্যন্ত কোনো উপযুক্ত ইতিহাসবিদ্ গ্রহণ করলেন না। অবশ্য এ কাজে যিনি অবতীর্ণ হবেন তাঁর প্রতিভা হতে হবে বহুমুখী। অর্থনীতিতে, বিশেষ করে আর্থিক সমাজের সামগ্রিক বিবর্তন ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত যে অর্থনীতি আজকাল পণ্ডিতজনগ্রাহ্য তাতে, তাঁর সহজ অধিকার থাকা চাই, ইতিহাসের জ্ঞান হওয়া চাই বিশাল, চাই ঐতিহাসিকের সমগ্র পটভূমিকা পরিব্যাপ্ত ও ত্রিকালবিস্তৃত দৃষ্টি এবং সঙ্গেসঙ্গে অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধৈর্য। হয়তো কোনো একজনের পক্ষে এতবড় কাজ সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তা হলে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এদিকে অগ্রসর না হলে আমাদের পরিপূর্ণ আর্থিক ইতিহাস কোনো দিনই লেখা হবে না। যে ভাবে 'কেম্‌ব্রিজ ইতিহাস'গুলি লেখা হয়েছিল (রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলছি— ইংলণ্ডের আর্থিক বিবর্তনের 'কেম্‌ব্রিজ ইতিহাস' মূলত একা ক্ল্যাপহামের লেখা) সেভাবে কাজ ভাগ করে এই ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন— কাজ ভাগ হবে কালানুসারে, বিষয়-অনুসারে নয়। বিষয়-অনুসারে কেউ লিখবেন কৃষির উন্নতির বা অবনতির ইতিহাস, কেউ লিখবেন রেলপথের ইতিহাস, কেউ-বা লিখবেন মুদ্রানীতি বা শুল্কনীতির ইতিহাস। সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ জাতীয় রচনা আমাদের অনেক হয়েছে, কিন্তু এগুলি থেকে দেশের সমগ্র আর্থিক পটভূমিকার বিবর্তন প্রকাশিত হয় না। কালানুসারে কাজ ভাগ হলে প্রত্যেক লেখক বা লেখকদলের উপরে কয়েক বৎসর বা দু-তিন দশকের ইতিহাস রচনার ভার পড়বে— এঁরা চেষ্টা করবেন যাতে তাঁদের সময়টার আর্থিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ এবং সংযুক্ত পরিচয় দিতে পারেন এবং যাতে এই সময়ের আর্থিক অবস্থা কী করে পূর্ববর্তী কালের অবস্থা থেকে উদ্ভূত হল ও কী করে পরবর্তী কালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারও একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কালানুসারে ভাগ ঠিক কীভাবে হবে সেটা অনেক প্রাথমিক বিবেচনার পরে করা প্রয়োজন— এবং কাজ আরম্ভ করার পরেও প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হতে পারে। যদি আমরা আপাতত গত দু শ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর দিই তা হলে উপক্রমণিকা (১৭৬৫ পর্যন্ত) ছাড়া ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩, ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩, ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩, ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৭, ১৮৫৮ থেকে ১৮৭২, ১৮৭৩ থেকে ১৯০০, ১৯০১ থেকে ১৯১৪, ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ এবং ১৯৪৭ থেকে বর্তমান কাল— এই কয় অংশে কাজ ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এতটা বিশদভাবে কাজ ভাগ করলে বারোটি লেখক বা গবেষকগোষ্ঠী একসঙ্গে প্রয়োজন। কোনো-একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এত লেখক বা গবেষক সংগ্রহ করা কঠিন হবে; কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে এ কাজ সহজ হবে না। যদি এতটা বড় কাজ প্রথমেই সম্ভব না হয়,

তাহলে ১৭৬৫ থেকে ১৮১৩, '৮১৩ থেকে ১৮৫৭, ১৮৫৮ থেকে ১৯০০, ১৯০১ থেকে ১৯১৮, ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ এবং ১৯৩৯ থেকে বর্তমান কাল— এই ছয় খণ্ডে কাজটা ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যদি এ রকমের একটা পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা হলে তিন-চার বছরের মধ্যে প্রত্যেক খণ্ডের কাজ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। বিভিন্ন খণ্ডের অন্য যে মালমসলা বিদেশ থেকে আনা প্রয়োজন তার জন্য বিশেষ করে কয়েকজনকে নিযুক্ত করা যেতে পারে; কাজটা কিছুটা অগ্রসর হলে কোথায় কোন্ ফাঁক রয়ে গেল সেটা বোঝা সম্ভব হবে এবং তখন কোন্ উপকরণের সন্ধান প্রয়োজন তাও পরিষ্কার হবে। কাজ আরম্ভ হবার পরে পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের গত দুশ বছরের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস সম্পূর্ণ প্রকাশযোগ্য হবে এটা আশা করা বোধ হয় অসংগত হবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি এ ধরনের কাজে হাত দেয় তা হলে তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে— পরীক্ষা নেওয়াই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ নয় এ কথা বোধ হয় কর্তৃপক্ষদের আবার মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে।
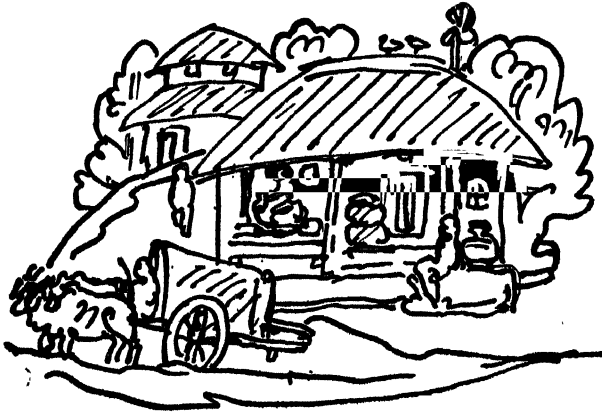
একটি দুর্লভ রচনা

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিভাগ অধিকার করেছে প্রবন্ধসাহিত্য। প্রবন্ধসাহিত্য প্রধানত শিক্ষিত সমাজের মননশক্তির পরিচয়বাহী। তথ্য ও তত্ত্ব, প্রমাণ ও যুক্তি প্রবন্ধসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই বুদ্ধিপ্রধান মননপ্রবন্ধ ছাড়াও রসপ্রবন্ধ একটি বিশেষ শিল্পসৃষ্টি। আঠারোর শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে অন্যান্যদের সঙ্গে রসপ্রবন্ধকাররূপে এডিসন ও স্টীলের নাম যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় চির-উজ্জ্বল। তাঁরা যে কৌতুকদীপ্ত ব্যঙ্গ-ঝলসিত অথচ ঈর্ষার মালিন্যহীন রসপ্রবন্ধের প্রকাশ আরম্ভ করেন 'ট্যাট্লার' (১৭০৯) ও 'স্পেক্‌টেটর' (১৭১১) পত্রিকায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যে তার প্রথম ও সার্থক অনুসরণ লক্ষ্য করি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) লিখিত 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' রচনাটিতে। এই রচনাটিকে দুর্লভ বলছি এই অর্থে যে, বাংলা গদ্যের বিষয় ও রীতি সম্পর্কিত যতগুলি মুদ্রিত আলোচনা-গ্রন্থ আছে, সেগুলির কোথাও এই রচনাটির নামোল্লেখ পর্যন্ত দেখা যায় না। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা-সাহিত্যে প্রথম এডিসন-স্টীল ধারার প্রবর্তক ব'লে সম্মান পেয়ে আসছেন। কিন্তু এই সম্মান প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বসুর প্রাপ্য। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর রাজনারায়ণ বসুর রচনাটি 'ইংরাজী গ্রন্থকর্তা এডিসনকে আদর্শ করিয়া ১২৬৩ সালে লিখিত', অর্থাৎ 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনারও নয় বছর আগে। রচনাটির পরিচয়দান-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

> 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' এডিসনের স্পেক্‌টেটরের প্রথম দুই সংখ্যাকে আদর্শ করিয়া লিখিত। উহাতে যেসকল ব্যক্তির চরিত্র আঁকা হইয়াছে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র দুইতিনজন যথার্থ জীবিত ছিলেন অথবা আছেন এমত ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সংরচিত।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, স্পেক্‌টেটরের প্রথম পত্র এডিসনের ও দ্বিতীয় পত্র স্টীলের রচিত। রাজনারায়ণ নিজের রসবোধ ও শিল্পসৃষ্টির সাহায্যে স্পেক্‌টেটরের রচনা-দুটির অনুসরণ করলেও প্রায় মৌলিক সৃষ্টিই করেছেন। রচনাটির প্রথমদিকে, অর্থাৎ আত্মবিবরণ অংশে, এডিসনের রচনার প্রভাব বেশি, কিন্তু 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের' পরিচয়-অংশে তিনি স্টীলের রচনাটির ছাঁচটিকেই নিয়েছেন মাত্র। সেই ছাঁচে যে মূর্তিগুলি গড়ে তুলেছেন তার গঠনকৌশল দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যাঁরা স্পেক্‌টেটর পড়েন নি তাঁদের কাছে রচনাটি সম্পূর্ণ মৌলিক বলে মনে হবে। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সানন্দে লক্ষ্য করবেন কি সুন্দর অথচ দুরূহ উপায়ে অসাধারণ সাবলীলতায় রাজনারায়ণ স্পেক্‌টেটর-বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রগুলির সম্পূর্ণ বাঙালি রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বক্তব্যের সমর্থনের জন্য উভয় রচনা থেকে দীর্ঘ সাদৃশ্যমূলক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এডিসন লিখেছেন—

> I have observed that a reader seldom peruses a book with pleasure till he knows whether the writer of it be a black or a fairman, of a

mild or choleric disposition, married or bachelor, with other particulars of the like nature, that conduce very much to the right understanding of an author. To gratify this curiosity which is so natural in a reader I design this paper and my next as prefatory discourses to my following writings and shall give some account in them of the several persons that are engaged in this work. As the chief trouble of compiling, digesting and correcting will fall to my share, I must do myself the justice to open the work with my own history. —SPECTATOR, March 1. 1711.

রাজনারায়ণ লিখেছেন—

এই আত্মীয়সভার সদস্যদিগের বিবরণ করিতে গিয়া প্রথমে আমার নিজের বিবরণ করিব। তাহা হইলে দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ লেখক কে, ইহা জানিতে পাঠকবর্গের স্বভাবতঃ যেরূপ কৌতূহল হইয়া থাকে সে কৌতূহল চরিতার্থ করা হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়সভার একজন সদস্যের বিবরণ করা হইবে। লেখক দীর্ঘনাসিক কি খর্বনাসিক, তিনি হ্রস্বকায় বা দীর্ঘকায়, তিনি যুবক অথবা বৃদ্ধ, তিনি গম্ভীরস্বভাব অথবা লঘুস্বভাব, এইসকল বিষয় অবগত হওয়া পাঠকবর্গ গ্রন্থের দোষগুণবিচার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন, অতএব সেই কৌতূহল অগ্রে চরিতার্থ করা কর্তব্য। —আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ২য় অনুচ্ছেদ

এর পরের কিছু অংশের স্পেক্‌টেটরের বর্ণনার সঙ্গে মিল নেই। তার ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' ও 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে—

অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে পিতামহ পর্যন্ত সকলেই নবাব ও ইংরাজ সরকারে ভাল ভাল কর্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে তালুক মুলুক হইতে পারিত, কিন্তু কোটা নির্মাণ না করিয়া, স্ত্রীকে স্বর্ণঅলঙ্কার না দিয়া ও তালুক ক্রয় না করিয়া বস্ত্র ও স্বীয় গৃহিণীদিগের প্রস্তুত রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জন বহুসংখ্যক লোককে প্রত্যহ বিতরণ করা বাটীর রীতি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহাতে কেবল বাটীর কর্তা ঘৃত ভক্ষণ না করিয়া সকল ভোক্তারাই তাহা ভক্ষণ করিতে পায়, এই জন্য অন্ন প্রস্তুত হইলে সেই উষ্ণ অন্নরাশির উপরে একবারে অধিক পরিমাণে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইত।

—ঐ। ৩য় অনুচ্ছেদ

তুলনীয়—

রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণদানে অনেকফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম বলিয়া গণিত হইত। একটি খড়ো বাড়ী (সেকালে কোটাবাড়ী করিবার রীতি তত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈঁচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুইবেলা একশত পাত পড়িত। পিতামহী ঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন এবং কেবল বাটীর কর্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য প্রস্তুত রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দিতেন। —আত্মচরিত। পৃ ৩

এবং

সেকালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত। সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্তা যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করান হইত।

—সেকাল আর একাল। পৃ ৮১

এডিসনের রচনাটিতেও অবশ্য আত্মবর্ণন ব্যাপারে বাল্য, পিতৃপরিচয় প্রভৃতি আছে। রাজনারায়ণ সূত্রটি অবলম্বন করেছেন মাত্র। এডিসনের রচনাটিতে মাতা কর্তৃক পুত্রের জজ হবার স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গের পর আছে—

The gravity of my behaviour at my first appearance in the world and at the time that I sucked, seemed to favour my mother's dream; for as she has often told me I threw away my rattle before I was two months old and would not make use of my coral until they had taken away the bells from it. —SPECTATOR, March 1, 1711.

রাজনারায়ণ এই অংশের বাঙালি রূপান্তর সাধনে অপূর্ব চাতুর্য ও লিপিকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

গাম্ভীর্য, নিস্তব্ধতা ও চরিতদর্শন প্রভৃতি আমার স্বভাবের এইসকল লক্ষণ বাল্যকালেও আমাতে লক্ষিত হইয়াছিল। আমার মাতাঠাকুরাণী কহিতেন যে আমার বাল্যকালাবধি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় গম্ভীরমূর্তি ছিল, ও ঐ কালে আমি তাঁহাকে খোঁপা বাঁধিতে দিতাম না ও যদ্যপি খোঁপা বাঁধিতে দিতাম তথাপি সোনার পুঁটে তাহাতে কখনই দিতে দিতাম না এবং ঘুঙ্গুর হইতে কড়াইগুলি পৃথককৃত না হইলে তাহা পায়ে দিতাম না। বাল্যকালে আমার গম্ভীরমূর্তি দেখিয়া সকলেই কহিত আমি সদরল সদুর হইব। আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৩য় অনুচ্ছেদ

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সেকালের জজ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সার্ জন শোর ও বিচারপতি সার্ উইলিঅম জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ' ও 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' রচনা করেন। তিনি উইলিঅম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক ও রাজা নবকৃষ্ণের গুরু ছিলেন। এডিসনের রচনাটিতে মাতা কর্তৃক স্বপ্নে পুত্রের জজ হওয়ার দৃশ্যদর্শনকে রাজনারায়ণ 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' ও 'সদরল সদুর' দিয়ে ঘুরিয়ে রূপ দিয়েছেন।

ছাত্রজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এডিসন থেকে ঋণস্বরূপ গৃহীত হলেও তার সঙ্গে রাজনারায়ণের আত্মচরিতের ঘটনাও কিছু কিছু মেলে। এডিসন লিখেছেন—

I had not been long at the University, before I distinguished myself by a most profound silence; for during the space of eight years excepting in the public exercises of the college I scarce uttered the quantity of a hundred words; and indeed do not remember that I even spoke three sentences together in my whole life. Whilst I was in the learned body

I applied myself with so much diligence to my studies, that there are very few celebrated books, either in the learned or the modern tongues which I am not acquainted with. —SPECTATOR, March 1. 1711.

রাজনারায়ণ লিখেছেন—

কলেজে কিছুদিন পাঠ না করিতে করিতে অপরিমেয় গাম্ভীর্য জন্য খ্যাতিলাভ করিলাম। আমার এমন স্মরণ হয় না যে, যে আট বৎসর মাস্টার সম্মুখে প্রবন্ধপাঠ ও টাউনহলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর পাঠের সময় ব্যতীত আমি কখনও গোনা দশটি কথার অধিক এককালে কহিয়াছি। কলেজে অধ্যায়নকাল দুরে থাকুক আমার সমস্ত জীবনে এমন ঘটনা হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি যে সময়ে কলেজে ছিলাম, সে সময়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারসী এই তিন ভাষায় সমান মনোযোগ প্রদান করিতে হইত ও গোরক্ষক যেমন গোরুকে কখন কখন স্বাধীনভাবে সঞ্চরণ করিতে দেয়, তেমনি উচ্চ উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অধীত বিষয় সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রদত্ত হইবে তাহা বলিয়া না দেওয়াতে সেই বিষয় সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পাঠ করিতে হইত। যে কয় বৎসর কলেজে ছিলাম, সে কয় বৎসর এমনি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে বোধ হয় উক্ত ভাষাত্রয়ে এমন অল্প পুস্তক আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৩য় অনুচ্ছেদ

রাজনারায়ণ বসুর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাদান, বৃত্তিলাভ, টাউনহলে প্রশ্নের উত্তরপাঠ এবং ইংরেজি, বাংলা ও পারসী তিনটি ভাষায়ই তাঁর শিক্ষালাভ ও দক্ষতার কথা 'আত্মচরিত' গ্রন্থের "শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা" অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া তখনকার দিনে নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তু না থাকায় রাজনারায়ণকে যে কত বেশি পড়তে হত তার তালিকাও তিনি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

পুরাবৃত্তে কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

Hume's History of England. (Unabridged)

Gibbon's Roman empire. (Unabridged)

Mitford's History of Greece.

Fergusson's Roman Republic.

Elphinstone's India.

Russel's Modern Europe.

সর্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভলুম হইবে। —আত্মচরিত। শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা

এডিসনের রচনাটিতে এর পর পিতার মৃত্যু ও দেশভ্রমণের কাহিনীর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। রাজনারায়ণ এডিসনকে অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু সে শুধু ছাঁচটুকু, ভিতরের মাল-মসলা সব তাঁর। তিনি সব জিনিসটার এমন স্বদেশী চেহারা গড়ে দিয়েছেন যে বিদেশী গন্ধটুকুও পাবার জো নেই। এডিসন লিখেছিলেন—

Upon the death of my father I was resolved to travel into foreign

countries and therefore left the University with the character of an old, unaccountable fellow that had a great deal of learning if I would but show it. An insatiable thirst after knowledge carried me into all the countries of Europe in which there was anything new or strange to be seen; nay, to such a degree was my curiosity raised, that having read the controversies of some gentlemen concerning the antiquities of Egypt, I made a voyage to Grand Cairo on purpose to take the measure of a pyramid; and as soon as I had set myself right in that particular, returned to my native country with great satisfaction. —SPECTATOR March 1, 1711

আর, রাজনারায়ণ লিখেছেন—

পিতার পরলোকের পর বিদেশভ্রমণের সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। আমি যথার্থ বিদ্বান, কিন্তু বাক্‌পটুতা ও বিদ্যা দেখাইবার ক্ষমতা না থাকাতে কোন কাজের নহি, কলেজ পরিত্যাগের সময়ে সকলে আমার বিদ্যা-ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসা-বশতঃ আমি ভারতবর্ষের সকল স্থান ও নিকটস্থ সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি। গঙ্গানদীর নিঃসরণস্থান গোমুখী, ডেরাডুন নামক সুরম্য দরীভূমি, পঞ্জাবের নিকটস্থ ও ঋক্‌মন্ত্রে উদ্‌গীত সরস্বতী নদী, স্বপ্ন-বিলোকিত কোন অপূর্ব দর্শনের ন্যায় পরম রমণীয় তাজমহল, বন-উপবন দ্বারা আকীর্ণ তট, বোম্বাই ও মহাবালীপুরের নিকটস্থ পর্বতক্ষোদিত আশ্চর্য দেবালয় ও দেবমূর্তি, চন্দনবনপূর্ণ মলয়পর্বত— যাহা এক্ষণে ঘাট-পর্বত নামে আখ্যাত, তুষারমণ্ডিত মহোচ্চ ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাশ্মীরের নির্মলহ্রদ ও মনোহর উদ্যান ইত্যাদি অদ্ভুত ও সুন্দরদর্শন দর্শন করিয়া নয়নযুগলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছি।

পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে কৃষ্ণসাগরের নিকটে ককেশস্‌ পর্বতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে এমন একজাতি বাস করে ও বলগা নামক নদী যাহাকে পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী কাপ্তেন উইলফোর্ড সাহেব পুরাণের সূর্যমুখী গঙ্গা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাগরসঙ্গম স্থানের নিকটস্থিত অষ্ট্রাকান নগরে হিন্দুর বসতি আছে ও কাবুলের পশ্চিম হিরাট নামক স্থানে পর্বতের বনাকীর্ণ মন্দিরে কোট্টরী নামে এক পীঠ আছে। ভ্রমণকালীন এইসকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিবার এমনি ঔৎসুক্য জন্মিল যে, ফকিরের বেশে ঐসকল স্থান পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ঐসকল বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া বাঁচিলাম এমন বোধ করিলাম। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৪র্থ অনুচ্ছেদ

রাজনারায়ণকে কলেজে শিক্ষালাভের সময়ে যে পুরাবৃত্ত-বিষয়ক বহু গ্রন্থ পড়তে হয়েছিল, সে-তথ্য পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'আত্মচরিত' গ্রন্থে আরও দেখতে পাই—

কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য সম্পাদন করিবার কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে Science of National and Individual Happiness একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবংএকটি অতি বৃহৎ Universal History লিখিবার কল্পনা এবং উৎকল, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারিবেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল। —আত্মচরিত। পৃ ২১

আত্মপরিচয়মূলক পত্রের শেষভাগে এডিসন যে বর্ণনা দিয়েছেন, রাজনারায়ণ সেই বর্ণনার অনুকরণে যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে সেকালের কলকাতার বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলের কৌতুকরসমণ্ডিত পরিচয় রয়েছে। এডিসন লিখেছেন—

I have passed my latter years in this city where I am frequently seen in most public places, though there are not half-a-dozen of my select friends that know me; there is no place of general resort wherein I do not often make any appearence. Sometimes I am seen thrusting my head into a round of politicians at Will's and listening with great attention to the narratives that are made in those little circular audiences. .In short, wherever I see a cluster of people I always mix with them, though I never open my lips but in my own club. Thus I live in the world rather as a spectator of mankind than as one of the species, by which means, I have made myself a speculative statesman, soldier, merchant and artisan without ever meddling with any political part in life. —SPECTATOR, March 1, 1711.

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক রাজনারায়ণের রচনাংশ—

কয়েক বৎসর হইল আমি এই নগরেই বাস করিয়া আছি। নগরে এমত সমারোহ স্থান নাই যেখানে আমার নীরব মুখটি দৃষ্ট না হয়। জগৎ-দর্শন-রূপ মেলা নিস্তব্ধভাবে দেখিয়া থাকি। আমি সকল প্রকাশ্য-স্থানে গিয়া থাকি। আমি লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের বাড়ীতেও যাই, মুদির দোকানেও বসিয়া থাকি, চিনেবাজার ও একৃস্‌চেঞ্জে বেড়াই, বড়বাজারের মহাজনেরা যেখানে তেজিমুন্দির কথা কহে, সেখানে গিয়া শ্রবণ করি, স্থপ্রীমকোর্ট খুলিবার সময় "ওই এজ ওই এজ্" এই ধ্বনি যে ব্যক্তি নিঃসারণ করে, তাহার ভাব তথায় গিয়া দর্শন করি। মঠ, মন্দির, হট্ট, আপণ, শিল্পশালা, বাণিজ্যগৃহ, সভামণ্ডপ, ধর্মাধিকরণ, রাজকার্যালয় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। ট্রেজরিতে যাইলে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী আমাকে সেই কার্যালয়ের অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী বোধ করে, খোট্টামগুলীতে যাইলে আমাকে হৌসের সদরমেট জ্ঞান করে ও গঙ্গাতীরের রঙ্গ দেখিতে যাইলে মাজিরা নৌকাযানে গমনোদ্যত ব্যক্তি মনে করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করে। যেখানে কতকগুলিন লোক একত্রিত দেখি সেইখানে গিয়া দাঁড়াই, কিন্তু আমার আত্মীয়মণ্ডলী ব্যতীত কুত্রাপি মুখব্যাদন করিনা। এইরূপে মর্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া মর্ত্যলোকবাসীর ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মর্ত্যলোক-পরিদর্শকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি এবং ক্রীড়ামগ্ন ব্যক্তি অপেক্ষা দর্শক তাহার ক্রীড়া-প্রকরণে দোষগুণ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অন্যের কর্ম, আমোদ ও ব্যবহারের দোষগুণ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৫ম অনুচ্ছেদ

এই পর্যন্ত স্পেকটেটরের প্রথম পত্রের সঙ্গে মিল দেখানো গেল। এডিসন লিখেছেন 'friends in a club', রাজনারায়ণ সেই ধরণে 'আত্মীয়সভার সভ্য' নামকরণ করেছেন। তবে 'আত্মীয়সভা' নামটি বোধ হয় রামমোহন-স্থাপিত 'আত্মীয়সভা' থেকে পেয়েছেন।

স্পেকটেটর পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাটি স্টীলের রচনা। এই সংখ্যাটিতে বন্ধুবর্গের পরিচয় একে একে দেওয়া হয়েছে। রাজনারায়ণ পৃথক সংখ্যা রচনা না ক'রে লিখেছেন—

আত্মীয়সভার অন্যান্য সভ্যের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

স্পেকটেটর-বর্ণিত প্রথম সভ্যের নাম সার্ রজার ডি কভারলি। এই চরিত্ররচনার পিছনে কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস নেই। এই চরিত্রটি একটি 'typical country gentleman'এর। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু বর্ণিত 'আত্মীয়সভা'র প্রথম সভ্য অভয়চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপায়নে বিশেষ ক'রে রামগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ শিকদারের চরিত্র ও কার্যাবলীর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। রাজনারায়ণ এই কাজ অতি সুকৌশলে সম্পাদন করেছেন। অভয়চিত্ত সম্পর্কে লেখা হয়েছে—

অনেক প্রধান সাহেবদিগের হস্তস্পর্শ করিতে পাইবার লোভে নব্যতন্ত্রের অনেক মান্য ও স্বাধীনাবস্থ ব্যক্তির মুখে যেমন জল আইসে ও তাহারা তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য যেমন লালায়িত ও তাহা করিতে পারিলে এমত আহ্লাদ প্রকাশ করা হয় যে, সে সাহেব তাহাতে বোধ করেন আমি ইহাকে কৃতকৃতার্থ করিলাম এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যেরূপ কৃতকৃতার্থ হয়েন আমার বন্ধু তদ্রূপ নহেন।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৬৮) হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি ছিল। তিনি ইংরেজবণিকদের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে কাজ করতেন, বেথুন, গ্রান্ট, হ্যালিডের সঙ্গে কাউন্‌সিল অব এডুকেশনের সদস্য ছিলেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক কালের শিক্ষিত বাঙালির আত্মসম্মান রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বহুক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন, ১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই টাউনহলের ঐতিহাসিক সভায় বক্তৃতা স্মল কজ কোর্টের জজের পদ প্রত্যাখ্যান রামগোপালের অন্যান্য স্মরণীয় কাজ। কৈলাসচন্দ্র বসু লিখেছেন—

He chose for his motto a saying of Sir William Drummond 'He who will not reason is a bigot; he who cannot is a fool; and he who dares not is a slave.'

ঠিক এই কথাটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় রাজনারায়ণের বর্ণনায়—

তিনি বলেন যে, প্রধান ও ভদ্রসাহেবদিগের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য ইংরাজী ভাষাতে বিলক্ষণ বাক্‌পটুতা ও সাহেবদিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার বিশিষ্টরূপে জানা স্বাধীন মনের চিহ্ন ও সাহস ভদ্রতা রূপে প্রকাশ করা ও সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাতে জল উঁচুনীচু না করিয়া তিনি যাহা অযুক্ত বলিতেছেন ভদ্রতার সহিত তাহার অযুক্ততার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দেখান ও তিনি যে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে সৌজন্যের সহিত তাঁহাকে বিজ্ঞ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি গুণ থাকিলে সাহেবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রাধানাথ শিকদারও (১৮১৩-৭০) হিন্দুকলেজের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় সেজন্য অভয়চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সুবিধা হয়েছে। অভয়চিত্ত সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

তিনি প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করেন না ও সেই ধর্মের যে সকল অযুক্ত অনুশাসন তাহা যতদূর অবহেলা করিতে পারেন তাহা করিতে ত্রুটি করেন না। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

Though not a Christian he had renounced Hindooism altogether and lived after the English fashion. He believed that India would never become a great nation till the inhabitans made use of diet consisting extensively of beef in which he largely indulged. —CALCUTTA REVIEW, April 1881

বাঙালীর দৈহিক দুর্বলতার জন্য রাধানাথ শিকদারের গভীর ক্ষোভ ছিল। তিনি গো-মাংস খাবার পক্ষপাতী ছিলেন মূলত এই কারণে। তাঁর ধারণা ছিল—

That beef-eaters were never bullied and that the right way to improve the Bengalees was to think first of their physique or perhaps physique and morale simultaneously. —*Life of David Hare,* P. C. Mitra.

অভয়চিত্তের চরিত্র-বর্ণনায় শেষভাগে পাই—

সর্বদা রেলওয়ের ষ্টেশন সকলেতে বাঙ্গালীর অসম্মানকারী ইংরাজের সহিত অপমানিত বাঙ্গালীর পক্ষ হইয়া মুষ্টিযুদ্ধ করতঃ তাহাদিগের নাসিকা হইতে শোণিত প্রবাহ নিঃসারণ করিয়া বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারদিগকে অবাক করিয়া দেন। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রাধানাথ শিকদারের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ঠিক এই কথাই লিখেছেন—

ইনি গণিতবিদ্যা অতি উত্তমরূপে জানিতেন। ইনি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুষ্টস্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতী ভাষার পরিবর্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন।
—হিন্দু অথবা প্রেসিডেনসি কলেজের ইতিবৃত্ত

'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২৩ মে ১৮৭০) রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

He was a rough and ready man and never slow to show his pluck when there was occasion for it.

আত্মীয়সভার দ্বিতীয় সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল ঘোষ। স্পেক্‌টেটর-বর্ণিত চরিত্রগুলির কোনটির সঙ্গে এই চরিত্রের বিশেষ কিছু মিল নেই। এই চরিত্রটির বর্ণনা করতে গিয়ে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

দীনদয়াল বাবুর পিতা ঠাকুরেরা সাত ভাই দেওয়ান ছিলেন। তন্মধ্যে এক ভাই সতের বৎসর বয়সের সময় কানের মাকড়ি ও হাতের বালা পরিত্যাগ করিয়াই দেওয়ানী করিতে গিয়াছিলেন ও যে নগরে দেওয়ানী করিতেন সেখানে এক বৃহৎ ঘণ্টার শব্দ দ্বারা বাসাড়েদিগকে আহ্বান করিয়া পাঁচ শত ব্যক্তিকে প্রত্যহ আহার করাইতেন এবং একবার মজলিশ করিয়া সিঁড়ির ধাপ সকল শাল দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন।
—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক—

ঢাকা নগরের একজন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার

> করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসী দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানের মাকড়ি ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। —সে কাল আর একাল, পৃ ১২

তারপর দেখা যায়—

> ইঁহাদিগের বাড়িতে কর্তৃপক্ষীয় সাহেবেরা আসিয়া ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি ভক্ষণ করিতেন এবং বাড়ির ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রাজনারায়ণ 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখেছেন—

> সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। —পৃ ৫

তারপর দীনদয়ালবাবু সম্পর্কে যে-তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার পিছনে সার্ রজার ডি কভারলির ছায়া আছে বলে মনে হয়। রাজনারায়ণের বর্ণনায় পাই—

> দীনদয়ালবাবুর পিতার পরলোকের পর তাঁহার বাটীতে কোন উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে কোন নিকটস্থ জমিদারের পঞ্চদশবর্ষীয়া বালবিধবা পরমাসুন্দরী কন্যা তথায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দুইজনে পরস্পর দর্শনেও তৎপরে পরস্পরের গুণশ্রবণে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়রসের সঞ্চার হইয়াছিল। সে কন্যাটি বড় সুপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের নিদারুণ রীতি জন্য আপনার প্রিয়তমের সহিত মিলনের অসম্ভাবনা দেখিয়া সেই অবধি কাহারো সহিত বাক্যালাপ করা পরিত্যাগ করিলেন ও ছয়মাস পরে এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় মানবদৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি দীনদয়ালবাবু বিবাহ করিবার মানস পরিত্যাগ করিলেন।
>
> —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

স্পেকটেটরে পাই—

> It is said he keeps himself bachelor by reason he was crossed in love by a perverse beautiful widow of the next county to him. Before this disappointment Sir Rogen was what you call a fine gentleman· ·But being illused by the above mentioned widow, he was very serious for a year and a half.
>
> —No. 2. March 2. 1711.

স্থান-কাল-পাত্র বিচার করেই রাজনারায়ণ দীনদয়ালবাবুর প্রেমকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই কাহিনী স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়েছে অথচ স্পেকটেটর-কাহিনীতে বর্ণিত বিধবাচরিত্রের মালিন্য নেই। দীনদয়াল-চরিত্রের বর্ণনায় এর পর দেখি—

> তিনি গ্রামে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ও জনাএর বাবুদিগের প্রতিষ্ঠিত ট্রেনিং স্কুলের রীত্যনুসারে ঐ পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়ান। গ্রামে তাঁহার সংস্থাপিত একটি চিকিৎসালয়ও আছে, সেখানে পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিরা আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত অবস্থিতি করে। দীনদয়ালবাবু প্রত্যহ চিকিৎসালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তাহা আপনি গিয়া তদারক করেন, যেহেতু চিকিৎসালয়

পরিষ্কার রাখার প্রতি রোগীদিগের পুনঃস্বাস্থ্যলাভ অনেক নির্ভর করে। তৎপরে একটি ছাতা হাতে করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রত্যেক বাড়ির লোক কে কেমন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন।· · নিজ গ্রাম অথবা নিকটস্থ গ্রামে ভ্রমণকালে দৈবাৎ যদ্যপি একটি আধটি ক্ষিপ্ত পান তাহাকে কথায় কথায় বাটীতে আনিয়া চিকিৎসালয়ের ক্ষিপ্তদিগের থাকিবার জন্য কয়েক প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক প্রকোষ্ঠে রাখিয়া চিকিৎসা করান, আরাম হইলে বিযুক্ত করিয়া দেন, নতুবা সেখানেই বরাবর থাকে।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

দীনদয়াল-চরিত্রের এই অংশে প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণের পিতামহের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। রাজনারায়ণের 'আত্মচরিতে' পাই—

আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড় উদারচিত্ত লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের জন্য আহার দ্রব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন।· ·তিনি পাগল পুষিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাঁহার মোলাকাৎ হয়; তাহাকে বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের সীমা কি ?· ·ঠাকুরদাদা বাটিতে যেসকল রোগী স্বপ্নাদ্য রোগী ঔষধ লইতে আসিত তাহাদিগের বিষ্ঠামূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন।· ·ইহা তিনি পুণ্যকার্য জ্ঞান করিতেন। —আত্মচরিত, পৃ ৪

সেকালে কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, কাহার কি হইয়াছে, এইসব তত্ত্ব লইতেন।· ·এমন কি কাহারো বাড়ীতে পুষ্করিণী খনন হইতেছে, বাড়ীর কর্তা বিদেশে, তিনি রৌদ্রের সময় ছাতি ঘাড়ে করিয়া বসিয়া খননকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল; দেশবিদেশ হইতে রোগীসকল তাহা লইতে আসিত। —সেকাল আর একাল, পৃ ৮১

এর পর দীনদয়ালের যে পরিচয় আছে তার সঙ্গে মিল দেখা যায় রাধাকান্ত দেবের। রাজনারায়ণ লিখেছেন—

দীনদয়ালবাবুর বাটীতে এক বালিকাবিদ্যালয় আছে। তাঁহার ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আজ চারি পুরুষ হইল চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী এই খ্যাতি দক্ষিণদেশে অনেকদিন অবধি প্রচারিত আছে। পূর্বে তাঁহার বাটীস্থ বালিকাবিদ্যালয়ে কেবল বাটীর বালিকারা পড়িত, এক্ষণে তাহাতে গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোকের কন্যা পড়িয়া থাকে। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার ১৮২২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকে কলকাতার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন—

কলকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই (মহিলাই) লেখাপড়া বিদিত আছেন।

কলকাতার রাজবাড়ী বলতে শোভাবাজার রাজবাড়ী বোঝাত। রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) গোপীমোহন দেবের পুত্র। তিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আছে। রাধাকান্ত দেব যে স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে।

দীনদয়ালের সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি জ্ঞানের উল্লেখ আছে। রাধাকান্তও সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি অল্প বয়সেই শিক্ষা করেছিলেন।

দীনদয়ালের জমিদারীর প্রজারা সুখী। রাধাকান্তের প্রজারাও সুখে ছিল। ১৮৩২ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুনের সমাচার-দর্পণে লেখা হয়েছিল—

তাঁহার কিয়ৎ জমিদারী দিয়া আমাদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রজাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমিদার স্বরূপেও তিনি অতি সদ্‌বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত আছি। —সংবাদপত্রে সেকালের কথা

দীনদয়ালের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব সম্পর্কে যে-সব কথা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে সত্য। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

দীনদয়ালবাবুর দেবদেবীতে বিশ্বাস আছে কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাখর্য ও দয়ালুস্বভাব বশতঃ প্রাচীন তন্ত্রের অন্য লোকের ন্যায় তিনি পিটপিটে নহেন। ·প্রাচীনতন্ত্রের লোকের দোষসকলের মধ্যে কোন দোষ দীনদয়ালবাবুতে নাই এমত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকের যে সকল গুণ নাই তাহা তাঁহাতে আছে। আমাদিগের আত্মীয়সভার সভ্যদিগের অনেকেরও নব্যতন্ত্রের কাহারো যে গুণ নাই তাহা তাঁহাতে আছে— সে গুণ এই যে তিনি আপনার হৃদ্‌গত প্রত্যয়ানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র ভণ্ডতা নাই। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

তৃতীয় সভ্যের নাম বণিকনাথ মিত্র। স্টীলের বর্ণিত সার্ এনড্রু ফ্রিপোর্টের অনুসরণ রাজনারায়ণ এই চরিত্রে করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বণিকনাথ হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)। স্টীল লিখেছেন—

· ·a merchant of great eminence in the city of London. A person of indefatigable industry, strong reason and great experience. His notions of trade are noble and generous and (as every rich man has usually some sly way of jesting which would make no great figure were he not a rich man) he calls the sea the British Common. He is acquainted with commerce in all its parts and will tell you it is a stupid and barbarous way to extend domininion by arms; for true power is to be got by arts and industry· ·He abounds in several frugal maxims, amongst which the greatest favourite is "A penny saved is a penny got." —No. 2. March 2, 1711.

রাজনারায়ণ এর অনুসরণে লিখেছেন—

বণিকনাথবাবু অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রিয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই পদ যে শ্লোকের প্রথমে আছে তাহা সর্বদা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি সমুদ্রকে বণিকের জমিদারী কহিয়া থাকেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে অস্ত্রদ্বারা রাজ্যবিস্তার করা অসভ্য কর্ম, প্রকৃত গৌরব কেবল শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা লভনীয়। তিনি সর্বদা পরিমিত ব্যয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে "জলে জল বাঁধে" টাকায় টাকা হয়।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৭ম অনুচ্ছেদ

প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহযোগে 'কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং'

নামে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দের অগস্ট মাসে তারাচাঁদ অবসর গ্রহণ করেন। পর বছর জানুয়ারি মাস থেকে কালাচাঁদ ও প্যারীচাঁদ মিলে ব্যাবসা চালান। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে কালাচাঁদের মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদ নিজেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি নিজের দুই ছেলেকে অংশীদার করে নিয়ে 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে কারবার চালাতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি বহু বিলিতি কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। বণিক এবং বন্ধু হিসেবে প্যারীচাঁদের চরিত্র নির্বাচন সুসংগত হয়েছে।

বণিকনাথের অন্যান্য যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সঙ্গেও প্যারীচাঁদের হুবহু মিল দেখা যায়। বণিকনাথ-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

> বণিকনাথবাবু মদ্যপান করেন না; বলেন যে মদ্যপান করা সাপ খেলান সমান। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে হলাহলের বিনিময়ে কত সুন্দর, দুর্লভ ও মহোপকারী টাকা প্রদত্ত হইতেছে। তিনি বলিয়া থাকেন যে নব্যতন্ত্রের লোকেরা মদ্যপানে যে টাকা ব্যয় করেন তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে অথবা দেশের হিতার্থ ব্যয় করিলে তাঁহাদিগের নিজের অথবা দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। এতদ্দেশে পান-দোষের বৃদ্ধি নিবারণ জন্য রাজপুরুষেরা কোন উপায় অবলম্বন করেন না, ইহাতে বণিকনাথবাবু তাঁহাদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করেন। — ঐ। ৭ম অনুচ্ছেদ

প্যারীচাঁদ মদ্যপানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) গ্রন্থ তাঁরই রচনা।

চতুর্থ সভ্যের নাম ঋজুহৃদয়। এই ধরনের চরিত্র স্টীলের রচনায় নেই। এই চরিত্রের মধ্যে প্যারীচরণ সরকারের (১৮২৩-৭৫) ছায়া আছে। রাজনারায়ণ ঋজুহৃদয়বাবুর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব ও হিন্দুকলেজের একটি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক।·· ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল, ঋজুপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব।·· আর স্মরণশক্তি এমনি যেপাতে যাহা আছে তাহা কোন পাতে আছে পুস্তক না দেখিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন।·· আমার বন্ধু অতি সুশীল, অতি বিনয়ী ও অতি সরল চিত্ত। ক্রূরতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না।·· ঋজুহৃদয়বাবু বলেন যে কিছুদিন পরে আমি কৃষি ও উদ্যানকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিব, কিন্তু যে অর্থ লইয়া ঐ কর্ম আরম্ভ করিবেন তাহার সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ নাই। — ঐ। ৭ম অনুচ্ছেদ

প্যারীচরণ সরকার কায়স্থবংশীয় এবং হিন্দুকলেজের শিক্ষক ছিলেন। 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থেও রাজনারায়ণ লিখিছেন, 'ইনি আমাদিগের দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক'। তিনি একটি কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কৃষিসম্বন্ধীয় গ্রন্থও রচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বন্ধুবৎসল, সচ্চরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি যথার্থ শিক্ষাব্রতীর জীবন যাপন করেন।

আত্মীয়সভার পঞ্চম সভ্য সরস্বতী ন্যায়ভূষণ। এই চরিত্রটিতে স্টীল-বর্ণিত দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) ও অক্ষয়কুমার দত্তকে (১৮২০-৮৬) মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনারায়ণ লিখেছেন—

> তাঁহার নাম শুনিবামাত্র, মস্তকে টিঁকি, তসরের জোড় পরিধানে, চটিজুতা পায়, নস্যাধার শম্বুক হস্তে, নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন এক ভট্টাচার্যের মূর্তি পাঠকগণের মনে উদিত হইতে পারে

কিন্তু আমার বন্ধুর ঐরূপ 'উপসর্গ' কিছুই নাই। তাঁহার টিকি নাই, দিব্য ধুতি পিরান চাদর পরিধান, ইংরাজী জুতা পায়। তিনি বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন ও ইংরাজী-ওয়ালাদের সঙ্গে কালযাপন করিতে ভালবাসেন। যে সংস্কৃত কলেজ হইতে দেশীয় ভাষার এরূপ উন্নতি সাধন ও দেশের কুরীতি উন্মূলন হইবার উপক্রম হইতেছে, সেই মহৎ বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৮ম অনুচ্ছেদ

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' এবং *Men I have seen* গ্রন্থে দ্বারকানাথের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে পূর্ব উদ্ধৃত বর্ণনার মিল সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এর পর যে বর্ণনা আছে—

এক্ষণে এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য অত্যন্ত প্রশংসার সহিত নির্বাহ করিতেছেন, এই পত্রের বিস্তর গ্রাহক ও তন্নিবন্ধন সরস্বতীবাবুর দশ টাকা ভাল আয় আছে। সরস্বতীবাবু বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অত্যন্ত উত্তম রচনা করিতে পারেন আর গ্রন্থের দোষগুণ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে পারেন। কোন গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করা কঠিন। কিন্তু তিনি যাহা ভাল বলেন তাহার আর মার নাই। আমাদিগের আত্মীয়-সভার সকল সভ্য তাঁহাকে অতিশয় মান্য করেন। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৮ম অনুচ্ছেদ

তা থেকে মনে হয় এখানে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা আমাদের আলোচ্য রচনাটি ১২৬৩ সালে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে লিখিত। আর 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে। তাই মনে হয় পূর্বোদ্ধৃত অংশ অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ খৃস্টাব্দ থেকে অক্ষয়কুমারের দ্বারা সম্পাদিত হতে থাকে।

সরস্বতী ন্যায়ভূষণের বাকি অংশের পরিচয় দান প্রসঙ্গে স্টীলের বর্ণিত ভদ্রলোকের অনুকরণ রাজনারায়ণ করেছেন সত্য, কিন্তু সুন্দর মিশ্রণকৌশলের সাহায্যে প্রায় মৌলিক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। স্টীল লিখেছেন—

The gentleman next in esteem and authority among us is another bachelor, who is a member of the Inner Temple; a man of great probity, wit and understanding; but he has chosen his place of residence rather to obey the direction of an old humoursome father, than in pursuit of his own inclinations. He was placed there to study the laws of the land, and is the most learned of any of the house in those of the stage. Aristotle and Longinus are much better understood by him than Little ton or Coke. The father sends up every post question relating to marriage articles, leases and tenures, in the neighbourhood; all which questions he agrees with an attorney to answer and take care of in the lump. .He is an excellent critic, and the time of the play is his hour of business, exactly at five he passes through New-Inn, crosses through Russel-Court and takes a turn at Will's till the play begins;.. It is for the good of the audience when he is at play, for the actors have an ambition to please him. —No. 2. March 2, 1711.
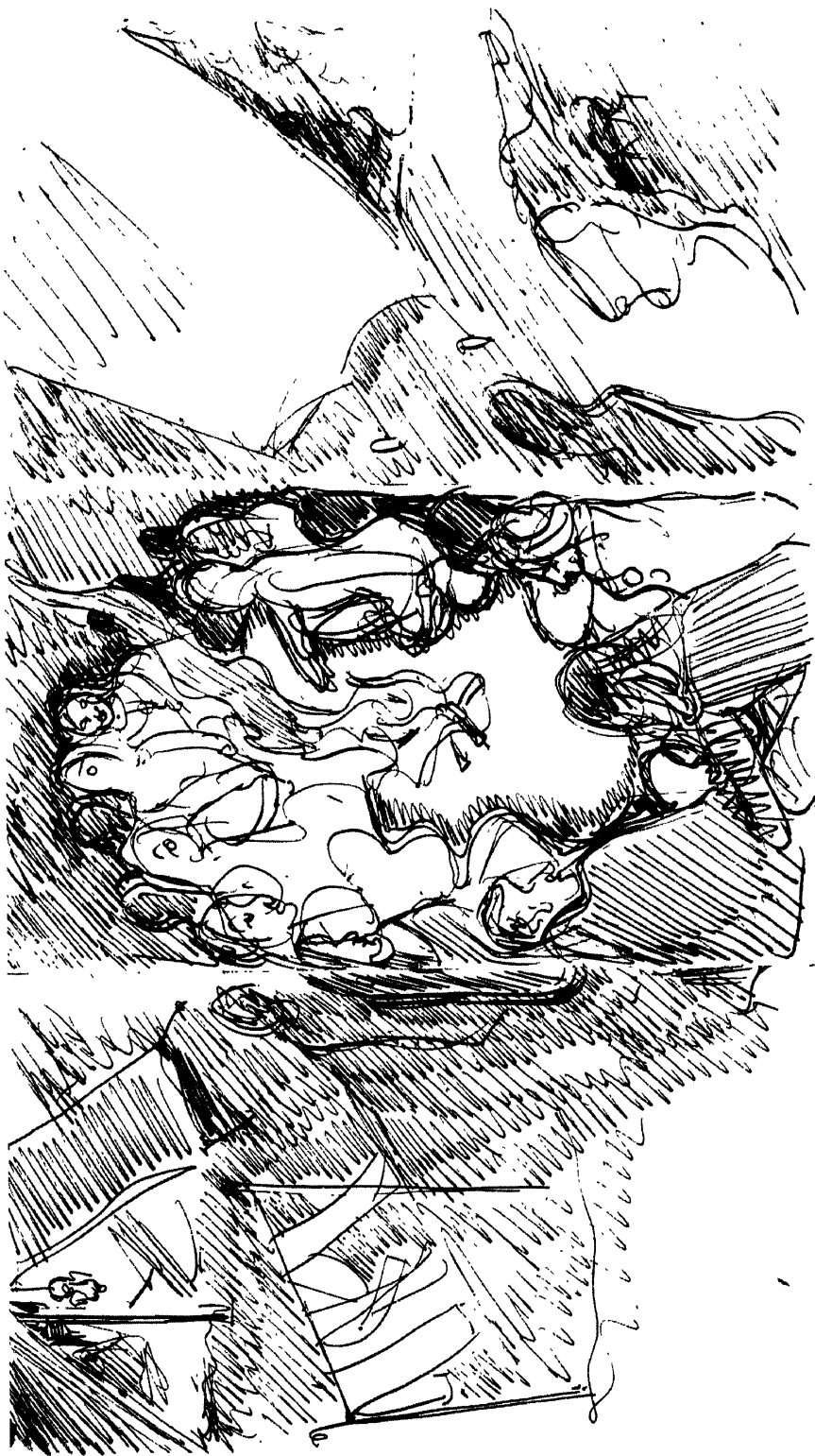
পৌষরাত্রির গল্প-গুজব। রাজগীর-স্কেচ
শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আর রাজনারায়ণ লিখেছেন—

তাঁহার পিতা তাঁহাকে মুন্সেফ করিবার অভিপ্রায়ে ভবানীপুরে বাসা করাইয়া দিয়া আইন শিখিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতীবাবু মার্সম্যানের আইনসংগ্রহ না পড়িয়া কামন্দকীয় রাজনীতি অধ্যয়ন করিতেন ও সদর দেওয়ানির কনষ্ট্রকৃশন না পাঠ করিয়া কুল্লুক ভট্ট প্রণীত মানবীয় ধর্মশাস্ত্রের টীকা অধ্যয়ন করিতেন ও বর্তমান রাজবিচারালয়ের কার্যের প্রণালী না শিক্ষা করিয়া মৃচ্ছকটিক নাটক প্রভৃতিতে বিবৃত প্রাচীনকালের রাজবিচারালয়ের কার্যের পদ্ধতি আলোচনা করিতেন ও নবরসের কার্যোৎপাদিত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত অলংকার শাস্ত্রান্তর্গত নবরসের বর্ণনা পাঠ করিতেন। তাঁহার পিতা ছেলে আইনেতে বড় দক্ষ হইতেছে বিবেচনা করিয়া আপনার বৃত্তিভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য দলিল টলিল আপনার পুত্রের নিকট মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু একজন মোক্তারের সহিত পুত্রটির চুপি চুপি চুক্তি ছিল যে ঐ সকল কাগজপত্র লিখিয়া দিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে যদ্যপি কখন নাটকের অভিনয় হয় তবে তাহা দেখিতে যাইবেন। কলিকাতার নাট্যামোদী যুবকেরা সম্প্রতি যেসকল নাটকের অভিনয় করিয়াছেন সেসকল অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন ও আপনার প্রকাশিত সম্বাদপত্রে সেসকলের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া ঐ যুবকদিগকে উৎসাহপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি যখনই অভিনয় দেখিতে যান নটেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে ও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে বিশেষ যত্নবান হয়।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৮ম অনুচ্ছেদ

আত্মীয়সভার ষষ্ঠ সভ্য রসময় দে। এই চরিত্রটির পিছনে স্টীল-বর্ণিত উইল হনিকুম্ব-এর ও রজার ডি কভারলি-র ঈষৎ প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮ ২-৫৯), শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১) প্রভৃতির ভগ্নাংশও ঐ চরিত্রগঠনে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করার হেতু আছে।

স্টীল লিখেছেন—

But that our society may not appear a set of humourists unacquainted with the gallantries and pleasures of the age, we have amoug us the gallant Will Honeycomb, a gentleman who according to his years should be in the decline of life, but having ever been very careful of his person and always had a very easy fortune, time has made but very little impression, either by wrinkles on his forehead or traces in his brain. —No. 2. March 2, 1711

রাজনারায়ণ লিখেছেন—

পাছে পাঠকবর্গ মনে করেন যে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কেমন কেমন মানুষ ও নিযেদো পুরুষ, এই জন্য তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে আমাদিগের মধ্যে একজন আমুদে লোকও আছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রসময় দে।· ·

রসময়বাবুর যে বয়স তাহাতে তাঁহাকে বৃদ্ধ বলা যাইতে পারে কিন্তু সর্বদা অর্থের স্বচ্ছলতা ও শরীরের প্রতি বিলক্ষণ যত্ন থাকাতে তাঁহাকে দেখিতে পাকা আঁবটির ন্যায়।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৯ম অনুচ্ছেদ

রজার ডি কভারলি সম্পর্কে লেখা হয়েছে—

His great grandfather was inventor of the famous conntry-dance which is called after him.

এরই অনুকরণে রসময় সম্পর্কে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

রসময়বাবুর অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ ঝুমুরের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন।

যাই হোক, রসময় বাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

রসময় বাবু কিছুদিন পূর্বে 'রসময় দে' বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিতেন, কিন্তু এক্ষণে 'দে' বংশীয় অনেকে 'দেব' বলিয়া নাম স্বাক্ষর করাতে তিনিও তাহা করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবই প্রথম 'দে' থেকে 'দেব' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শোভাবাজার রাজবাড়ীর কোনো চরিত্রের সঙ্গে রসময়বাবুর মিল ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। তাই 'রসময়' চরিত্রটিতে সমসাময়িক অন্যান্য বহু চরিত্রের মিশ্রণ ঘটেছে। রসময় চরিত্রটি ঠিক typical না হলেও অনেকটা বটে। তবুও যখন পড়ি—

তাঁহার পুস্তকাগারে মূর্তিমন্ত রাগরাগিণীর ছবির বই আছে তাহা বহুমূল্যের।

তখন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা মনে হয়। হেমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত কবিতায় এজন্য শৌরীন্দ্রমোহনকে 'মিউজিক ডাক্তার' বলেছেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরই প্রথম সংগীত সম্বন্ধে চর্চা, গবেষণা ও রাগরাগিণীর ছবির বই সংগ্রহ করেন। রসময়বাবুর অন্যান্য গুণ সম্পর্কে রাজনারায়ণ লিখেছেন—

বন্য পুষ্পের অনুকরণে ঢেঁড়ি ঝুমকো প্রভৃতি অলংকার কিরূপে প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল; কঙ্কণাদি সেকেলে অলংকার কলিকাতার কোন্ কোন্ ভদ্ররমণী দ্বারা শেষ ব্যবহৃত হইয়াছিল; বেশ্যাদিগের সৃষ্টিকরা অলংকার বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে কিরূপে প্রচলিত হইতে লাগিল; ডাএমনকাটা অথবা জড়াও অলংকার কখন ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল; সেকালে তিনি কিরূপ বাবরি কাটিতেন ও চুল পেনুচুট করিতেন; খাটো চুল রাখা রীতি কোন সময়াবধি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৯ম অনুচ্ছেদ

ইত্যাদি স্টীলের রচিত হনিকুম্বের বর্ণনার অনুকরণেই করা হয়েছে। স্টীল লিখেছেন—

He knows the history of every mode and can inform you from which of the French King's wenches our wives and daughters had this manner of curling their hair, that way of placing their hoods; whose fraility was covered by such a sort of petticoat and whose vanity to shew her foot made that part of the dress so short in such a year; in a word all his conversation and knowlehge has been in the female world.

রাজনারায়ণ আরও লিখেছেন—

প্রায়ই ইহা ঘটে যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অথবা সংগীতের অথবা কোন আমোদ প্রমোদের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে রসময়বাবু বসে বসে ঝিমোন।

স্টীলের বর্ণনায়ও এই কথা আছে—

To conclude his character where women are not concerned he is an honest worthy man.

এর পর রসময়বাবুর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে মেলে। রাজনারায়ণের ভাষায়—

যাত্রা ও কবির কিরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল; মুন্‌শী সদুরুদ্দীন ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মধ্যস্থিত রাজা নবকৃষ্ণের সম্মুখে হরুঠাকুর কিরূপ কবি গাইতেন; নিতে বৈষ্ণব ও নীলুরামপ্রসাদ রামবাবুর বিরহজ্বালা উপস্থিত হইলে কিরূপ তিনি বিরহ লিখিতেন; যে হৌসে বুক্কীপারি করিতেন তাহার ডে-বুকে নীধুবাবু একটা টপ্‌পা কিরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; বাগবাজারের পক্ষীদল কিরূপ ছিল ও তন্মধ্যে এক পক্ষী কাশীতে গিয়া কিরূপ বৃক্ষে বাসা করিয়াছিল। ইত্যাদি কাহিনী রসময়বাবুর জ্ঞাত।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৯ম অনুচ্ছেদ

সকলেই জানেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহুযত্নে কবিওয়ালাদের কবিতা সংগ্রহ ক'রে সংবাদ-প্রভাকর-এ প্রকাশ করেন। হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাসু, এন্‌টুনি ফিরিঙ্গিদের জীবনীও তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। 'গীতরত্ন'-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে আমরা এই বিস্তৃত বিবরণ দেখি। ১২৬০ (১৮৫৩) সালে সংবাদ-প্রভাকর-এ ঈশ্বরগুপ্ত নিধুবাবুর জীবনী আলোচনা করেছিলেন। রসময়বাবুর চরিত্র-রচনার পূর্বোদ্ধৃত অংশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছাপ দৃঢ়ভাবেই পড়েছে। কিন্তু রসময়বাবুর কৃতিত্বের কথা এখনও শেষ হয় নি। রাজনারায়ণ লিখেছেন—

বিদ্যোৎসাহিনী নাট্যশালায় বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের দিবস কালীপ্রসন্নবাবুর নিকট তিনি নিজে কিরূপ অসাধারণ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই সকল বিষয়ের গল্প রসময়বাবু আমাদিগের নিকট কহিয়া থাকেন। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ৯ম অনুচ্ছেদ

মনে হয়, এই অংশ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কেননা, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে লেখা হয়েছিল—

The part of the king Pururoba represented by Baboo Kali Prosonno Singh was admirably done. His mien was right royal and his voice truly impartial.

রসময়বাবু সম্পর্কে আরও যে মন্তব্য করা হয়েছে, অর্থাৎ—

রসময়বাবুর চরিত্র যৌবনকালে বড় ভাল ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বলেন যে অধিক বয়সে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া পত্নীব্রত অবলম্বন করিয়াছেন—

হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে একথাও সত্য। আর একটি কথা মনে হয়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও রসময়বাবুর মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন।

আত্মীয়সভার শেষ ও সপ্তম সভ্যের নাম নেই। স্টীলের পত্রিকার বন্ধুসংখ্যা ছয়। একজন ধর্মযাজক সেই ষষ্ঠ বন্ধু। তাঁরও নাম উল্লেখ করা হয়নি। সেই ধর্মযাজকের অনুসরণে 'আত্মীয়সভা'র যে সভ্যের চিত্র আঁকা হয়েছে তার মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও রামতনু লাহিড়ী মিশে আছেন।

স্টীল লিখেছেন—

I cannot tell whether I am to account him whom I next to speak of, as one of our company; for he visits us but seldom, but when he does, it adds to every man else a new enjoyment of himself. He is a clergyman, a very philosophic man, of general learning great sanctity of life and the most exact breeding. —No 2, March 2, 1711,

রাজনারায়ণ লিখেছেন—

আর-একটি মহাশয়কে আমাদিগের আত্মীয়সভার সভ্য বলিতে পারি কি না সন্দেহ, যেহেতু তিনি আমাদিগের সভাতে ক্বচিৎ কখন আইসেন।

এইটুকুই স্টীলের অনুসরণ। এর পর যে দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিটি কথা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) সম্পর্কে সত্য—

তিনি সেই নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, পরমেশ্বরপরায়ণ ও তাঁহার চিন্তাতে সর্বদা নিমগ্ন। ঈশ্বর বিষয়ক-গ্রন্থ সর্বদা নির্জনে পাঠ করিয়া থাকেন, বন্ধুদিগের সহিত সর্বদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বর ধ্যান, ঈশ্বরানন্দ রস পান তাঁহার একমাত্র কার্য।·· তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করেন। কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া তিনি তদ্‌গতপ্রাণ ও তন্মনস্ক।··শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন কার্যে তিনি পরম মান্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান সহযোগী।·· তিনি বিষয়কর্ম করিলে একজন অতি বিষয়নিপুণ ব্যক্তি হইতে পারিতেন ও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু বলিয়া থাকেন যে কি কারণে বলিতে পারি না, সেদিকে আমার মন যায় না।

—আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ১০ম অনুচ্ছেদ

আরও যে-অংশ আছে, রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮) সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। রাজনারায়ণ 'হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন—

বাবু রামতনু লাহিড়ী। ইনি একজন অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ লোক। An honest man is the noblest work of God.— ইনি এই বাক্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্বরূপ। বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার প্রণীত 'সুরধুনী' কাব্যে বলিয়াছেন যে, ইঁহার সংসর্গে একদিন থাকিলে দশ দিন ধার্মিক থাকা যায়।

তিনি আমাদিগের 'আত্মীয়সভা'তে ক্বচিৎ কখন আইসেন, কিন্তু যখনই আইসেন তখনই আমরা ঈশ্বরের কথা পাড়ি। তিনি যখন ঈশ্বরের কথা কহেন তখন বোধ হয় যে মনুষ্য অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ জীবের সহবাসে আমরা কালযাপন করিতেছি। —আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। ১০ম অনুচ্ছেদ

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রামগোপাল ঘোষ হরিশ মুখুজ্জেকে রামতনু লাহিড়ীর পাদোদক খেতে বলেছিলেন। কেননা তাতে তাঁর পুণ্য হবে। স্টীলের রচনার শেষ পংক্তি— These are my ordinary companions, রাজনারায়ণের রচনার শেষে পাই: ইঁহারাই আমার বিশেষ মিত্র।

আলোচ্য রচনাটির আর-একটি মূল্য নির্দেশ করা দরকার। এই রচনাটির মধ্যেই পরবর্তী কালে লিখিত 'সেকাল আর একাল' এবং 'আত্মচরিত'গ্রন্থদ্বয়ের সূচনা দেখতে পাই। কাজে কাজেই ঐ দুখানি গ্রন্থের

পূর্বাভাসস্বরূপ 'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' রচনাটিকে গ্রহণ করা উচিত। আরেকটি কথা, স্টীল বর্ণিত বন্ধুর সংখ্যা ছয়, রাজনারায়ণের রচনায় আত্মীয়সভার সভ্য সাত ব্যক্তি, স্টীল যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন সেগুলি typical চরিত্র হিসেবেই গ্রহণীয়। অবশ্য দুটি চরিত্র অর্থাৎ ক্যাপটেন সেন্‌ট্রি ও উইল হনিকুম্ব নাকি সি. কেম্‌পেন্‌ফেলট ও কর্নেল ক্লেলণ্ড-এর ছদ্মচিত্র। অবশ্য এই সিদ্ধান্তও সর্বজনস্বীকৃত নয়। কিন্তু রাজনারায়ণ এই দিক থেকে স্টীলের চেয়ে অধিকতর দক্ষতার দাবি করতে পারেন, কেননা তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে সত্য সত্যই সমসাময়িক পরিচিত মানুষদের সমাহৃত-রূপ দেখা গেছে।

এই রচনাটি যে দুর্লভ, আশা করি বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এ কথা স্বীকার করবেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'জর্ণাল'—'আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত'।

চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়

শ্রীসুকুমার সেন

১

এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনেকদিন থেকে একটি বাংলা পুথি সংগৃহীত আছে। পুথিটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব চৈতন্য-জীবনী। ১৯৪২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পুথির বিবরণী বার হলে পুথিটির প্রতি আমার নজর পড়ে। পুথিটির বিবরণীতে 'চৈতন্যচরিত' বলে উল্লিখিত আছে। বিবরণীর সংকলয়িতা পুথিটির আভ্যন্তরীণ কোনো বিবরণী না দিয়ে শুধু গ্রন্থকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন 'চূড়ামণিদাস', আর মন্তব্য করেছেন "printed many times"। চূড়ামণিদাসের কোনো চৈতন্যচরিতের নামও কখনও শুনি নি, ছাপা বইয়ের কথা দূরে থাক্। কৌতুহলী হয়ে পুথিটি দেখলুম এবং বুঝলুম যে এটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত একটি অশ্রুত, অজ্ঞাত অভিনব চৈতন্যচরিতকাব্য। পুথি কাগজ ও লিপির ছাঁদও বেশ পুরানো, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা। পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে এক জায়গায় ভণিতায় নজর পড়ল, "ভুবনমঙ্গল কহে চূড়ামণিদাস।" তখন মনে হল এইটিই বুঝি কাব্যটির নাম। এই নামে চূড়ামণিদাসের কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৮)। তখন ইচ্ছা রইল সুযোগ হলে পুথিটিকে ভালো করে পড়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার এবং সুবিধা হলে ছাপিয়ে দেবার। এতদিন পরে সে সুযোগ ও সুবিধা ঘটেছে। এখন বইটি ছাপাবার উদ্যোগে আছি। চৈতন্য-নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। মাধবেন্দ্রপুরীর বিষয়েও অনেক খবর আছে।

২

পুথিটি সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। প্রথম পনেরো পাতার মধ্যে আটখানা পাতা একেবারে লোপ পেয়েছে, আর সাতখানা পাতার খণ্ডাংশ আছে। তবে সেগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা কঠিন। ১৪৮ পাতার পর থেকে শেষাংশ পাওয়া যায় নি। কাব্যটির নাম যে গৌরাঙ্গবিজয় এবং পুথির প্রাপ্ত অংশ যে কাব্যের তিন খণ্ডের মধ্যে আদি খণ্ড। অতএব মূল পুঁথির এক-তৃতীয়াংশ তা শেষ পৃষ্ঠার এই উদ্ধৃত অংশ থেকে জানতে পারি—

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদিখণ্ড পুথী
গৌরাঙ্গবিজয় তিনখণ্ডে পূর্ণ হৈব। বৈষ্ণবচরণে কিছু করিমু প্রণতি।

শ্রীচৈতন্যের গয়া থেকে প্রত্যাগমনের বর্ণনার পরেই চূড়ামণিদাস ওই কথা লিখেছেন।

কৃষ্ণ-বলরামের বৃন্দাবন লীলার সঙ্গী বারো জন গোপবালকের অনুসরণে নিত্যানন্দের বারো জন প্রধান সঙ্গী-অনুচর দ্বাদশ গোপাল নামে চিহ্নিত হতেন। এর কারণ, এঁদের অনেকে ভাবাবেশে নিত্যানন্দেরই মত বালকোচিত আনন্দচপলতা প্রকাশ করতেন। দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন ছিলেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। এঁর সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

নিত্যানন্দ প্রিয়-ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময়।

জয়ানন্দ বলেছেন—

বাল্যভাবে ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাচিতে মুখ হৈতে সর্প বায়্যাইল আচম্বিতে।

এই ধনঞ্জয় পণ্ডিতেরই শিষ্য আমাদের গ্রন্থকর্তা চূড়ামণিদাস। ভনিতায় গ্রন্থের নাম নেই বটে, তবে গুরুর নাম প্রায়ই বাদ যায়নি। যেমন—

ধনঞ্জয় নির্ভয় ধরি পদ-ছায়া গৌর-বাল্যরূপ চূড়ামণিদাস গায়া।

দ্বাদশ গোপালের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন সেই রামদাসও ধনঞ্জয়কে কৃপা করেছিলেন। আদিখণ্ডের শেষে চূড়ামণি লিখেছেন—

আবালক কাল হৈতে স্বভাব আমার কোন কর্ম ধর্মে তোর নাহি অনুরোধ
অলস অদক্ষ অজ্ঞ অকৃতির সার। কৃষ্ণে বৈষ্ণবে তোর হরিব সত্যবোধ।
এসব দুর্গতি দেখি ঠাকুর ধনঞ্জয় এই ত ভরোসাএ বুলি ভিক্ষা করি সার
করিল কৃপা মোরে দেখি দুরাশয়। ঠাকুর রামাই কৃপা করিল আপার।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিত্যানন্দের বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। সেইহেতু চূড়ামণিদাসও নিত্যানন্দের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। চূড়ামণি বলেছেন—

নিত্যানন্দ প্রভু শক্তি ধনঞ্জয় ধরে তাঁর বলি কৃপা কৈল নিত্যানন্দ রাএ
কটক-উজ্জ্বল বলি কহিতেন তাঁরে। গৌড় বাল্যরঙ্গ চূড়ামণিদাস গাএ।

গৌরাঙ্গবিজয় রচনার সাক্ষাৎ প্রেরণা চূড়ামণি লাভ করেছিলেন নিত্যানন্দের কাছ থেকে স্বপ্নে। এ কথা কবি বারবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

স্বপ্নে মোরে নিত্যানন্দ কহিল আপনি এই ভরোসাএ চূড়ামণিদাস গাএ।
এই ভাগ্যে কহে সত্য দাস চূড়ামণি॥ সুস্বপ্ন কহিয়াছেন নিত্যানন্দরাএ
কহিল সুস্বপ্ন প্রভু নিত্যানন্দ রায়ে চূড়ামণি দাস কহে এই ভরোসাএ।

বক্তব্য বিষয়ের অনেকখানি চূড়ামণি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছে ও তাঁর গুরুর গুরুভাইদের কাছে। এঁরা আগেকার ঘটনাগুলি শুনেছিলেন নিত্যানন্দের কাছে—

কহিছেন নিত্যানন্দ এইসব পরবন্ধ গৌর-মাধবেন্দ্র মেলি প্রেম-আনন্দ কেলি
গদাধর ধনঞ্জয় সনে চূড়ামণিদাস রচনে।

একস্থানে চূড়ামণির উক্তি থেকে মনে হয় যেন গদাধরদাস ও ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কাছে নিত্যানন্দ যখন পুরানো কথা কইতেন তখন এক আধবার চূড়ামণিও উপস্থিত ছিলেন—

কহিছে নিতাই গদাধর-ধনঞ্জয়ে সংসর্গে শুনিএঁা আছোঁ কহিলুঁ নিশ্চয়ে।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য-অনুচরের পক্ষে এরকম মজলিসে হাজির থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

৩

কলির প্রবলতায় ধর্মাচার লুপ্তপ্রায় আর বসুধা রসাতলগামিনী। তাই দেখে অদ্বৈত আচার্য ক্ষুব্ধ হয়ে ঘরে বসে সুহৃদ শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে দুঃখ করছেন, এমন সময়ে সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীর আগমন হল। এই দৃশ্যে গৌরাঙ্গবিজয়ের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ।

মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতকে বললেন, আমার কাছে কৃষ্ণদীক্ষা নাও। আমি কৃষ্ণেন্দ্রপুরীর শিষ্য, দেবেন্দ্রপুরীর

প্রশিষ্য, রাজেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্যের শিষ্য। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি কিন্তু তোমার মত পাত্র পাইনি। তোমাদের দুজনকে মন্ত্র দিয়ে আমি বিজনে তপস্যায় রত হব কৃষ্ণকে অবতার করাতে। পুরীর কাছে অদ্বৈত ও শ্রীবাস দীক্ষা নিয়ে দুজনে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হলেন। অদ্বৈত পুরীকে ছেড়ে দিতে চান না—

তবে কথো দিন অন্তে মাধবেন্দ্র পুরী চোর জেন গেল পরধন করি চুরী॥

মল্লভূমির মধ্যে দিয়ে পুরী চললেন। গিয়ে পৌঁছলেন ঝাড়িখণ্ডে। সেখানে এক হ্রদের ধারে এক গাছের তলায় শিকড়ে ঝোপড়া বেঁধেছিল, সেখানে থেকে কৃষ্ণতপস্যায় নিরত হলেন। মাধবেন্দ্রের ধ্যানে কৃষ্ণ আকৃষ্ট হলেন।

প্রেমভরে জপ করে পুরী ভাগ্যরাশি চলিবারে নারে কৃষ্ণ মাধবেন্দ্র এড়ি।
জার জপরসে বস শ্রীকৃষ্ণ বিলাসী। তন্দ্রায়ে সাক্ষাতে ডাকে ডাকে তরু-ডালে।
তন্দ্রায়ে কহয়ে কৃষ্ণ মাধবেন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র বলে ধন্দ্ব বিভীষিকা ছলে।
মাগ বর মাগ বর মনস্থির করি। জপরসে হই বশে সমুখেত আসি
জপরস অভিলাষ বুলে ঘর বেড়ি তরুণ করুণ ধরি ফুকরিল বাঁশী।

তখন মাধবেন্দ্র বর মাগলেন—

বলদেব জন্ম হইল শ্রীখলপপুরে তুমি জন্ম শচী-গর্ভে বাপ জগন্নাথ
জনক মুকুন্দ পদ্মাবতীর উদরে। গৌড়ে নবদ্বীপে জন্ম সর্বগণ সাথ।

'ভালো ভালো' বলে কৃষ্ণ সম্মত হলেন।

যেদিনে অদ্বৈতের সঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রথম মিলন সেই দিন নিত্যানন্দের জন্ম। কৃষ্ণ-অবতার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পুরী এখন চললেন খলপপুরে[১] নিত্যানন্দ-দর্শনে। মুকুন্দ পণ্ডিত ও পদ্মাবতী তাঁকে ভক্তি করে ঘরে রাখলেন। পুরী নিত্যানন্দকে দর্শন করলেন এবং তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে বাপমাকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের পুত্রসৌভাগ্য। খলপপুর থেকে মাধবেন্দ্রপুরী কাশী হয়ে বৃন্দাবন চলে গেলেন। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন কৃষ্ণাবতারের।

এদিকে অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশ মত শ্রীবাসের সঙ্গে দিনে ভাগবত পাঠ করেন ও কৃষ্ণকথা কন, মধ্যরাত্রিতে গঙ্গাস্নান করে মাঠে গিয়ে মন্ত্র জপ করেন আর কখনো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কখনো গড়াগড়ি দিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকেন আর কাঁদেন।

মন্ত্র পড়ি গড়াগড়ি কান্দে হুঁহে মাঠে আবেশে বিবশ হএ উর্ধ্ববাহু নাটে।

কৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না। নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্ম নিলেন। অদ্বৈতের অকারণ হর্ষে যেন নবদ্বীপের ভোল ফিরে গেল।

অদ্বৈতের নাটে নাচে নদীয়া নগর মহাবন্তা হইল ভক্তিরসের সাগর।

একে একে নবজাতকের সব জাতকর্ম যথোচিত আড়ম্বরে সমাধা হল— পাঁচটি, ষষ্ঠীপূজা, আটকড়াইয়া, নামকরণ। জগন্নাথ মিশ্র গরীব ছিলেন না। বিশ্বম্ভরের জন্মের পর থেকে তাঁর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হতে লাগল। অন্নপ্রাশনে খুবই ধুমধাম হল। জগন্নাথের ঘরে অনেক রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে লাগল। ক্রমে ক্রমে নিমাই তিন বছরের হল। তখন থেকে জুটল খেলার সঙ্গী। তাদের সঙ্গে মিলে নিমাই নতুন

১ অন্য সব গ্রন্থেই নামটি পাই 'খলকপুর'।

নতুন খেলা খেলে নবদ্বীপবাসীদের সকৌতুক স্নেহের উদ্রেক করতে লাগলেন। নিমাইএর বাল্যচরিত-বর্ণনায় চূড়ামণিদাস সহজ কবিত্বের সঙ্গে স্বাভাবিকতার সঙ্গতি রেখেছেন।

বিশ্বম্ভর যখন পাঁচ বছরের তখন মাধবেন্দ্র নবদ্বীপে এলেন ও জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য স্বীকার করলেন ;

হেন বেলা পুরীবর আসি গেল মিশ্র-ঘর কহেত কৃষ্ণের কথা মেলি ভাগবত পোথা
অদ্বৈত আচার্য করি সঙ্গে সবে শুনে পরানন্দ মনে।

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চূড়ামণি দিয়েছেন—

দক্ষিণ ত পূর্বদ্বারী সুন্দর শ্রীঘরে পূর্বদ্বার অভ্যন্তরে সুরম্য চত্বরে।

এই সময়ে বিশ্বম্ভরের চূড়াকরণ হল মহা আড়ম্বরে। মাধবেন্দ্রপুরী নিমাইয়ের জন্মতিথি পূজা করলেন।

এদিকে বয়সের সঙ্গে বাল্যচাপল্য বেড়েই চলল। লোককে জব্দ করবার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হল। যেমন—

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া গৌররায়ে
বালকের সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীর পাএ।
বসিয়া করয়ে যুক্তি বালকের সাত
চোরি করি গিয়া ঘাটে পর-দ্রব্যজাত।
গঙ্গাস্নান করে জত এ পুরুষ নারী
ঘটী বাটী ঝাপী বস্ত্র সবে ঘাটে ধরি।
প্রকারে হরিব দ্রব্য কেহ না জানিব
কৌতুক করিয়া জার দ্রব্য তারে দিব।
এই যুক্তি করি প্রভু গৌর বিশ্বম্ভর
শিশু মেলে গঙ্গাজলে প্রবেশে সত্বর।
বারকোণা ঘাটে গিয়া মিলে গৌররাজ
গঙ্গাস্নান করে নারী পুরুষ সমাজ।
হরিল সকল দ্রব্য কেহ নাঞি জানে
হরিয়া রাখিল নিঞা বাঙড়ের বনে।
স্নান করি গিয়া দ্রব্য কেহ নাঞি পায়ে
অল্প লোক কাঁদে বড় করে হায়ে হাএ।
দেখিয়া বালক সাথ হাসে বিশ্বম্ভর
বিস্ময়ে বিষাদে লোক জাএ নিজ ঘর।
কেহ দেবায়নে[২] জাএ সর্বজ্ঞের ঘরে
মহা গণ্ডগোল হৈল নদীয়া নগরে।
চোর বলি ধায়ে লোক কহে ধর ধর
হাসিয়া আকুল প্রভু গৌর বিশ্বম্ভর।
কহিতে বুঝিতে দিন দশ ঘটি গেল
গৌরাঙ্গচাঁদের চিত্তে দয়া উপজিল।
এক ভট্টাচার্য্য [তিঁহি] পণ্ডিত মহান
মিলিলা গৌরাঙ্গচান্দ গিয়া তাঁর স্থান।
খেলিয়া খেলিয়া বুলি শিশুগণ সনে
দেখিল অনেক চোর বাঙড়ের বনে।
আমা সবা দেখি তারা পালাএ সত্বর
দেখিল অনেক দ্রব্য বনের ভিতর।
ইহা শুনি সর্বলোক বাঙড়েরে ধাএ
জার জেই দ্রব্য সর্বলোক গিয়া পাএ।

বিশ্বম্ভরের পড়বার বয়স হল, অথচ স্বামীর কোনো উদ্যোগ নেই দেখে শচী একদিন ভয়ে ভয়ে কথাটা তুললেন জগন্নাথের কাছে। জগন্নাথ বললেন, এক ছেলে বিস্তর পড়াশোনা করে শেষে বৈষ্ণবের দলে জুটেছে। নিমাইয়ের পড়বার দরকার নেই, মূর্খ হয়ে থাকুক, "জে জে পাকে বর্তিবেক নিজ ধন খাইয়া"। নিমাই একথা শুনলেন। পরের দিন সকাল থেকে নিমাই ছেলেদের নিয়ে যেখানে যত হাড়গোড় দেখেন সব গঙ্গায় নিয়ে ফেলতে লাগলেন। সকলে ছি ছি করে জগন্নাথ মিশ্রকে জানালেন। মিশ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে শচীকে সব কথা বললেন। শচী নিমাইকে বললেন, এ কি কাণ্ড করছ। নিমাই তখন মাকে তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিলেন—

২ দেওয়ানে অর্থাৎ কাজীর কাছে নালিশ করতে।

না পড়ি না করি কার্য্য বসি অন্ন খাই
পরলোক কার্য কিছু করিবারে চাই।
নিরাশ্রয় জত জীব নাহিক সহাএ
অপমৃত্যু মরি হাড় গড়াগড়ি জাএ।
কোণ পাকে তার হাড় পড়ে গঙ্গাজলে
সে সব কৃতার্থ হএ সর্বশাস্ত্রে বলে।
লোভে জে করয়ে প্রীতি সে পিরিতি নয়ে
জে জিঘাংসায়ে লক্ষ্মী আনে সে লক্ষ্মী না রয়ে।
সুপাত্রে জে দেয় ধন সে নহে ত ব্যয়ে
পরার্থে করিয়ে দুঃখ সেহ দুঃখ নয়ে।
পরিশ্রম করি হাড় পেলী গঙ্গাজলে
অবশ্য কৃতার্থ জীব হব শুভফলে।
স্থাবর জঙ্গম জত সবে কৃষ্ণে রত
কৃষ্ণের সবারে কৃপা করুণ মহত।
জীবগণের সুখ দুঃখ সব কৃষ্ণে লাগে
সর্ব জীবের কল্যাণ কৃষ্ণ চিত্তে জাগে।
অতয়েব বৈষ্ণব সব জীবে দয়া করে
দেখিতে শুনিতে কিছু মোর চিত্তে স্ফুরে।

মিশ্র বুঝিলেন পড়ে শুনে বড় ছেলে বৈষ্ণব হয়েছে, ছোট ছেলে না পড়ে শুনে তার বাড়া হতে চলেছে। সুতরাং তাঁকে পড়াতে হয়, অন্তত মন ফেরাবার জন্যে। গঙ্গাদাস চক্রবর্তীর কাছে বিশ্বম্ভরের বিদ্যারম্ভ হল। তার পরে হল তাঁর উপনয়ন। চূড়ামণি এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা ভালো করেই করেছেন।

বিশ্বম্ভর একদিন রাত্রিতে শ্রীবাসের বাড়ি গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। এবং তাঁদের জানিয়ে রাখলেন যে নিত্যানন্দ তাঁকে দেখতে আসবেন—

শ্রীবাস মালিনী শুন তোমি শুদ্ধমতি
তোমা সভা সনে করি এক যুকতি।
দেখিতে আসিব মোরে নিত্যানন্দ রায়ে
সেই সব কার্যে মোর হইব সহাএ।
তাঁরে না দেখিব কেহ দেখিব সে আমি।
এ সব বিশ্বাস কারে না কহিবে তোমি।

এদিকে নিত্যানন্দ একদা অকস্মাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বাপমা পাড়াপড়শি সকলে অস্থির হয়ে পড়লেন। বৈদ্য এসে দেখে নাড়ি নেই। অকস্মাৎ তিনি হুঙ্কার করে উঠে বসলেন। সকলে প্রশ্ন করলে নিত্যানন্দ বললেন—

যদি একভাবে শুন থীর করি মন
কহিমু সকল মুক্রি মরম কথন।
নবদ্বীপে জাব মিশ্র পুরন্দর ঘরে
দেখিব আদর ধরি বিশ্বম্ভর তরে।
পাতিব সাঙ্গাত তাঁহা সনে গিয়া আমি
দেবনির্মিত আয়োজন সব দিবে তোমি।

মুকুন্দ পণ্ডিতের ধনী যজমান ছিল। তাঁরা সব আয়োজন করে দিলেন। নিত্যানন্দ মাবাপকে বললেন—

ত্রয়োদশী জন্মতিথি করিয়া পুজন
দ্বিতীয়াতে শুভযাত্রা করিব গমন।

তার পর নিত্যানন্দ পিতার অনুচর শুভঙ্কর বিশ্বাসকে নবদ্বীপে পাঠালেন চিঠি দিয়ে। বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে দিয়ে উত্তর লিখে পাঠালেন। চিঠি পাবার পর নিত্যানন্দ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গৌরাঙ্গপূজা করলেন। এ উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন চূড়ামণি।

লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে নিত্যনন্দ রওনা হলেন নবদ্বীপের দিকে। ভার বোঝা বইবার লোক ছাড়া সঙ্গে রইল খুল্লতাত পুত্র রাঁধবার জন্যে আর শুভঙ্কর (শুভাই)। পথে গ্রামে গ্রামে সাদর অভ্যর্থনা। তার মধ্যে একদিন বৈদ্যখণ্ডে (শ্রীখণ্ডে) রাজবৈদ্য নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দদাসের গৃহে বাস।

নিত্যানন্দ নবদ্বীপযাত্রায় বেরিয়ে পড়লে তাঁর বাপমা খুব কাতর হলেন। এ কাতরতা তাঁদের কোনো কোনো আত্মীয় প্রতিবেশীর ভালো লাগল না।

আখণ্ডল আচার্য আইলা হেনবেলা
কথাগুলা কএ জেন বোড়া সাপের জ্বালা।
অবাহে ব্রাহ্মণপুত্র মোর বোল শুন
স্বরূপ কহিতে যদি হিত হেন মান।

বন্দীঘটী বংশে বটিএ বড়ার পুত্র
ভিন্নপর নহি বটি তোমার ত সূত্র।
সুপণ্ডিত জন বটি প্রেম আপার
আমারে ত ছোট বটে বাপ তোমার।
প্রামাণ্য বচন মোর অল্প জ্ঞান কর
অকাজে চলহ জার তার বোল ধর।
আমারে পণ্ডিত বড় কারধিক বুধি
কেবা সে জানএ কত কে পুথীর শুধি।
ধন জন পাণ্ডিত্য সে যশ আভিজাতি
বুঝিয়া বুঝহ কে বড় সে [হ] তথি (?)।
মো হেন সুবুদ্ধি ধীর মোরে কর বালু।
এই সে কারণে সর্ব কার্য হএ আলু।
অকার্য গ্রাহক সে অবাল্যে তোল বাণী
কাটিয়াত বড় নালা ঘরে আন পানি।
ভাল গায় কাণ্ডুইয়া [হেন] তোল বেথা
দুঃখ অনুভই জান বিষর্পণ কথা।
ভালমন্দ পরিণাম না জানসি তুম
ছাওয়াল দোলাইতে লাগল ঘুম।
কোথা নদীয়াপুর মিশ্র পুরন্দর
কোথা শচী বসে কোথা বিশ্বম্ভর।
দশ বিশ জনে ধায় আগে জান সন্ধি
বেটারে ত ধরি আনি ঘরে কর বন্দী।
ন'নারত্ন নানাবস্ত্র নানাদ্রব্য দিয়া
পাঠাই সে হেন পুত্র ঘরে কান্দ সিয়া।
না চিনি না শুনি তারে দেহ এত ধন
মোরে কাচাখান দিতে না উঠএ মন।

নিত্যানন্দ ফুলিয়ায় পৌঁছে গঙ্গাস্নানার্থী বলে এক বৈদ্যের ঘরে অতিথি হলেন। শুভাই গিয়ে বিশ্বম্ভরকে সংবাদ দিলেন। পরের দিন সকালে নিত্যানন্দ নৌকা ভাড়া করে বিশ্বম্ভরকে দেখতে এলেন নবদ্বীপে। দুই ভায়ের মিলন হল।

নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে নিত্যানন্দ শিক্ষাগুরু গঙ্গাহরি চক্রবর্তীর কাছে আবার পড়তে লাগলেন। কিছুকাল পরেই তাঁদের বাড়িতে এক অবধূত সন্ন্যাসী এসে অতিথি হলেন। নাম আনন্দস্বরূপ। রাত্রিতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। চূড়ামণি লিখেছেন—

বাপের প্রধান পুত্র আমি সর্বজ্যেষ্ঠ
মাবাপের প্রাণ আমি সর্বকার্যে শ্রেষ্ঠ।
চলিবে ত কোনদিগে দৃঢ় করি বল
এই ক্ষণে যাত্রা করি তুমি আগে চল।
এত শুনি যতিবর সোঁয়রি জগন্নাথে
প্রভু প্রদক্ষিণ চলে দক্ষিণ পথে।
স্বভাবে যতীর বটে প্রথর গমন
চোর যেন জাএ চুরি করি পরধন।
তার পাছে পাছে প্রভু বেগে চলি জাএ
ধন লাগি যেন ধনী চোর পাছে ধাএ।

মুকুন্দ-পদ্মাবতী ছেলের জন্যে হাহুতাশ করতে লাগলেন। খলপপুরের লোক শোকাকুল হল। অবধূতের সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর মায়ের অনুমতি নিয়ে চললেন পিতৃভূমি শ্রীহট্টে। এই গমনের যথাসম্ভব খুঁটিনাটি খবর দিয়েছেন চূড়ামণিদাস। প্রাচ্যভূমির হৃদয়মন হরণ করে বিশ্বম্ভর বিস্তর টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোভাব ঘটেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিবাহ অতি সংক্ষেপে সেরে নিয়ে চূড়ামণি দিগ্‌বিজয়ীর কথা বলেছেন। তার পরে গয়াযাত্রা।

গয়াযাত্রাপ্রসঙ্গে চূড়ামণিদাস কিছু কিছু নতুন কথা শুনিয়েছেন। গৌড়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ গঙ্গা দেখে বিশ্বম্ভরের অপার আনন্দ হল।

আবেশে অবশ প্রভু গঙ্গাস্নান করে
পুজিল গোবিন্দ গঙ্গা বহু উপচারে।
এক অযুত পদ্ম প্রভু কিনি আনে
গঙ্গানিবেদন করে এ মন্ত্রবিধানে।

গঙ্গার দুকূল মাঝে পদ্ম ভাসি জায়
দেখিয়া গৌড়ের লোক চমৎকার পায়।
দেখিয়া দুকূল লোক আকুল আনন্দে
কোন ভাগ্যবান কৈল এসব প্রবন্ধে।
গঙ্গার দুকূল মাঝে ভাসে পদ্মরাশি
শিবশিরে রহে গিয়া পালাইয়া শশী।
কিবা লক্ষ্মী গৌড়ে রহি করএ বিহার
গঙ্গা বা দিলেন তাঁরে পদ্ম উপহার।
সুলুতান হুসেন সাহা শুনিয়া এ রঙ্গ
আপনি দেখিতে আল্যা পাত্রমিত্র সঙ্গ।
সুলুতান কহে শুন অহে পাত্রমিত্র
এসব মানুষি নহে গোসাঞী চরিত্র।
এক এক পদ্ম হৈল লাখ লাখ দলে
দেখি পদ্মময় গঙ্গা না দেখিএ জলে।
নমস্কার করি করি বসে গিয়া পাটে
অধিক অধিক দেখে পাথরের ঘাটে।

কানাইর নাটশালে রাত্রিবাস করে প্রভু অগ্রসর হলেন গড়িদ্বার পথে। এ পথের বর্ণনা—

গড়িদ্বার হইতে প্রভু অতিবেগে চলে
বামেতে পর্বত সে দক্ষিণে গঙ্গাজলে।
একদুরুনিয়া পথ সভে বেগে চলে
পাএ লাগালি গৌরের হুহুঙ্কার বলে।

কালগ্রাম বারাড়ী পেরিয়ে পৌঁছলেন ভাগলপুরে—

বাহাগলপুর তেজি জাইতে উত্তরে
দেখিল এ দিবাকর মনসার ঘরে।

মুগরের গড় দেখে সেখানে বিশ্রাম করলেন। সেখান থেকে সোজা গয়ায়। গয়ায় দেবদর্শন ও পিতৃকৃত্যের পর ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন হল। তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন বিশ্বম্ভর। তার পর ঘরের মুখে ছুটলেন। প্রত্যাগমনপথের বর্ণনা চূড়ামণি দু-তিন ছত্রে সেরেছেন—

গৌরসিংহ চলি জায় সিংহপরাক্রমে
সঙ্গের জতেক লোক ন আলিগু শ্রমে।
দিন ছয় সাতে গিয়া নবদ্বীপ পায়
গঙ্গাস্নান করি সম্ভাষয়ে গিয়া মাএ।

সঙ্গীসাথীদের বিদায় দিয়ে গৌরাঙ্গ বললেন, আজ তোমাদের সঙ্গে মিলে কীর্তন করব। আহার ও বিশ্রাম করে প্রভু গেলেন শ্রীবাসের ঘরে। সেখানে—

ডাকিয়া ত আনে প্রভু ভাগবতগণে
করএ কীর্তন নাটে শচীর নন্দনে॥

কীর্তন করে প্রভু বাড়িতে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে আহার করলেন। তার পর শয়নে গেলেন। এইখানেই গৌরাঙ্গবিজয়ের আদিকাণ্ড শেষ। দু-চার ছত্র আত্মপরিচয়ের পর পুথিও এইখানে খণ্ডিত।

৪

চূড়ামণিদাসের সব কথাই যে সত্য বলে মেনে নিতে হবে এমন বলি না। তবে তিনি যে কথা বলেছেন সে কথা ষোড়শ শতাব্দীর মাঝের দিকে (আনুমানিক ১৫৫০-৬০ খ্রীস্টাব্দ) কোনো কোনো চৈতন্যভক্ত সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। চৈতন্যজীবনীর পক্ষে এ উপাদান উপেক্ষণীয় নয়। নিত্যানন্দের গৌরাঙ্গপূজা ও তাঁর সঙ্গে প্রথম মিলন নিত্যানন্দের পরবর্তী কালের আচরণের আধারে প্রস্তুত হতে পারে। নিত্যানন্দের পারিবারিক কথা যা গৌরাঙ্গবিজয়ে আছে তা অন্যত্র নেই। এ অংশের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

চূড়ামণিদাসের কাব্যে তত্ত্বকথা নেই, মাহাত্ম্যকীর্তনের চেষ্টাও নেই। নিতান্ত ঘরোয়া ছাঁদে লেখা। সেকালের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এই বইটি থেকে বেশ খানিকটা মেলে॥

গ্রন্থপরিচয়

জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তরঃ। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ। বিশ্বভারতী। পাঁচ টাকা।

মীমাংসা-দর্শন। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ। বিশ্বভারতী। আট আনা।

ন্যায়-দর্শন। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী। আট আনা।

সরল ন্যায়। শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী। আট আনা।

বেদান্ত-দর্শন। শাঙ্করভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বৈয়াসিক ন্যায়মালা, তাহার বঙ্গানুবাদ; ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা, ভাষ্যরত্নপ্রভাটীকা সহিত। প্রথম খণ্ড। চতুঃসূত্রী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা। তিন টাকা।

বেদান্ত-দর্শন। শ্রীমতী রমা চৌধুরী। বিশ্বভারতী। আট আনা।

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান। প্রথম ভাগ। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। দশ টাকা।

ভারত-দর্শনসার। শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী। তিন টাকা চার আনা।

কাব্য ও দর্শন মানবের দুইটি বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ। একটি aesthetic বৃত্তি, অন্যটি intellective বৃত্তি—একটি ভাবপ্রধান, অন্যটি বুদ্ধিপ্রধান। জাতীয় চরিত্রে যখন ভাব ও বুদ্ধির সমানুপাতে মিশ্রণ ঘটিয়া থাকে, তখনই তাহার সুস্থ অবস্থা সূচিত হয়। আর যখন একটিমাত্র তীব্রতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। বাঙালী চরিত্রে একসময়ে উভয় বৃত্তিরই একটি শোভন সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছিল, তখন যেমন নানা কাব্যে গানে শিল্পে বাঙালীর জাতীয় ভাবধারা শতপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ বিচারপ্রধান দার্শনিক আলোচনাতেও তাহার মনীষার সূক্ষ্মতা গভীরতা এবং ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর যুগেই রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' ও নবদ্বীপের নব্যন্যায়চর্চার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। একজন বাঙালী মনীষীই সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।

কিন্তু বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতে ভাবেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে; ফলে, আধুনিক কালে বাঙালী কেবল ভাবপ্রধান সাহিত্যের চর্চাতেই ডুবিয়া আছে, বুদ্ধিপ্রধান দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনায় তাহার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যে কয়েকজন অল্পসংখ্যক বাঙালী মনীষী দর্শনালোচনায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায় নিবদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিবৃন্দ বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের এই অভাব কিয়দংশে পূরণ করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙালীই তাঁহাদের সেইসকল দার্শনিক প্রবন্ধাদির সহিত পরিচিত আছেন। য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত শিক্ষিত বাঙালীর যে পরিমাণ অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা সক্রেটিস প্লেটো আরিস্টটল্ হিউম কাণ্ট হেগেল বের্গসঁ প্রভৃতির মতবাদ ছাত্রসমাজে প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণের আধ্যাত্মিক মতবাদ কিরূপ ছিল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার মধ্যে বৈলক্ষণ্য কি, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের পার্থক্য কি, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে পরস্পরসম্বন্ধ কিরূপ— এই প্রকার অবশ্যজ্ঞাতব্য কোনও তত্ত্বই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে পারে না। স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য জাতীয় জীবনের অস্বাভাবিকতারই সূচনা করিয়া থাকে। আনন্দের বিষয়, বিশ্বভারতী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত উপরি উল্লিখিত নিবন্ধসমূহে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ ও উহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে আচার্যগণ মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: আস্তিক ও নাস্তিক। পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, সাংখ্য ও যোগ, এবং ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়টি দার্শনিক প্রস্থান আস্তিকদর্শন রূপে প্রসিদ্ধ। আর বৌদ্ধ জৈন চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ নাস্তিক সিদ্ধান্তরূপে খ্যাত। আস্তিক দর্শন বেদের প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নাস্তিকগণ বেদপ্রামাণ্যের বিরোধী— ইহাই এই দুই প্রস্থানের মধ্যে মৌলিক ও মুখ্য ভেদ।

পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা এই দুইটি দর্শন বেদবাক্যের তাৎপর্য অবধারণ বিষয়ে ব্যাপৃত। 'মীমাংসা' শব্দের অর্থ 'পূজিত বিচার'— 'পূজিত-বিচারবচনো মীমাংসাশব্দঃ'। এই বিচার বেদবাক্যের। পূর্বমীমাংসায় বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত বিধি অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য অবধারণের প্রয়াস করা হইয়াছে—ধর্মজিজ্ঞাসাই পূর্বমীমাংসার বিষয়। এবং মহর্ষি জৈমিনি ধর্মের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন— 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'। বেদাবিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপই ধর্মপদবাচ্য। অপর পক্ষে, উত্তরমীমাংসা বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্‌ভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট—ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্র।

বেদের মন্ত্রব্রাহ্মণভাগের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকিলে মহর্ষি জৈমিনির পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্র একেবারেই দুর্বোধ্য। জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা সূত্রাকারে রচিত এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার কয়েকটি অধিকরণ লইয়া গঠিত, প্রত্যেকটি অধিকরণ কয়েকটি সূত্রের সমষ্টি। এক-একটি অধিকরণে এক-একটি বিষয় (topic) লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধিকরণ রচনারও নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি আছে। অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ। বিষয় সংশয় পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ ও নির্ণয়— এই পাঁচটি লইয়া অধিকরণ রচনা করা হইয়া থাকে। পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রে যাঁহারা প্রথম প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য মাধবাচার্য একাধিক সূত্রের সমষ্টিস্বরূপ এক-একটি অধিকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয় শ্লোকাকারে সহজবোধ্য আকারে প্রকাশ করিয়া 'জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তরঃ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐসকল শ্লোকের বৃত্তিও তিনিই স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, বঙ্গভাষায় উহার কোনো অনুবাদ এপর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ পূর্বমীমাংসার এই অবশ্যপঠনীয় নিবন্ধের প্রথম দুইটি অধ্যায়ের মূল সম্পাদন করিয়া, সংস্কৃতে উহার স্বরচিত টিপ্পনী যোজনা করিয়া এবং মূলের বঙ্গভাষায় অনুবাদ সংযোজনা করিয়া পূর্বমীমাংসা অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করিতেছি তাঁহার এই উদ্যম অব্যাহত রাখিয়া

তিনি সমগ্র 'জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তরে'র বঙ্গানুবাদে ব্রতী হইবেন। পূর্বেই পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় সমগ্র জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসার শাবরভাষ্যসমেত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। মীমাংসা-শাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ, অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই এই শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত নন। কিন্তু তাঁহারাও উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে অগ্রসর হইতে পারেন না। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের যাহাতে এইভাবে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইতে পারে, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্যের 'মীমাংসা-দর্শন' জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের একখানি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ-গ্রন্থ। ইংরেজিতে ডক্টর কীথ্ রচিত *The Karma-Mimamsa* গ্রন্থে (The Heritage of India Series) সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে পূর্বমীমাংসার সিদ্ধান্তসমূহকে সহজবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব আছে। পূর্বমীমাংসা-দর্শন যদিও যজ্ঞাদিবিধায়ক বেদবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যই ব্যাপৃত, তথাপি আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাতে সর্বদর্শনসাধারণ বহু তত্ত্বেরই আলোচনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্যের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে মীমাংসার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনের দুইটি প্রধান প্রস্থান ভাট্ট-প্রস্থান ও প্রাভাকর-প্রস্থান সম্বন্ধে ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলনামূলক আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। একসময়ে বাংলাদেশে প্রাভাকর-মীমাংসার বিশেষ প্রচলন ও সমাদর ছিল, ইহা প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্রাদির আলোচনা হইতে জানা যায়। কৃষ্ণমিশ্র-রচিত একাদশ শতকের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের একটি শ্লোকে গুরুমত এবং তৌতাতিত-মত (ভাট্টমত)—এই উভয় মতেরই উল্লেখ পাওয়া যায়—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং
তত্ত্বজ্ঞানমহো ন শালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।

কিন্তু বঙ্গদেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রায়শই লুপ্ত হওয়ায় পূর্বমীমাংসার চর্চাও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু, যজ্ঞানুষ্ঠানই মীমাংসার কেন্দ্রস্থানীয় বিষয় হইলেও, মীমাংসায় অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি সকল শাস্ত্রের পক্ষে প্রযোজ্যরূপে পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। মনুসংহিতার প্রাচীন ব্যাখ্যাতা মেধাতিথির 'ভাষ্য' মীমাংসায় অনুসৃত পদ্ধতির সহিত পরিচয়ের অভাবে বহুলাংশেই দুর্বোধ্য থাকিয়া যায়। বেদবাক্যের বলাবল বিচার, অর্থনির্ণয়, বিরোধের পরিহার ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বমীমাংসায় যেসকল 'ন্যায়' (principles) প্রদর্শিত হইয়াছে, সর্বজাতীয় বাঙ্ময়ের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য তাহাদের উপযোগিতা আছে। প্রমাণ (Epistemology) এবং প্রমেয় (Metaphysics)—এই উভয়ের আলোচনাতেও মীমাংসা-দর্শনে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত। এই উভয় বিষয়েই ভাট্টমত এবং গুরুমতের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ আছে। ভাট্টগণ প্রমাণষট্‌কবাদী, প্রাভাকরগণ প্রমাণপঞ্চকবাদী। প্রমাণ ও প্রমেয় সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শন গ্রন্থে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। 'অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ' বিষয়েও সেইরূপ। শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান সমাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থে স্থান পায় নাই—ইহাতে গ্রন্থের কিয়দংশে ন্যূনতা হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও মীমাংসা-দর্শন মীমাংসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি সম্যক্ ধারণা জন্মাইয়া দেয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং পরিচ্ছন্ন। অতএব দুরূহ বক্তব্যও শিক্ষিত পাঠকগণের বুঝিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। এই জাতীয় উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্যের 'ন্যায়-দর্শন' মহর্ষি গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্র অবলম্বনে রচিত প্রাচীন ন্যায়ের

সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থ। বিবাক্ষিতার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ পঞ্চাবয়বোপন্ন (five-membered) বাক্যই 'ন্যায়' শব্দের অর্থ— ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্দ syllogism। অতএব ন্যায়প্রয়োগের উদ্দেশ্য পরমতখণ্ডনপূর্বক স্বমতব্যবস্থাপন। মহর্ষি গোতম তাঁহার পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়-সূত্রে প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন প্রভৃতি ষোড়শবিধ পদার্থের উদ্দেশ লক্ষণ ও পরীক্ষামুখে বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সূত্রের উপর বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ও সেই ভাষ্যের উপর উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্তিক ভারতীয় দার্শনিক মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাচীন ভারতীয় বিচারপদ্ধতির গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য যুক্তিশাস্ত্রের (logic) তুলনায় ভারতীয় বিচারপদ্ধতি কতদূর উন্নত ছিল তাহা চিন্তা করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। ন্যায়-দর্শন যদিও যুক্তিশাস্ত্র বটে, কিন্তু ইহার একটি স্থির লক্ষ্য আছে— দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিই ইহার লক্ষ্য ; এবং এই দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির পারম্পরিক হেতু অজ্ঞাননিবৃত্তি। এই অজ্ঞাননিবৃত্তি পদার্থের যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভবপর। এবং প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগ সেই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধিরই উপায়স্বরূপ। সুতরাং পরমতখণ্ডনের দ্বারা আত্মমতপ্রতিষ্ঠা ন্যায়-প্রয়োগের আপাতলক্ষ্য হইলেও দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিই চরম লক্ষ্য। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইহাই বৈশিষ্ট্য। যে শাস্ত্র পুমর্থোপযোগী নহে, তাহা ভারতীয় মনীষিগণের অনুপাদেয়। মহর্ষি গোতম স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

প্রথম সূত্রের ভাষ্যশেষে বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন— 'ইহ ত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগামোঽপবর্গপ্রাপ্তিরিতি।' অতএব ভারতীয় ন্যায়-শাস্ত্রও অধ্যাত্মশাস্ত্রেরই অঙ্গস্বরূপ।

৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার 'ন্যায়-পরিচয়' নামক উপাদেয় গ্রন্থে প্রাচীন গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের প্রমাণ প্রমেয় ও যুক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্যের এই নিবন্ধে গৌতমীয় ন্যায়-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়সম্মত ষোড়শ পদার্থের সম্বন্ধে সহজবোধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। পরমতখণ্ডনের জন্য বাদী বাদ জল্প বিতণ্ডা ছল জাতি নিগ্রহস্থান প্রভৃতি বিচারাঙ্গের কেমনভাবে প্রয়োগ করিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রীয় তত্ত্ববিচারে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত পাঠক কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিবেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যেমন *argumentum ad hominem, argumentum ad baculum* প্রভৃতির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, সেইরূপ প্রাচীন ভারতের মুমুক্ষু মনীষিগণও তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদনার্থ জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োগ করিতেন। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন— 'তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ।' গ্রন্থশেষে পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য নৈয়ায়িক আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ এবং ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সরল আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক এই ক্ষুদ্রনিবন্ধখানি পাঠ করিয়া প্রাচীন গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর সহিত অনায়াসে পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'সরল ন্যায়' পুস্তিকাটিতেও ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ ও

প্রমেয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য তাঁহার 'ন্যায়-দর্শন' পুস্তিকায় প্রাচীন ন্যায়সম্মত ষোড়শপদার্থেরই বিচার করিয়াছেন ; কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে প্রমাণবিষয়ে ন্যায়সিদ্ধান্ত ও প্রমেয় বিষয়ে বৈশেষিকসম্মত সপ্তপদার্থবাদ (দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব) স্বীকার করা হইয়াছে। পরবর্তী যুগে ন্যায়নিবন্ধকারগণ বৈশেষিকপদার্থ-বিভাগপদ্ধতিই সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়া স্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—যথা অন্নম্ভট্ট-কৃত 'তর্কসংগ্রহ', বিশ্বনাথ-কৃত 'কারিকাবলী' ইত্যাদি। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্যও ইহাতে সহজবোধ্যভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রমাণপ্রকরণে যদিও ন্যায়সম্মত প্রমাণচতুষ্টয়ের (প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শব্দ) উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি এই প্রমাণদ্বয়েরই বিচার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। উপমিতি ও শব্দ— অবশিষ্ট এই প্রমাণদ্বয়ের আলোচনার দ্বারা প্রমাণপরীক্ষা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইত বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। যাঁহারা ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে চান, তাঁহারা বিশ্বনাথের 'কারিকাবলী' পাঠ করিবার পূর্বে উহার ভূমিকাস্বরূপ 'সরল ন্যায়' গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

নব্য-স্মৃতি এবং বিশেষতঃ নব্য-ন্যায়ে বাঙালীর মনীষা যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' শীর্ষক নিবন্ধে ন্যায়শাস্ত্রে বাঙালীর প্রতিভার উল্লেখ প্রসঙ্গে যথার্থ ই বলিয়াছেন—'এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাংলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ বাংলার স্মার্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাংলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।'— বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ পঞ্চানন, পদ্মনাভ মিশ্র প্রভৃতি বাঙালী নৈয়ায়িকধুরন্ধর আজও ভারতের সর্বত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর নমস্য হইয়া আছেন। সাধারণ বাঙালীও রঘুনাথ শিরোমণি কর্তৃক পক্ষধর মিশ্রের পরাজয়ের কাহিনীর সহিত বাল্যকাল হইতেই পরিচিত। এই রঘুনাথ শিরোমণিকে লক্ষ্য করিয়াই আধুনিক বাঙালী কবি লিখিয়াছিলেন—

> কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
> বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি'॥

যুক্তিবিজ্ঞানে (Logic) বাংলার এই অসাধারণ মনীষা সত্যই গর্বের বস্তু। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের (ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন) ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু মনীষী আলোচনা করিয়াছেন বটে[১] কিন্তু নব্যন্যায়ের ক্রমবিকাশ ও পরবর্তী যুগে এই শাস্ত্রের অচিন্তনীয় প্রসার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' শীর্ষক গ্রন্থখানি সেই অভাব দুর করিয়াছে— ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, এবং একজন বাঙালী গবেষকের চেষ্টাতেই যে এই লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে— ইহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

---

১ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত *History of Indian Logic*, ডক্টর এ. বি. কীথ্ রচিত *Indian Logic and Atomism*, ডাঃ সর্‌ব্যাটস্‌কী প্রণীত *Buddhist Logic* ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থের অবতরণিকায় উদয়নাচার্য হইতে গঙ্গেশোপাধ্যায় পর্যন্ত নব্যন্যায়চর্চার ক্রমবিকাশ অতি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ যে পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকগণের দীর্ঘকালব্যাপী সমবেত মনীষারই পরিণত ফল, তাহা এই অবতরণিকা পাঠ করিলে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র আবির্ভাব পূর্বসূরিগণের সেই সাধনার উপর একটি যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌম ও তদীয় শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির অপূর্ব প্রজ্ঞাবলে নব্যন্যায়চর্চার কেন্দ্র কিরূপে মিথিলা হইতে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হইল তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে লৌকিক কিংবদন্তী যে বহুলাংশে ভ্রান্ত, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহা নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে শিরোমণির 'দীধিতি' টীকাকে কেন্দ্র করিয়াই নব্যন্যায়চর্চা প্রসারলাভ করিতে থাকে। গ্রন্থকার ১৭৯১ সালে প্রকাশিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে— Fifty-two Pundits, of considerable note in the republic of letters, have written each a commentary on Serowmun's treatise of Philosophy. (পৃ. ১১২)। তৃতীয় অধ্যায়ে 'দীধিতি'র টীকাকারগণের সম্বন্ধে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'দীধিতি'র অধুনাবিস্মৃত টীকাকারগণের মধ্যে মহানৈয়ায়িক কৃষ্ণদাস সার্বভৌম ও ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বহু নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস সার্বভৌমই যে 'ভাষাপরিচ্ছেদ'ও 'মুক্তাবলী'র যথার্থ রচয়িতা, তাহা নানা দেশীয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এবং 'মুক্তাবলী'র ও বিশ্বনাথ পঞ্চাননরচিত 'গৌতমীয় ন্যায়সূত্রবৃত্তি'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা লেখক নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে গদাধরোত্তর যুগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ে নবদ্বীপের বাহিরে নব্যন্যায়ের প্রসারের ইতিহাস লেখক সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্পর্কে আলোচনায় বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে 'কাশীধামে বাঙালী নৈয়ায়িক' সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পদ্মনাভ মিশ্র যে বাঙালী ছিলেন, তাহা লেখক বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক 'বঙ্গদেশে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী'র বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নব্যন্যায়ের আলোচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর ক্রমশঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা, বিশেষতঃ নব্যন্যায়চর্চা, বাংলাদেশে অবসাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২১ সংবৎ, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত সর্বদর্শনসংগ্রহের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রগুরু মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নব্যন্যায়ের পঠন-পাঠনের এই ক্রমিক অবনতি সূচিত করিয়া বলিয়াছেন— 'আর যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই প্রথমতঃ ভাষাপরিচ্ছেদের ব্যাপ্তিনিরূপণ পর্যন্ত পাঠ করিয়া, অনুমানখণ্ডের (মথুরানাথ-কৃত টীকা) জাগদীশী (জগদীশ কৃত-টীকা), ও গাদাধরীর কতিপয় পত্র অধ্যয়ন করেন ; পরে প্রত্যক্ষখণ্ডের প্রামাণ্যবাদের ৫।৬ পত্র, বৌদ্ধাধিকারের ৫।৬ পত্র, কুসুমাঞ্জলির দুই স্তবক, শব্দখণ্ডের মাথুরীর যৎকিঞ্চিৎ, এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও ব্যুৎপত্তিবাদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে সভায় প্রতিপত্তিলাভের নিমিত্ত পত্রিকা (পাতড়া) সকল কণ্ঠস্থ করিয়া পাঠ সমাপন করেন। ফলতঃ পত্রিকা-বিদ্যার উপরি

তাঁহাদিগের অনেকেরই নির্ভর।' নব্যন্যায়চর্চার এই ক্রমিক অবনতির কারণ— অন্যান্য শাস্ত্র হইতে ন্যায়শাস্ত্রের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ। নব্যন্যায়ে পরিশুদ্ধ প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা বস্তুর যথাযথ স্বরূপ নিরূপণের মার্জিত ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যুক্তির সারবত্তা তখনই পরীক্ষিত হইতে পারে, যখন নব নব তত্ত্বের আলোচনায় উহার প্রয়োগ ঘটে। যতদিন পর্যন্ত ন্যায়শাস্ত্র 'সর্বশাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ' ও 'সর্বকর্মের উপায়স্বরূপ' বলিয়া অনুশীলিত হইত, ততদিন পর্যন্ত ন্যায়ের পরিশীলন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। খৃস্টীয় ষোড়শ শতক ও উহার পরবর্তী কালে নব্যন্যায় এমনই এক অভূতপূর্ব মর্যাদা লাভ করিয়াছিল যে, নব্যন্যায়ের যুক্তিপদ্ধতি ও পরিভাষার সহিত পরিচয় না থাকিলে কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থেরই প্রকৃত মর্মোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইত না। এইভাবে বেদান্তে, স্মৃতিতে, ব্যাকরণে, অলংকারে— সর্ববিধ শাস্ত্রবিচারে, নব্যন্যায় ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন ন্যায়শাস্ত্র কেবল স্বতন্ত্রভাবেই অধীত হইতে লাগিল, তখনই ইহা শুষ্ক তর্কশাস্ত্রে পর্যবসিত হইল।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল সাধনার ফলে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রাচীন কুলপঞ্জীসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের জীবিত বংশধরগণের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন করিয়া লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় ইতিহাস রচনায় এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই সুদীর্ঘ গবেষণার পরিণত ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' পাঠ করিলে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক Edward Gibbonএর উক্তিই মনে পড়ে— One should accomplish in the maturity of age the immortal work which he had conceived in the ardour of youth।

পরিশেষে বক্তব্য যে, 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা'র এই প্রামাণ্য ইতিহাসে গ্রন্থকার উদয়ন, বর্ধমান, রঘুনাথ শিরোমণি, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ মহানৈয়ায়িকগণের যেসকল লুপ্ত নিবন্ধের সন্ধান দিয়াছেন, ভবিষ্যৎ গবেষকগণ তাঁহার সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া সেইসকল নিবন্ধের অনুলিপি যদি ভারতের বিভিন্ন পুঁথিসংগ্রহশালা হইতে সংগ্রহ করিয়া সযত্নে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তবে ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের আলোচনায় নূতন আলোকপাত হইতে পারে।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক অনূদিত ব্রহ্মসূত্রের 'চতুঃসূত্রী'র ('অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জন্মাদ্যস্য যতঃ। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। তত্তু সমন্বয়াৎ।) শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ বেদান্ত অধ্যয়নেচ্ছু শিক্ষিত বাঙালী পাঠকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্রে'র প্রথম চারিটি সূত্রেই ব্রহ্মের লক্ষণ ও ও তাহার নিরূপণের উপায় সূচিত হইয়াছে। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য রচিত সেই 'চতুঃসূত্রী'র ভাষ্য অত্যন্ত দুরূহ ও গম্ভীরার্থক। অদ্বৈত বেদান্তের সারতত্ত্বসমূহ আচার্যপাদ এই ভাষ্যাংশেই উপন্যস্ত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় শারীরকভাষ্যের সুখবোধ্য অনুবাদকার্য যে কিরূপ কঠিন, তাহা অনুবাদক মাত্রই অবগত আছেন। স্বামীজী সেই দুরূহ কার্য অতি নিপুণভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 'বৈয়াসিকন্যায়মালা'র কারিকাসমূহ সন্নিবেশিত হওয়ায় অধিকরণসংগতি ও সূত্রতাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সৌকর্য হইবে। ভাষ্যে উদ্ধৃত উপনিষদ্‌বচনগুলির আকর প্রদর্শিত হওয়ায় বিশেষ জিজ্ঞাসুগণ উপকৃত হইবেন। ভাবদীপিকা

ব্যাখ্যায় বেদান্তের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ হইতে বহু নূতন তথ্য আহরণ করিয়া সমাবেশ করা হইয়াছে— ইহার দ্বারা ভাষ্যের যথার্থ তাৎপর্য বিশদভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সমধিক অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য রামানন্দ যতি প্রণীত 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত টীকা গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে অদ্বৈতবেদান্তের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়। 'বেদান্তদর্শনে'র প্রথম খণ্ড (চতুঃসূত্রী) প্রকাশ করিয়া স্বামী বিশ্বরূপানন্দ বাঙালী পাঠকগণের উপকার সাধন করিয়াছেন। আশা করি তিনি অতঃপর ব্রহ্মসূত্রের অবশিষ্ট অংশের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবেন।

উপনিষদ্‌, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র— ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার এই তিনটিই সর্বপ্রধান আকর, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অনুভূতি ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই তিনটির উপরই অসংখ্য ভাষ্য ও বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' উপনিষদের বচনসমূহের যথাযথ তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যই রচিত হইয়াছিল। আচার্য শঙ্কর 'ব্রহ্মসূত্র' সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'বেদান্ত-বাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্‌'। 'স্বল্পাক্ষরত্ব' ও 'অসন্দিগ্ধত্ব' শাস্ত্রকারগণের মতে সূত্রের লক্ষণ হইলেও 'বিশ্বতোমুখত্ব'ও উহার লক্ষণানুপ্রবিষ্ট বটে। 'ব্রহ্মসূত্রে'ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উপনিষদ্‌-বাক্যসমূহের তাৎপর্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত সূত্রসমূহের তাৎপর্যনির্ণয়ও কালক্রমে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল— এইজন্যই 'ব্রহ্মসূত্রে'র একাধিক ভাষ্যরচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী 'ব্রহ্মসূত্রে'র এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এমনকি অতিআধুনিক কালেও 'ব্রহ্মসূত্রে'র উপর 'শক্তিভাষ্য' রচনা করিয়া পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় আপন মনীষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও, পণ্ডিতগণের মতে শঙ্করাচার্যের 'শারীরকভাষ্যে' শুদ্ধাদ্বৈতপররূপে সূত্রসমূহের এবং তাহাদের মূলীভূত উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের যে তাৎপর্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাই ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্বের যথাযথ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর সর্বত্রই তাঁহার পূর্বসূরিগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন— 'ইতি সম্প্রদায়বিদঃ' ইত্যাদি উক্তিই তাহার সূচনা করে। শঙ্করের মতে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব, আর সকলই মিথ্যা। এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের মতই অলীক; ইহার অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই এই ভ্রান্তির নিরসন সম্ভবপর। অতএব তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি পরবর্তী ভাষ্যকারগণ শঙ্করের এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও মোক্ষলাভের প্রতি জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। রামানুজের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তত্ত্বত্রয় সমানভাবে সত্য— কোনোটিই মিথ্যা নয়। রামানুজের সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই মত বিশিষ্টাদ্বৈতমতরূপে খ্যাত। রামানুজের সময় হইতেই দার্শনিক বিচারে জ্ঞানের ন্যায় ক্রমশঃ ভক্তিরও উপযোগিতা স্বীকৃত হইতে থাকে। নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ— ঐ আচার্যত্রয়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ— ইঁহাদের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিবর্তনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রমা চৌধুরী তাঁহার 'বেদান্ত-দর্শন' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে 'ব্রহ্মসূত্রে'র উপরি-উক্ত পাঁচজন প্রখ্যাত ভাষ্যকারের বিশিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ অতি মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিবন্ধটি পাঠ করিলে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় চিন্তার

বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দর ভাবে বোধগম্য হইবে। এইসকল মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা ব্রহ্ম, সৃষ্টি, জীব, জগৎ, ঈশ্বর, জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, মোক্ষ ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। পুস্তিকাখানি সত্যই সুপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছে।

বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'য় প্রকাশিত শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'ভারত-দর্শনসার' নিবন্ধে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙালী জনসাধারণ যাহাতে স্বদেশের দার্শনিক মনীষার সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নিবন্ধটি রচিত হইয়াছে। লেখক স্বয়ং 'সূচনা'য় বলিয়াছেন— 'এই বই সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। সেই কারণে ইহাতে অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা, জটিল তর্ক এবং সমাসবহুল ভাষা বর্জিত হইয়াছে।' পাশ্চাত্ত্য দেশে দুরূহ দার্শনিক মতবাদসমূহ সাধারণ শিক্ষিত সমাজে সহজবোধ্যরূপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে—Will Durant রচিত *Story of Philosophy* এই জাতীয় প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ উদ্যম অত্যন্ত বিরল। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা সাধারণের জন্য সুখপাঠ্য পুস্তক রচনা করা নিজেদের গৌরবহানিকর বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে, জনসাধারণ স্বদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই থাকিয়া যান। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বয়ং দর্শনাধ্যাপক, তিনি জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় দার্শনিক মতবাদসমূহ এই ভাবে প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা আনন্দ ও উৎসাহের কথা। বর্তমান নিবন্ধে ভারতে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবযুগ পর্যন্ত ইহার ক্রমবিবর্তনের ধারা সংক্ষিপ্ত-ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক— এই প্রসিদ্ধ নাস্তিক প্রস্থান-ত্রয় এবং সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা— এই ছয়টি আস্তিক দর্শনের প্রমাণ ও প্রমেয় বিষয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও আড়ম্বরবিহীন। শিক্ষিত জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভারতীয় চিন্তার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, এবং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত উহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মোটামুটি ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পলাশির যুদ্ধ। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

মোড়ক খুলিয়া পলাশির যুদ্ধ পুস্তকখানার প্রচ্ছদপট ও গ্রন্থকারের নাম দেখিয়া ভাবিলাম ইহা হয়তো গদ্যকাব্য, নাহয় স্বদেশী-মার্কা ওকালতী কিংবা শোকাঞ্জলি— বড়জোর ফেনায়মান ঐতিহাসিক গল্প, যাহার মধ্যে ভাবপ্রবণ জাতির প্রাণের দরদ ও উচ্ছ্বাস আছে, ইতিহাসের নিমতিতা নাই। স্বদেশী যুগ হইতে বাঙালি এইভাবে সাহিত্য নাটক ও ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার স্বাধীনতার শেষ শহীদ ও নবজাগ্রত জাতীয়তার অগ্রদূত মনে করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছে, ঐতিহাসিকগণকে ইংরেজ-উচ্ছিষ্টভোজী দেশদ্রোহী পাষণ্ড বলিয়া গালাগালি দিয়াছে। সুতরাং কেমন করিয়া বুঝিব একজন বাঙালি হালে হঠাৎ ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইবেন ? দ্বিতীয় কথা, এই নূতন গ্রন্থকারের সহিত সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ পরিচয় নাই,

তাঁহার লেখা পড়িবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে হয় নাই— আমার পরিচিতের বিস্তৃতি শিক্ষাব্রতীগণের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

কিছুদিন পর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই পুস্তকের এক সুষ্ঠু সমালোচনা পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম মধ্যাহ্ননিদ্রাসেবী মাদৃশ ঐতিহাসিকের দুপুরের ঘুম তাড়াইবার শক্তি এই গ্রন্থকারের রচনাশৈলী এবং পুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম ঘুম ভাঙাইবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে বটে ; কিন্তু উহা ব্যক্তির শুধু দেহধর্মী নিদ্রা নয়— ব্যষ্টির মানসিক জাড্যজনিত অসাড় সুষুপ্তির মধ্যে বাস্তব চেতনা ফিরাইয়া আনিবার সম্ভাবনা ইহার মজলিসী চমৎকারিতার আবরণে সক্রিয় রহিয়াছে। বহিখানা আগাগোড়া পড়িলে বুঝা যায়, একনিশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিবার যোগ্য বহি ইহা মোটেই নয় ; একবার পড়িলে মনে হইবে নবাবী আমলের ছবি ছায়াচিত্রের ন্যায় দ্রুত চলিয়া গেল, আনন্দ পাইলাম অথচ তৃপ্তি হইল না।

এই পুস্তকের প্রমাণপঙ্ক্তিতে পঁচিশ খানা প্রামাণিক বহির নাম আছে। কোনো গ্রন্থ না পড়িয়া পূর্বপ্রকাশিত অন্য পুস্তকের পাদটীকা হইতে ঐগুলির নামধাম টুকিয়া লইয়া নিজের প্রমাণপঞ্জী ভারী করাই বর্তমানে এই দেশের রীতি। কিন্তু প্রমাণপঞ্জির সহিত এই পুস্তকের বিষয়বস্তু মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় এই পঁচিশ খানা বহি ব্যতীত সাধারণের অজ্ঞাত অনেক দলিল-দস্তাবেজের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অল্প পরিশ্রমে স্বল্প সময়ে এইরূপ বহি লেখা হইতে পারে না। দপ্তরী বদ্‌হজমের লক্ষণ ইহাতে নাই, মালমসলা বেমালুম হজম করিয়া তপনবাবু গল্পের আসরে নামিয়াছেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই বইটি ইতিহাসের টেক্‌স্ট-বুক নয়, কিংবা ছোটদের গল্পচ্ছলে ইতিহাস পড়াবারও বই নয়।" এই বিষয়ে আমরাও একমত। ইহার স্থানে স্থানে এমন সূক্ষ্ম মৌলিক টিপ্পনী আছে যাহা চিন্তাশীল শিক্ষককে ভাবিত করিয়া তুলিবে ; ইতিহাস বুঝিবার ও পড়াইবার উন্নততর নূতন ধারার সন্ধান হয়তো তাঁহারা পাইবেন। পলাশির যুদ্ধ, অন্ধকূপ-হত্যা, বাংলাদেশে ইংরেজশক্তির অভ্যুদয় এবং বাঙালি সমাজের উপর উহার নৈতিক প্রতিক্রিয়া, পলাশির যুদ্ধের ফলে দেশের মোট লাভক্ষতির খতিয়ান সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয় তাহা হইলে বি. এ. পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থী এই পুস্তকে উৎকৃষ্টতর বিষয়বস্তু ও অকাট্য সমালোচনা পাইবেন। তবে, পরীক্ষার উপযোগী করিয়া সাজাইবার নিজস্ব ক্ষমতা থাকা চাই।

গ্রন্থকার আর-এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "কাহিনীর উপকরণগুলো নানা গ্রন্থে ছড়ানো আছে। আমার কাজ সেগুলো বাছাই করে একত্র সাজানো। এর চেয়ে আর কিছু আমার করিবার নাই।" বাছাই এবং সাজানো এই দুই কাজ মোটেই সহজ নহে, ইহার উপর ইতিহাস-রচনার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহারা দি ন্যাশনাল আর্কাইভস কিংবা প্রাদেশিক দলিল-সংরক্ষণাগারে গবেষণা করিয়া বহি লিখেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাছাই হয়তো ভালোরকম করিতে পারেন, কিন্তু মাল হজম করিতে পারে না ; সুতরাং সাজানো অনেকটা সাদা কাগজের উপর পত্রিকার টুকরা আঠা লাগাইয়া রাখিবার মত দৃষ্টিকটু হয়। এইজন্য আচার্য যদুনাথ এই শ্রেণীর গবেষণাকে নাম দিয়াছেন 'scissors-and-gumpot research'। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বস্তুসজ্জা, বর্ণনায় শক্তি সংযম ও সত্যনিষ্ঠা এবং প্রকাশভঙ্গী ইতিহাসকে সাহিত্যপর্যায়ে উন্নীত করিয়া থাকে। সাহিত্যের সুরাসার-ভাণ্ডে সংরক্ষিত না হইলে অতীতের ইতিহাস

পচিয়া হয় মাটি হইয়া যায়, নাহয় রূপকথায় পরিণত হয়, পরবর্তীকালে উহার স্বরূপ নির্ণয় দুরূহ হইয়া পড়ে। এইজন্য আচার্য যদুনাথ ইতিহাস-রচনা-প্রয়াসীকে সর্বদাই বলিতেন, ইতিহাস শুধু কঠোর বিচারবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে চলিবেনা— 'That which is not literature shall never live'। ইতিহাসকে সুসাহিত্য করার চেষ্টায় কিন্তু বিলক্ষণ বিপদ আছে; কারণ মূলতঃ ইতিহাস ও সাহিত্য বিরুদ্ধধর্মী; দুইএর সংমিশ্রণ-ব্যাপারে সূক্ষ্ম মাত্রাজ্ঞান না থাকিলে শেষপর্যন্ত কোনো রচনা ইতিহাসও হয় না, সাহিত্যও হয় না। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, পলাশির যুদ্ধ পুস্তকের কিছু পরমায়ু আছে।

পুস্তকের বিষয়বস্তু পলাশির যুদ্ধ হইলেও আখ্যানভাগে কিন্তু কলিকাতাই মুখ্য, মুর্শিদাবাদ গৌণ; ইহার কারণ, "এই কলকাতাকে নিয়েই পলাশি-যুদ্ধের সূচনা।" বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতা, পলাশির যুদ্ধ, ইংরেজের অভ্যুদয় এবং ভারতমাতার পুনর্জন্ম— এই কয়েকটি ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কার্যকারণসূত্রে দোদুল্যমান রহিয়াছে: এই নবযুগের উষা ও মধ্যাহ্ন কলিকাতায়, বোম্বাই-মাদ্রাজে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই কলিকাতাই বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র। এই স্থানে ইংরেজসূর্য মধ্যন্দিন রেখায় পৌঁছিয়া বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমে হেলিয়া দিল্লিতে দ্রুত অস্তগামী হইয়াছে।

বাংলাদেশের নবসংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় গ্রন্থকার-বর্ণিত প্রাক্-পলাশিকালীন কলিকাতাই বাংলার দধির ভাণ্ড; সুদূর মফস্বল হইতে দুধের ধারা এই ভাণ্ডে সেযুগ হইতে প্রবাহিত হইয়া পুরাতন বীজের গুণে আজ পর্যন্ত কল্‌কাতিয়া দই হইয়া যাইতেছে। মফস্বল কলিকাতা হইয়াছে এবং হইবে; কলিকাতা মফস্বল হইলে কিন্তু বাঙালী বাঁচিবে না।

এই পুস্তকে কলিকাতার আদিকথা মোটেই 'ধান ভানিতে শিবের গীত' নহে। আমাদের মনে হয়, এই অংশ বাংলা ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে অপরিহার্য। কলিকাতার আদি সীমা, পথঘাট, প্রাচীন সমাজ চিত্র, কোম্পানির 'কালা জমিদারি,' ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আমার মত কলিকাতায় উড়ো পাখির কাছে হয়তো নূতন ঠেকিবে; অন্ততঃ আমি প্রথম শুনিলাম, হালেও এমন লোক আছেন যাঁহারা শিয়ালদহ হইতে বৈঠকখানা-বাজারে সওদা করিতে আসিয়া গিন্নীর কাছে বলেন, "কোলকাতা বেড়িয়ে এলুম।" আদি কলিকাতার বাঙালি ও সাহেব পাড়ার যে সামাজিক চিত্র গ্রন্থকার আমাদের সামনে ধরিয়াছেন উহার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। সেই যুগের কাঞ্চনকৌলীন্য, জেলে কায়েত, চাষা কায়েত ইত্যাদি নূতন সামাজিক বর্ণপর্যায়-সৃষ্টি, পোশাক-পরিচ্ছদে ভব্যতা, বাঙালি-দুর্লভ নৃশংস বাস্তবদৃষ্টি, পাড়াগেঁয়ে কলহ ও কেলেঙ্কারিবর্জিত শান্ত নিঃসঙ্গতা, নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা, পরের ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি উদাসীন সহনশীলতা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেকালে যাঁহারা স্বকীয় পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালী কৌলীন্যকে পদানত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অবজ্ঞা করিয়া হিন্দুয়ানি বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের আশ্রয়স্থান ছিল ইংরেজের কলিকাতা। সমাজ ও আইন হইতে পলাতকগণের জন্য আত্মগোপন করিবার মত মানব-জঙ্গল সেই যুগে এবং এই যুগেও এই কলিকাতা শহর; অপর পক্ষে ধ্যানী বুদ্ধের মত সমাধিস্থ হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-সাধনার স্থান কিংবা প্রাচীন ঋষির আদর্শানুযায়ী জীবের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণবাণীর প্রচারকেন্দ্রও এই কলিকাতাই ছিল, এখন 'গোবিন্দ মিত্তিরের ছড়ি'ও নাই, সেই কলিকাতাও নাই।

মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত নবাবগণ এবং ক্লাইভ-ওয়াটসনের চরিত্র এই পুস্তকে

অল্পকথার মধ্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিহাসের মর্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয় না। বর্গীর হাঙ্গামার উপর লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "বরগিদের হ্যাঙ্গামা বর্বরতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। লোকের মনে হত, বনের পশুরাও তাদের চেয়ে ভালো।· ·স্বদেশাভিমান-বশত মারাঠা-দস্যুরা আমাদের যে কি অবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিল সেটা আমরা ইচ্ছে ক'রেই চেপে যাই। দোষটার সমস্তটাই ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে মনে-মনে ভারি আরাম বোধ করি।" পৃ ৮১, ৮৫

স্বদেশাভিমান কালোকে সাদা করিতে চায়। অন্যান্য জাতির মত বাঙালিরও এই দুর্বলতা আছে। এই বহিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভরসা হয়। লেখক হয়তো বর্গীর বর্বরতায় বেশি চটিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ পশুলীলার তাণ্ডব মধ্যযুগের ইতিহাসে আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বর্বরতায় শক-হুন ইংরেজ-মুসলমান কেহ কম ছিল না। মুসলমান-বিজয়ের এই স্মৃতি ইতিহাসের পাতায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেই উহা মহাকাল সম্প্রতি পশ্চিম-পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গে ভারতবাসীর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গ জাতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে এবং জাপানে যে তাণ্ডব চালাইয়াছে উহার তুলনায় বর্গীর হাঙ্গামা নিতান্ত মোলায়েম ব্যাপার বলিতে হয়।

সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কোনো শিক্ষা-দীক্ষাই সিরাজের হল না। বয়েস বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরো বেড়ে যেতে লাগল।· ·না হল যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল রাজকার্য চালাবার কোনো জ্ঞানগম্যি। এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর-কিছুতে তো সিরাজউদ্দৌলাকে কোনোক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরেজ, কি ফ্রেঞ্চ, কি ডাচ—একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যান নি।"—পৃ ১০৪। লেখক সত্য কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু দেশের লোক, এবম্বিধ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হক্‌-কথাকে আমল দিবেন কি? রাজনীতির চাপে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে নবাব-বাদশাহী কেলেঙ্কারির কালি ধুইতে ধুইতে পাতা প্রায় সাবাড় হইয়া গেল, তবুও সাম্প্রদায়িক মানভঞ্জন-পালা ঠিক জমিয়া উঠিতেছে না।

অন্ধকূপহত্যা-ব্যাপার লইয়া গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইতিহাসে একাধিক তুফান উঠিয়াছে এবং অবশেষে জনমতের চাপে উহার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত হইয়াছে। তবে ঘটনাটা কি মিথ্যা? এই বিতর্কে সিরাজের উকিল ও ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্বর্গবাসী হওয়ার পর মৈত্রেয় মহাশয়ের 'জুনিয়র' হিসাবে আমি আচার্য যদুনাথের সঙ্গে দুই দিন তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলাম। জেরায় তাঁহার পক্ষীয় ঐতিহাসিক সাক্ষী কয়েকজন অল্পবিস্তর কিছু কাবু হইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি যখন সিরাজউদ্দৌলার অকপট হিতৈষী বন্ধু এবং ইংরেজের পাকা দুষমন কাসিমবাজারে ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ M. Law সাহেবকে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী হিসাবে হাজির করিলেন তখন আমি নিরুপায় হইয়া হার মানিলাম; কারণ প্রচলিত সাক্ষ্য-আইন অনুসারে কোনো আদালত এহেন সাক্ষীকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত হইলেও এই ঘটনা একদম মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বিচারবিমুখ স্বদেশপ্রেম হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস হইবে না।

ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকারের বিচার ও মধ্যপন্থা আমাদের মতে গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ, সিরাজউদ্দৌলা ইহার জন্য দায়ী নহেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সিরাজউদ্দৌলার

এই বিষয়ে কোনো হাত ছিল না। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন তিনি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। কে তাঁকে জাগাতে সাহস করবে? কেই বা তাঁর হুকুম নেবে?"

সিরাজউদ্দৌলা মহারাজ অশোক ছিলেন না। নিতান্ত জাগিলেও তিনি মাতাল হাঙ্গামাকারী গোরা সিপাহীবন্দীগণের জন্য নিশ্চয়ই শরবত ও পাখার হাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেন না; সে যুগের সরাসরি ব্যবস্থামত পাইকারি হিসাবে মাথা কাটিবার হুকুম দিলেও তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইত না। মানিকচাঁদ ও নবাবের সিপাহীর উপরও দোষ চাপানো যায় না। ইংরেজ গোরা মদ খাইয়া সিপাহীগণকে মারধর করিতেছিল, তাহাদিগকে পুরিবার জন্য ইংরেজের ঐ জেলখানা ব্যতীত অন্য জায়গা ছিল না; তখনও 'রামরাজ্য' কায়েম হয় নাই যে, হাত-জোড় করিয়া সারারাত্রি পিঠে হাত বুলাইয়া পাহারাওয়ালাগণ মারমুখো যুদ্ধবন্দীকে তোয়াজ করিবে।

হলওয়েল সাহেব তাঁহার কড়াগণ্ডা বুঝিয়া পাইয়াছেন। যেমন তাঁহার কল্পনার দৌড় তেমনই মনগড়া কথা সাজাইবার এবং বীভৎস-করুণ রস পরিবেশন করিবার অদ্ভূত ক্ষমতা।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিচার করিতে গিয়া গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, "ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র"। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষেত্রে কোথাও গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। ক্লাইভের কলিকাতা-পুনরধিকার হইতে উমিচাঁদের লাল কাগজে জালসহি পর্যন্ত ঘটনাবলী তারিখ অনুসারে সাজাইয়া লইলে সিদ্ধান্ত হয়তো অন্যরকম হইবে। ক্লাইভের কূটনীতির ফলেই হিন্দুগণের অসন্তোষ এবং মীরজাফরের লোভ দানা বাঁধিয়া এই ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিল; সুতরাং ষড়যন্ত্রটা আসলে ইংরেজের, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের নহে। কাসিমবাজারে ইংরেজের কুঠিই এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। ইংরেজের শত্রু ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ M. Law ক্লাইভের বুদ্ধিতে এবং ইংরেজ কুঠিয়ালের চক্রান্তেই সিরাজ কর্তৃক পাটনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহার পরেই বাদবাকি পাকাপাকি হইয়া গেল। বাংলার জমিদারগণের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রায় দুর্লভ ইহার মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। হিন্দুগণের মধ্যে একমাত্র মহাতাবচাঁদ জগৎশেঠই অগ্রণী ছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা 'দেশদ্রোহী' নহেন। যে যুগে দেশাত্মবোধের অস্তিত্বও ছিল না, সুতরাং সেকালে দেশদ্রোহিতার প্রশ্নই উঠে না। মীরজাফর অবশ্য শুধু বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম নহে, স্বধর্মদ্রোহীও বটে। উমিচাঁদ ব্যবসায়ী, রাতারাতি লাল হইবার মতলবে বাট্টা লইয়া বিশ্বাসঘাতকতা তাহার পক্ষে তেমন নিন্দনীয় কি হইতে পারে? মোহনলাল কাশ্মীরী হইয়াও ডিগবাজি খায় নাই, কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিয়া সর্বপ্রথমে কাশ্মীরীর দুর্নাম ঘুচাইয়াছে। জগৎশেঠকে ভয় দেখাইয়া সিরাজউদ্দৌলা টাকা আদায় করিয়াছে, তাঁহার পুত্রবধূর ধর্মনাশ করিয়াছে— এহেন ব্যক্তি রাজা হইলেও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে 'আততায়ী,' যাহাকে হত্যা করিলে পাপ হয় না; সুতরাং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তিনি অধর্ম করেন নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রায় দুর্লভকে সিরাজউদ্দৌলা কখনও বিশ্বাস করেন নাই; অতএব ইঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথাই উঠে না। মীরজাফরকে সপক্ষে না পাইলে ক্লাইভ হিন্দুর ভরসায় যুদ্ধে নামিতেন না। হিন্দু জমিদারগণের মধ্যে রাজা গণেশ কেহ ছিলেন না, যিনি অত্যাচারীকে অসিবলে দমন করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র ধরিয়া লইলে হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চেতনা ও বুদ্ধিমত্তার মিথ্যা প্রশংসা করা হয়।

পলাশির যুদ্ধ বাঙালির কাছে বাসি হইবার বস্তু নহে। এই ঘটনার আধুনিকতম ঐতিহাসিক তথ্য

গল্পচ্ছলে সরস ভাষায় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়াস শ্রীযুত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশির যুদ্ধ' পুস্তকে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত স্থানে শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন—

পৃ ৩৮। 'এরই ফলে [মুর্শিদকুলী খাঁ-র ক্রোড় টাকা রপ্তানীর] বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধ'রে কেউ আর রুপোর মুখ দেখে নি· ·টাকাকড়ি।'

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ও মুর্শিদকুলী খাঁ-র অন্ততঃ দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতেই রূপা দুর্লভ ছিল। সাধারণ লোকের কাজ-কারবার কড়িতেই চলিত।

পৃ ৩৯। 'তার আগে পাছে· ·হুকুম-বরদার।'

বাদশাহী আমলে উজীর হইতে চোব্‌দার পর্যন্ত সকলেই হুকুম-বরদার সুতরাং এই স্থানে উক্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার হেতু নাই। হয়তো এই জায়গায় হুকা-বর্‌দার স্থানে ছাপার দোষে হুকুম-বরদার হইয়া গিয়াছে।

পৃ ৫৫। 'জহরতের তলোয়ার।'

বোধ হয় জহরত-বসানো তলোয়ার বলাই উদ্দেশ্য।

'মীরজাফরের ছেলে নিজামউদ্দৌলা।'

আসল নাম নজমউদ্দৌলা ইংরেজিতে Nadjmuddaulah দেখিয়াছি মনে হয়।

'তার প্রধানমন্ত্রী কূটবুদ্ধির এক ব্রাহ্মণ।'

এই স্থানে 'র' বেশি হইয়াছে।

পৃ ১৮৭। 'কিন্তু মুসলমানি আমলে চাকাটা একেবারে ঘুরে গেল· ·ব্রাহ্মণ আচার্যের জায়গায় এলেন ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত।'

গুরু-পুরোহিত ব্রাহ্মণ্য কাল্‌চারের যুগে ছিল না, মুসলমান যুগেই ইঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল—এমন কোনো প্রমাণ আছে কি ?

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

অপদার্থ আর পদার্থের কথা। দেবীদাস মজুমদার।

পারা থেকে সোনা। অমরনাথ মজুমদার।

এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

যমের সঙ্গে যুদ্ধ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বেড়িয়ে আসি বিশ্বজগৎ। দেবীদাস মজুমদার।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা গ্রন্থমালা। ঈগল্‌ পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা। প্রতি খণ্ড পাঁচ সিকা।

বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক যত হয় ততই লাভ। কারণ বিজ্ঞানশিক্ষা মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত কর। সু হোক কিংবা কু হোক যে-কোনো সংস্কার মানুষের মনকে অধিকার ক'রে থাকলে সেখানে নতুন কিছু প্রবেশ করানো মহাদুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। অথচ তা না করতে

পারলে উন্নতির আর অগ্রগতির পথই বন্ধ। বিজ্ঞানের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত ক'রে জীবনে প্রয়োগ করা চাই। তাতে মন ও চক্ষু সজাগ হয়, চিন্তা ও দৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত হয়ে যায়, অনুসন্ধিৎসা জাগে, সাধারণ বিষয়ও যে কত অসাধারণ ও বিস্ময়কর তা টের পাওয়া যায়, আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার পথ খুলে যায়।

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। তাই সাধারণের ভিতর বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তারে সমাজ বহুপ্রকারে উপকৃত হতে পারে। সমাজচেতনা, নিজের ইষ্ট ছাড়া পরের ইষ্ট বিষয়ে চেতনা বিজ্ঞানই জাগায়, নীতিশিক্ষা আর আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা এ কাজ হওয়া কঠিন। বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দেয় যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা কিছুই একা ভোগ করা যায় না; তাই সামাজিক মানুষ দাবির উপর জোর না দিয়ে কর্তব্যের উপর জোর দিলে লাভবান হয় বেশি।

অথচ আমাদের বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রচারের পথে নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এমন অবস্থায় শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবীদাস মজুমদার দ্বাদশ খণ্ডে এই 'ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের ছোট্ট লাইব্রেরি'র পরিকল্পনা করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আলোচ্য ছয়খানা বইয়ের ভিতর পাঁচ খানা বইএর এঁরাই লেখক। এঁরা পরম উৎসাহের সঙ্গে সরস মজাদার ভাষায় বিস্তর কৌতুককর ছবি সঙ্গে দিয়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যার প্রধান কয়েকটি বিষয়ের মনোজ্ঞ আলোচনা এই বইগুলিতে করেছেন। ভাষা সহজবোধ্য হয়েছে, ছেলেরা আনন্দ ক'রে পড়বে। বইগুলির পিছনের মলাটে লেখা আছে,—"পড়লে মনে হবে গল্পের বই বুঝি। পাতায় পাতায় ছবি। কিন্তু সবগুলি বই শেষ করলে আধুনিক বিজ্ঞানে সব খবর জানা হয়ে যাবে।" দাবিটা কিছু লম্বাচওড়া হলেও কথাটা মূলত ঠিক। কারণ এ বইগুলিকে বিজ্ঞানের গল্পের বই বলা চলে। বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে ছোটদের মোটামুটিভাবে পরিচয়সাধনের চেষ্টা এতে করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে অবলম্বন ক'রে প্রাকৃতিক নিয়ম ও তথ্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতিকে বিজ্ঞান-পদ্ধতি বলে তার শিক্ষা পাঠকরা এতে পাবে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে তুলতে এ বইগুলি বিশেষ সাহায্য করবে বলে মনে করি না।

এই বইগুলি দ্বারা যা হবে না তার উল্লেখ করা সত্ত্বেও যা হবে সেটুকু কম নয়, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে চাই। পরিকল্পনা, লেখা, ছবি, ছাপা, বাঁধাই সমস্তই ভালো হয়েছে। যাদের জন্যে উদ্দিষ্ট বাংলার সেই ছেলেমেয়েদের ভিতর এই বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুকুমার বসু

স্বরলিপি

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি না হয় আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে॥

কথা ও সুর॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পা]
মা -গা II মা -ণা -া ণা । দা -া পা -দা I দমা -পা -দা পা । মা -া মপা -গা I
আ ০ বা ০ র্ য দি ০ ই ০ চ্ছা ০ ০ ক র ০ আ০ ০

I গমা -ঋা -া ঋা । গা -া মা -পা I পগা -মা -পা -দা । -দপা -র্সা ণা -দা I
বা০ ০ র্ আ সি ০ ফি ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০

I পা -ণা -া দা । পা -া -া -া I না -া -া র্সা । র্সঋা -া র্সা -া I
বা ০ র্ য দি ০ ০ ০ দুঃ ০ ০ খ সু০ ০ খে র্

I না -া -া র্সা । র্সঋা -া র্সা -দা I দা -জ্ঞা -া জ্ঞা । ঋা -া র্সা -া I
ঢে উ ০ খে লা ০ নো ০ এ ই ০ সা গ ০ রে র্

I সা -ঋা -গা -মা । পা -দা পা -দা I [ ] I
তী ০ ০ ০ রে ০ "আ" ০

র্জ্ঞা -া II র্জ্ঞা -া -া ঋর্ণা । ঋর্ণা -া র্সা -া I র্সঋর্ণা -া -া না । র্সা -া র্সা -া I
আ ∘ বা ∘ র্ জ লে ∘ ভা ∘ সা ∘ ∘ ইভে লা ∘ ধূ ∘

I র্সঋর্ণা -া -া ণা । ণা -া দা -া I মা -দা -া ণা । র্সা -া -ঋর্ণা -ণা I
লা ∘ ∘ র্ প রে ∘ ক ∘ রি ∘ ∘ খে লা ∘ ∘ ∘

I র্সা -া -া -া । -া -া র্সা -র্জ্ঞা I র্জ্ঞা -া -া ঋর্ণা । ঋর্ণা -া র্সা -া I
গো ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ হা ∘ শি ∘ র্ মা য়া ∘ য় ∘

I র্সঋর্ণা -া -া ণা । ণা -া দা -া I ণপা -ণা -া দা । দা -া পা -া I
গী ∘ ∘ র্ পি ছে ∘ ভা ∘ সি ∘ ∘ ন য় ন্ নী ∘

I সা -ঋা -গা -মা । -পা -দা পা -দা I [ ] I
রে ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ "আ" ∘

সা -ণ্া II সা -া -জ্ঞা রা । জ্ঞা -া ঋা -সা I সা -া -জ্ঞা রা । জ্ঞা -া মা -া I
কাঁ ∘ টা ∘ র্ প থে ∘ আঁ ∘ ধা ∘ র্ রা তে ∘ আ ∘

I মা -া -া জ্ঞা । জ্ঞা -া ঋা -া I সা -া -া -া । -া -া সা -া I
বা ∘ র্ যা ত্রা ∘ ক ∘ রি ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ আ ∘

I সা -দা -া দা । দা -পা পা -র্সা I র্সণা -া -া দপা । ণদা -া দা -া I
ঘা ∘ ত্ খে য়ে ∘ বাঁ ∘ চি ∘ ∘ না∘ হ ∘ য়্ আ ∘

I দা -া -া পা । মা -া গমা -পদা I দপা -া -া -া । -া -া র্জ্ঞা -া I
ঘা ∘ ত্ খে য়ে ∘ ম ∘ ∘ ∘ রি ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ আ ∘

I র্জ্ঞা -া -া ঋর্ণা । ঋর্ণা -া র্সা -া I র্সঋর্ণা -া -া না । র্সা -া র্সা -া I
বা ∘ র্ তু মি ∘ ছ ∘ দু ∘ ∘ ∘ বে শে ∘ আ ∘

I র্সঋ্ঁা -া -া ণা । ণা -া দা -া I মা -দা -া ণা । র্সা -া -ঋ্ঁা -ণা I
মা ০ ০ ব্ সা থে ০ থে ০ লা ও ০ হে লে ০ ০ ০

I র্সা -া -া -া । -া -া র্সা -র্জ্ঞা I র্জ্ঞা -া -া ঋ্ঁা । ঋ্ঁা -া র্সা -া I
গো ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ ত ০ ন্ প্রে মে ০ ভা ০

I র্সঋ্ঁা -া -া ণা । ণা -া দা -া I দ্পা -ণা -া দা । দা -া পা -া I
লো ০ ০ ০ বা সি ০ আ ০ বা ০ ব্ ধ র ০ ণী ০

I সা -ঋা -গা -মা । -পা -দা পা -দা II [ ] II
রে ০ ০ ০ ০ ০ "আ" ০